# ফেলে আসা ছেলেবেলা

একটি সচলায়তন প্রকাশনা

*"...সে ছিল শুধু আমাতে আর জোৎস্নাতে মাখামাখি দিন।*
*মায়ের আচঁলের  সুগন্ধ,বাবার আঙুল ধরে পাঠশালা,*
*ঘুড়ির মতো ভো-কাট্টা সুখ।।*

*আমার পায়ে মিশে আছে ধুলিমাটি, দাতের খাপে পোকাধরা আমের টক,*
*গগন শিরিষের উচুঁ ডালে একটা ছোট্ট পাখির বাসা,*
*কদমের রোঁয়া মাখা অবাধ্য চুল,পল্লী কবির কবিতা,*
*বোনের বিনুনিতে দুষ্টুমির টান।।*

*ছেড়া পকেট থেকে হারিয়ে যাওয়া দুটো বাদামী মার্বেলের জন্য,*
*হলুদ সুতো ছিন্ন করা নীল ঘুড়িটির জন্য,*
*ছুটতে ছুটতে পালিয়ে যাওয়া ডোরাকাটা লাটিমের জন্য,*
*আমি অনেক কেদেঁছি।।*

*কাদঁতে কাদঁতে এতোটা পথ পেরিয়ে এসে আজ ফিরে দেখি;*
*সেই মার্বেল,সেই ঘুড়ি,সেই ডোরাকাটা লাটিম নয়,*
*জমা খাতার হিসেব থেকে খরচ করে ফেলেছি জীবনের যতো সঞ্চিত সুখ..."*

# ফেলে আসা ছেলেবেলা

প্রথম খন্ড

(অন্তর্জালে বাংলা ভাষায় লিখিয়েদের আত্মজীবনী সংকলন )

**সমন্বয়ক :**
আরিফ জেবতিক

**প্রযুক্তি সহযোগিতা :**
এস.এম মাহবুব মুর্শেদ
অমিত আহমেদ

**প্রচ্ছদ :**
অরূপ কামাল

**প্রকাশক :**
সচলায়তন
http://www.sachalayatan.com
(অনলাইন রাইটার্স কমিউনিটি )

বাংলা ব্লগিংয়ে যুক্ত লেখকদের লেখার সংকলন " ফেলে আসা ছেলেবেলা" অনলাইনে ধারন ও বিপননের সকল অধিকার শুধু মাত্র প্রকাশক "সচলায়ত" কর্তৃপক্ষের। যে কোন মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক পুন: প্রকাশ ও যে কোন ধরনের বানিজ্যিক ব্যবহার শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ঠ লেখকবৃন্দ এবং প্রকাশকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষ।

# সূচীপত্র

(লেখকের নামের ক্রমানুসারে। লেখকের নিক শুধু সূচীতে ব্যবহার করা হলো।)


অচ্ছুৎ বলাই / ছোঁপ ছোঁপ জলরঙ -৫
অমিত আহমেদ / স্বপ্ন বোঝাই কাগজের নৌকা আমার -১১
অরূপ / আমার ছেলেবেলা -২৮
অলৌকিক হাসান / একটি স্ব-সাক্ষাতকার-৩২
আনোয়ার সাদাত শিমুল / আমার ছেলেবেলার জ্বিনগুলি-৪৯
আরণ্যক সৌরভ / পাঁক-৫২
আবু সায়ীদ জিয়া উদ্দিন (এস্কিমো) / ছেলেকাল :আমার তো কোন ছেলেবেলা নেই...৫৫
আহমেদ রাহিদ অমিত / অসমাপ্ত স্মৃতিতে আমার ছেলেবেলা-৫৯
ইশতিয়াক রউফ / সুন্দর, হে সুন্দর-৬২
এস এম মাহবুব মুর্শেদ / আমার বাবা-৬৪
নিঘাত তিথি / অবাক বিশ্বজোড়া-৬৭
নূরুল হাসান (কনফুসিয়াস ) / খাবি দাবি কলকলাবি-৬৯
প্রকৃতি প্রেমিক / প্রকৃতি প্রেমিকের ছেলেবেলা-৭১
ফারুক হাসান / এপার ওপার...-৭৫
বিপ্লব রহমান / পাজেল -৭৯
মাশীদ / পলকের এক ছেলেবেলা-৮৩
মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন (দ্রোহী) / সম্পাদকের নয়, আমার ছেলেবেলা...৯০
মোহাম্মদ আবদুল মুকিত (জ্বিনের বাদশা) / এক বাফের এক হুত-৯৪
শেখ জলিল / বাবাকে মনে পড়ে-১০০
হাসিব মাহমুদ / ছোটশুমার রোজা রাখা-১০২
হাসান মোরশেদ / হাসিনাকে ঘিরে কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিময়তা -১০৫

# প্রাক কথন

অন্তর্জালকে মাধ্যম করে যারা বাংলায় লিখছেন ,তাদেরই একটি সংঘবদ্ধ উদ্যোগ -সচলায়তন।
অনলাইন রাইটার্স কম্যিউনিটি "সচলায়তন" ইতিমধ্যেই ভার্চুয়ালপাঠক লেখকদের মিলনক্ষেত্র হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

"সচলায়তন" যে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে,ই-বুক প্রকাশ করা হচ্ছে তারই একটি অংশ। এ মুহূর্তে সচলায়তন-এ অনেকগুলো ই-বুকের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। সেই যাত্রায় প্রথম থেকে জড়িত হতে না পারলেও ঘটনাচক্রে একসময় একটি ই-বুক তৈরীর সাথে আমিও জড়িয়ে পড়েছি। এই ই-বুকটি সেই হঠাৎ জড়িয়ে পড়ারই ফসল৷
"ফেলে আসা ছেলেবেলা" বইটির সম্পাদক হিসেবে নিজেকে দাবী করতে বাধো বাধো ঠেকছে। আমার মূল ভুমিকাটি ছিল সমন্বয়কের । ই-বুকে নিজ নিজ ছেলেবেলার গল্পগুলো লিখার জন্য আমি ভার্চুয়াল জগতের লেখকদের না না ভাবে তাগাদা দিয়েছি। তারা আমার সেই যন্ত্রনা ভালোবাসার সাথে সহ্য করেছেন,বিরক্তি প্রকাশ করেন নি।

নিজেদের বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝেও শেষ পর্যন্ত বেশিরভাগ লেখকই বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে তাদের লেখা পাঠিয়েছেন,আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আরো কিছু লেখা লেখকরা সমায়াভাবে শেষ করতে পারেন নি,কিন্তু ঈদের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার তাড়ায় ,তাদের জন্য অপেক্ষা করা গেল না। এই বইয়ের একটি দ্বিতীয় খন্ড বের হবে,আরসেই দ্বিতীয় খন্ডে আরো অনেক নতুন লেখার সাথে এই বাকী থাকা লেখাগুলোও যুক্ত করা হবে।

একসময় একটি জাতীয় দৈনিকে সম্পাদনার সাথে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলাম । সেই অভিজ্ঞতা এখানে খুব একটা কাজে আসে নি। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত জ্ঞান স্বল্পতার কারনে যেভাবে সাজাঁনোর ইচ্ছে ছিল,তার কণামাত্র করতে পারিনি। এই অতৃপ্তিটা নিয়েই বইটি প্রকাশ করতে হচ্ছে। আরঅনলাইন বইয়ের ব্যবহারিক সুবিধা চিন্তা করে বইতে কোন আকিঁবুকিঁতেও গেলাম না।

লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে খুবই অনিবার্য দুয়েকটা পরিবর্তন করা ছাড়া,আমি প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব বানানরীতি,বাক্য গঠন ও এ জাতীয় ব্যাকরনগত বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করি নি। লেখক যে ভালোবাসায় তার ছেলেবেলাকে চোখের সামনে দেখেছেন,পাঠককেও সেই একইছবি দেখানোর প্রত্যাশা থেকেই প্রায় প্রতিটি লেখাই কোন পরিবর্তন ছাড়া প্রকাশ করা হলো।

বিভিন্ন ফরমেট ও মাধ্যমে লেখা পাওয়ার কারনে তার সবগুলোকে কনভার্ট করতে হয়েছে। এতে করে কিছু লেখায় মুদ্রন প্রমাদ ঘটেছে,যেগুলো ঠিক করে দিয়েছি। তবু আশংকা রয়ে যায় যে পিডিএফ ফরমেটে হয়তো কিছু হরফ কখনো কখনো ভেঙ্গে যেতে পারে। এখানে আমার প্রযুক্তিগত জ্ঞান স্বল্পতাকে বিবেচনায় নিলে কৃতার্থ হবো।

পুরো বইটি একেবারেই পিডিএফ করে দেয়া হলো। এতে করে সংরক্ষনে আগ্রহী পাঠকদের সুবিধা হবে।
এর পাশাপাশি প্রতিদিন একটি করে লেখা মূল ই-বুক ফোল্ডারে যুক্ত করা হবে,যাতে করে পাঠকরা তাদের কমেন্টের মাধ্যমে লেখকের সাথে যুক্ত হতে পারেন।

উল্লেখ করা মাত্রই গুরুত্বপূর্ণ নামগুলো বাদ পড়ে যায়। তবু এই বইটি প্রকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য এস.এম মাহবুব মুর্শেদ আর অমিত আহমেদের নাম আলাদা করে উল্লেখ না করলে তাদের প্রতি বড্ড অবিচার করা হয়।

প্রিয় পাঠক,"ফেলে আসা ছেলেবেলা"বইটির সাফল্য বা ব্যর্থতার কোন দায়ভার এককভাবে নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছি। সাফল্য ব্যর্থতার সবটুকুই ভাগাভাগি হবে সচলায়তন পরিবারের সকলসদস্যের মাঝে।

এই বইটির অভিজ্ঞতা আমাদেরকে ভবিষ্যতে চমৎকার কিছু বই প্রকাশে সাহায্য করবে,এই আশা রেখে বইটি আপনারা উপভোগ করবেন,সেটাই আশা করি। ধন্যবাদ।

**আরিফ জেবতিক**
সমন্বয়ক

# ছোঁপ ছোঁপ জলরঙ

**অচ্ছুৎ বলাই**

---

*এক  তালপাতার সেপাই*

প্রথম হাতে খড়ি হয় কঞ্চির কলম দিয়ে। পেষা কয়লা পানিতে গুলিয়ে তার সাথে গাবের আঠা মিশিয়ে তৈরি করা হতো কালি আর সেই কালির দোয়াতে কঞ্চির কলম ডুবিয়ে লিখতে হতো।

লিখার জন্য কাগজের খাতা ব্যবহৃত হতো না। তালের পাতা কেটে শুকিয়ে গোছা করে বেঁধে তৈরি হতো খাতা আর সেই খাতার ওপর কঞ্চির কলম হাতে আঁকিবুকি করতো ছোট্ট বলাই। হাতের লিখা ভালো হওয়ার এটা নাকি একটা পূর্ব শর্ত।

বাংলা বর্ণমালা স্বরবর্ণ দিয়ে শুরু হলেও বর্ণমালা লিখতে শেখার প্রক্রিয়া শুরু হয় 'ক' বর্ণ দিয়ে। 'ক' লিখতে শেখানোর পদ্ধতিটা খুব মজার। মা তিনটা বিন্দু এঁকে আমার হাতে কঞ্চির কলম ধরিয়ে দিয়ে বিন্দুগুলো একটার পর একটা যোগ করতে বলতেন। যোগ করা শেষ হলে একটা বিন্দু দেখিয়ে দিয়ে একটা হুকের মত জিনিস আঁকতে হতো। হুকটা অনেক সময়ই উলটাপালটা করে ফেলতাম। ফলে সেটা 'ক' না হয়ে 'ব' এ 'উ-কার' হয়ে যেত। মা পরম মমতায় তাঁর হাত দিয়ে আমার হাতটি ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিক করে দিতেন।

বর্ণমালা লিখা শেষ হলে ফলা শেখা শুরু হয়। আদর্শলিপি দেখে দেখে ফলাগুলো লিখতে শেখার এই পর্যায়ে প্রথম স্লেট পাই। স্লেটটি একটু বড় সাইজের, চারপাশ যত্ন করে কাঠ দিয়ে বাঁধানো ছিলো। লিখার কাজে ব্যবহৃত হত খড়ি মাটি। চকের ব্যবহার সম্ভবত তখনো অতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

স্লেটটা অনেকদিন ছিলো। ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় একবার কলা চুরি করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত পায়ের নিচে পড়ে ওটা ভেঙ্গে যায়। কষ্ট পাই খুব। সেই কষ্টের রঙ আজো ফিকে হয়ে যায় নি।

*দুই.  ছায়ার প্রেম*

স্কুলের পাশেই ছোট্ট মন্দির। প্রতিদিন ফুল দেওয়া হতো, মন্দিরের আঙ্গিনা লেপেপুছে তকতকে চকচকে করে রাখা হতো প্রতিদিন। আমার উৎসাহের বিষয়বস্তু ছিলো গনেষের হাতির মাথা। কালীকে দেখে ভয় পেতাম। মানুষের মাথা কেটে তার মালা গলায় পরা কেউ দেবী হয় কি করে! দুর্গার অসুর বধের মূর্তিগুলো ছিলো অনেক বেশি জীবন্ত। একেক জনের আবার বাহন এক এক রকম। ভুলে গেছি প্রায় সব। মন্দিরের চিত্রটি এখন অনেকটাই ঝাপসা।

সাথে লাগোয়া অতি পুরোনো বটবৃক্ষ। বিশাল বিশাল তার ঝুরি। সেগুলো ধরে দোল খাওয়ার মজা ছিলো অন্যরকম। বটের ছায়ায় আমরা বসতাম পাটি বিছিয়ে। একপাশে একটা ব্ল্যাকবোর্ড টাঙ্গানো থাকতো।

নামতা শেখানো হতো সুর করে। আমাদের মাঝ থেকে কেউ একজন গিয়ে লিখতো, সুর করে বলতো, "এক এককে এক, দুই দুগুণে চার, তিন দুগুণে ছয়. . ." আমরা গলা মেলাতাম। অদূরে নদীর জলে সেই সুর প্রতিধবনিত হয়ে ফিরে আসতো।

আমার সবচাইতে বেশি ভাব ছিলো ছায়ার সাথে। ছায়ারাণী মন্ডল। বয়সে আমার চাইতে একটু বড়ই হবে। এক সাথে পড়লেও দিদি দিদি ভাব নিয়ে আদর করতো। প্রতিদিনই আমার জন্য নিয়ে আসতো নাড়ু, পেয়ারা; কিংবা কুল। কত হরেক রঙের ফুল ছিলো স্কুলের আশেপাশে যত্ন করে সাজানো বাগানগুলোতে; কিংবা অযত্নে বেড়ে ওঠা ঝোঁপঝাড়ে। ছায়াকে ফুল তুলে দিতাম। ওর বড় চুলের বেণীতে ফুলগুলো তারার মত জ্বলজ্বল করতো।

আমি ছায়ার প্রেমে পড়ে যাই। এমন চমত্কার মেয়েটিকে ছাড়া আর কিছু কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু বিধি বাম। ক্লাস ওয়ান শেষে আমাকে স্কুল পরিবর্তন করতে হয়। ছায়া থাকে পুরোনো স্কুলেই।

ছায়ার সাথে আবার দেখা হয় অনেক বছর পরে। আমি তখন ক্লাস নাইনে। ছায়া এক বছর লস করে এইটে। আমার স্কুলে এসে ভর্তি হয়েছে। আমি চিনতে পারি। অথচ কথা হয় না আর। সময়ের দেয়ালটা ডিঙোনোর প্রয়োজন ততদিনে একেবারেই ফুরিয়েছে।

*তিন. পরী দেখা*

পরীরা সুন্দরী হলে কি হবে? তাদের দৃষ্টি থাকে মানব-সন্তানের ওপর। একটু রূপবান হলেই ধরে নিয়ে বিয়ে করবে। পরীরা আছর করে সুন্দর সুন্দর ছেলেদের ওপর আর জ্বিনেরা সুন্দরী মেয়েদের ওপর। পরীরাজ্য আমাদের রাজ্য থেকে অনেক বড়। কুকাফ নগরী তাদের রাজধানী।

পাশের গ্রামের বরকতকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো কুকাফ নগরীতে। বিয়ে প্রায় আসন্ন। কিন্তু তার কান্নাকাটিতে তাকে আবার ফেরত দিয়ে গেছে। ফেরত ও যেমন তেমনভাবে দিয়ে যায় নি। গাছের মগডালে একটি পাতার ওপর ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে। স্পর্শ করলেই পড়ে যাবে। অনেক কসরৎ করার পরেই তাকে নামানো গেছে।

জ্বীন হোক, পরী হোক; কিংবা ভূত - তারা কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলে। তারা মানুষের চাইতে যতোই শক্তিশালী হোক, মানুষের কাছে তারা অসহায়। দেওবন্দের হুজুর ৩ টি বদ জ্বীনকে বোতলে পুরে রেখেছেন, খা বাড়ির ইব্রাহিম মাওলানা ওখানে পড়তে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসেছে।

জ্বীন-পরীরা মানুষ কিংবা পশু যার বেশই নিক না কেন, তাদের ছায়া নেই। সূর্যের আলোতে গেলেই পরিষ্কার বুঝা যাবে, কে মানুষ আর কে ছদ্মরূপী জ্বীন। আয়াতুল কুরসী পড়ে ফু দিলে এক ফুৎকারে উড়ে যাবে সব জ্বীন-পরীর দল। সরকারী রাস্তাকে বড় ভয় ওদের। রাত-বিরেত যা-ই হোক না কেন, সরকারী রাস্তায় ওরা কারো ক্ষতি করতে পারে না। তাই চেষ্টা করে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাস্তার পাশে কোথাও নামাতে। তারপর খপ করে ধরে ফেলে।

ছোটবেলায় মোটামুটি এরকমই ছিলো আমার পরীদের সম্পর্কে জ্ঞান। ক্লাস ওয়ানের ফাইনাল পরীক্ষার শেষ দিন। একা একা ফিরছি। হঠাৎ পথে দুইটা পরমা সুন্দরী মেয়ে। সুন্দরীদের প্রতি একটু অন্যরকম ফিলিংস ওই অতটুকু বয়সেও আমার ছিলো। কিন্তু এই নির্জন রাস্তায় তাদেরকে দেখে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা সচেতন হয়ে উঠলো। এরা পরী না হয়ে যায়ই না।

আমার আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করতে, তাদের মধ্যে একজন বললো, " আমাদের সাথে যাবি? "

" না। "

" তোকে চকলেট খাওয়াবো। আমাদের সাথে চল। "

" না। যাবো না। "

আমি রাস্তা ছাড়ি না। হাঁটা বন্ধ করি না। ওরা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় একজন বলে, " খেঁজুর গাছের সাথে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলবো। "

আমি ছিঁচকাঁদুনে না। বরং কান্নাকাটিকে আমার কাছে ছোটবেলা থেকেই প্রেস্টিজ ইস্যু মনে হত। তারপরেও কেঁদে ফেলি ভয়ে। পাশের ছোট্ট খেঁজুর গাছের কাঁটাগুলো তখন লকলক করছে।

অন্যজন বলে, " থাক ছেড়ে দে! "

আমি দৌঁড়ে এক নিঃশ্বাসে চলে আসি বাড়িতে। জমজম কুয়ার পানির সাথে কয়লা ভিজানো পানি মিশিয়ে চোখে মুখে ছিঁটা নিতে নিতে বর্ণনা করি, ওদের ছায়া ছিলো না।

*চার. নকল*

" স্যার, আমার ভালো নাম কি? "

কামরুলের প্রশ্নের জবাবে মৎস্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নির্মল স্যার। আমিসহ আশেপাশের সবাই থ। পরীক্ষার হল। ইংরেজী পরীক্ষা। ক্লাস এইট। কামরুল হলো আমাদের মধ্যে যারা নকলকে শিল্পের কাছাকাছি রূপ দিয়েছে, তাদের একজন। হাতের তালু সাইজের শিল্পায়িত ভাঁজে ভাঁজযোগ্য কাগজে মাইস্ক্রোস্কোপিক ফন্টে লিখা থেকে শুরু করে ইকোনো বলপেনে সূঁচের আঁচড় - কি বাকি রেখেছে সে!

কিন্তু নির্মল স্যার তখন ত্রাস। তিনি কোনো হলে গার্ড পড়া মানে নকলবাজরা নির্ঘাত ফেল, সেইসাথে ধরা খেলে জোড়া ব্যাতের নির্দয় প্রহার। প্রহারের পরে অবশ্য তিনি নিজের পকেটে সার্বক্ষণিকভাবে বিরাজমান জামবাক বের করে দিতেন, অন্যেরা মালিশ করতো।

আমার নকল জীবন তেমন সমৃদ্ধ নয়। তবে ভালো ছাত্রের তকমা ঝুলিয়ে অনেক সময়ই নকল করেও সুবিধা পাওয়া গেছে। যতদূর মনে পড়ে নকল বলে কিছু আছে, এটা শিখি ক্লাস ওয়ানে। সেদিন নামতা পড়া ছিলো। ১ থেকে ২০ পর্যন্ত। স্যার এসে লিখতে দিবেন। ১৯এর নামতা আয়ত্বে নিয়ে এসেছি ২০ এর নামতার সাথে সংখ্যা বিয়োগ করে করে। কিন্তু ১৩ আর ১৭ কিছুতেই ম্যানেজ হচ্ছে না।

খুব ভোরবেলা স্কুলে গেছি। ক্লাস শুরু হতে আধাঘন্টার মত বাকি। একরাশ উদ্বেগ নিয়ে নামতা মুখস্ত করছি। বন্ধু শাফা ওরফে শাফায়েত আমার কষ্ট দেখে হাসছে।

: হাসোস ক্যান?

: আরে বোকা! এত কষ্ট কষ্ট করে মুখস্ত করতে হয় নাকি? এই দেখ।

শাফায়েত তার খাতা খুলে দেখায়। ভিন্ন ভিন্ন পাতায় ভিন্ন ভিন্ন ঘরের নামতা লিখা। স্যার যেটা লিখতে দিবেন, সেটাই সে জমা দিয়ে দিবে। তার এই আইডিয়ায় চমৎকৃত হই। কষ্ট করে পড়া বাদ দিয়ে শাফার আবিষ্কারকে অনুসরণ করে খাতার পৃষ্টায় কপি করতে থাকি নামতা বইয়ের দুর্বোধ্য হিসেবগুলো।

একটু কাঁপাকাপি হলেও সময়মতো ঠিকঠাক কাজে লাগে। ১০-এ ১০। কনফিডেন্স বাড়ে।

'দশে মিলি করি কাজ' নীতি প্রফেশনাল নকলের জগতে অনেক সমাদৃত। যারা নকল বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ, তারা নকলকারীদের সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা নিয়ে ঘুরেন, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই। তারা চিন্তাও করতে পারবেন না, নকল কত বড় বৈজ্ঞানিক একটি কাজ; তার পিছনে কতোটা মেধা, কতোটা সৃজনশীলতা আর কতোটা ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার থাকে। কোন নকল কোথায় রাখা আছে, তার জন্য একটা আলাদা লিস্টি থাকে। ওই লিস্টি ধরা খাওয়া হাইপাওয়ার চশমাওয়ালার চশমা হারানো থেকেও বিপজ্জনক। আবার কাছে রাখা নকলের ভল্যুম যত বাড়ে, ধরা খাওয়ার রিস্কও ততোই বাড়তে থাকে। তার ওপর সবকিছু একা কপি মারা মানে মূল্যবান সময়ের নিদারুণ অপচয়। সেযুগে ফটোকপি মেশিনে ফন্ট ছোট করে কপি করার টেকনোলজিও আমাদের আয়ত্বের বাইরে। সুতরাং যা করতে হতো, সবই হাতে খেঁটে।

এ সমস্যা সমাধানে আমরা ক্লাসে শেখা কঞ্চির লাঠিভাঙ্গা গল্পের 'দশে মিলি করি কাজ' নীতির সফল ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে সক্ষম হই। পরীক্ষার আগেই কয়েক বন্ধু মিলে ভাগ করে নেয়া হতো কে কোন প্রশ্নের উত্তর কপি করবে। পরীক্ষার হলে তাই সহজেই ট্রেস করা যেতো, কার কাছে কতো 'নম্বর' পাওয়া যাবে। একজনের লিখা হয়ে গেলে সে পায়ে ঠেলে ঠেলে পাশের জনকে পাস করে দিতো। এভাবে ঠেলার সময় ধরা পড়লেও স্যারকে বুঝতে হিমশিম খেতে হতো ওই নকলের অরিজিন্যাল মালিক কে। এই পদ্ধতির আরো একটা সুবিধা হলো, একজন ধরা খেলেও বাকিদের কালেকশনে যা থাকতো, পাশ করার জন্য তা-ই যথেষ্ট।

শুধু পরীক্ষার হল কেন! এর বাইরেও সময় সুযোগ পেলে মশকো চলতো জামাতে নকলের। একবার সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার এসেছেন স্কুল পরিদর্শনে। আমরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিবো। হোস্টেলে থাকি। স্যারেরা তাকেআপ্যায়ন করে হোস্টেলে নিয়ে এলেন। বলা নেই, কওয়া নেই, এ কী উৎপাত! শুধু মৌখিক হলেও সে এক কথা, উনি ধুম করে' বর্ষাকাল' রচনা লিখতে দিলেন। রুমের চারটি খাট টেনে মিশিয়ে তার ওপরে গোল হয়ে বসে পড়লাম খাতা কলম নিয়ে। সবার মাঝখানে টেস্ট পেপার। উনি দূর থেকে দেখলেন খুব মনোযোগ দিয়ে লিখছি আমরা। আসলে তো ওই টেস্ট পেপার থেকে কপি মারছি।

গোল বাঁধলো খাতা চেক করার সময়। একই গরু দেখে একই রচনা অনেকে লিখতে পারে; কিন্তু বর্ষাকালের রচনা এক হওয়া ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর হলে কি হবে, এ প্রশ্ন আসবে, সেটা আমাদের জানা। উত্তরটাও মুখস্ত তাই। একই বই থেকে সবাই মুখস্ত করেছি বলেই না! ! বাহ বাহ! উনি আমাদের সম্মিলিত মুখস্ত শক্তির প্রশংসা করে বিদায় নিলেন।

হাইস্কুলের একটা অংশ ছিলো টিনের। চালের নিচে গরম ঠেকাতে মুলিবাঁশের আচ্ছাদন। নকল প্রেমীদের জন্য এটা ছিলো এক সুবর্ণ সুযোগ। যারা নকলের ভূবনে একেবারেই নবাগত, তারা বলাকা ব্লেড দিয়ে বেঞ্চের বারোটা বাজিয়ে নকল লিখতো; কিন্তু স্যারেরা এসে ঠিকই সিট চেইঞ্জ করে দিতেন। যারা এক্সপার্ট নকলবাজ, তারা বেঞ্চিতে লিখার মত শ্রমসাধ্য কাজে না গিয়ে ওই মুলিবাঁশ ফাঁকা করে তার মধ্যে বই রেখে

দিতো, নিজের কাছে নকল নেই, চেক করেও স্যারেরা কিছু করতে পারতেন না, পুরোদমে ভদ্রলোক; কিন্তু সময় সুযোগ মতো বই বের করে সরাসরি কপি মারা হতো।

তখন এইটের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা। মুখস্ত বিদ্যা দু' চোখের বিষ হওয়ায় সমাজ ( ইতিহাস, পৌরণীতি, রাজনীতি আর অর্থনীতির খিঁচুড়ী) আমাকে এইট পর্যন্ত নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য কি কি এটা কি মুখস্ত করে রাখার মত কোনো বিষয়? পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে আবার এসব ভেজাইল্যা জিনিস। না লিখলে মার্কস কাটা; অতএব সিস্টেম করতে হলো মুলিবাঁশের ছাঁদের ওপরে রাখা বই থেকে। পরিবেশও সেরকম অনুকূলে ছিলো। ঝুম বৃষ্টি, স্যারও পরীক্ষার হলময় ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে টেবিলে বসে স্থিতিশক্তি সঞ্চয় করতে ব্যস্ত। মেরে দিলাম, দশে দশ। কিন্তু ভীষণ প্রেস্টিজে লাগলো। জাতিসংঘের মায়রে বাপ! কিন্তু সবাই মুখস্ত করতে পারলে আমি পারবো না কেন- এই ফর্মূলায় ওইদিন বিকেলেই ওইপ্রশ্নের উত্তর দাড়িকমাসমেত মুখস্ত করে ফেললাম।

এ শ্রম বৃথা যায় নি, সময় মতো কাজ দিলো। জুনিয়র স্কলারশীপে দেখি আবার একই প্রশ্ন। আমি মুখটিপে হাসি দিয়ে একটানে লিখে ফেলি। পিছন থেকে সেকেন্ড বয় জিগায়, ওইটা পারি কিনা। ওর কমন পড়ে নাই। নো প্রবলেম! এক্সট্রা কাগজ নিয়ে উত্তর লিখে ওকে সাপলাই দেই। এক্সট্রা কাগজে লিখে সাপলাই দেওয়া নকলের এই নিরাপদ পদ্ধতিটা পরবর্তী জীবনে অনেকবার কাজে লেগেছে, যদিও প্রতিবারই আমি হাতেম তাঈয়ের ভূমিকায়।

*পাঁচ. কারেন্ট চুরি*

তখনো পল্লীবিদ্যুৎ আসে নি। সম্ভবত ওয়াপদা সাপলাই দিতো ইলেকট্রিসিটির। বিশাল গোবদা সাইজের মিটারে হিসাব রাখা হতো কত ইউনিট খরচ হলো। অবশ্য অধিকাংশ সময় হারিকেনই ছিলো ভরসা। আমরা তখন ফাইভে। স্কুলের হোস্টেলে থাকি। স্কুল থেকে আধাঘন্টা দূরত্বের মধ্যেই সবার বাড়ি; কিন্তু স্কলারশীপ পরীক্ষায় ভালো করার মহৎউদ্দেশ্যে এই ইনটেনসিভ শাস্তি। শাস্তিকে মাস্তিতে রূপান্তরিত করতে আমাদেরকে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হয় নি। কিন্তু সেসব কাহিনী অন্য দিন হবে। আজ ইলেকট্রিসি নিয়ে বাটপাড়ির কাহিনীই চলুক।

হাইস্কুলের এক স্যারও তখন থাকেন লাগোয়া হোস্টেলে। একদিন খেয়াল করে দেখি, উনার রুমের বাইরে থেকে বিদ্যুতের যে লাইন ভিতরে গেছে, তাতে একটা সেফটিপিন ফুটানো, সেফটিপিন থেকে আবার একটি তার রুমের ভিতরে চলে গেছে। আমাদের স্যার হোস্টেলে না থাকলে অনেক সময় উনাকে দায়িত্ব দিতেন আমাদের দেখাশোনার জন্য। বিভিন্ন আবদারে তার রুমে গিয়ে আমরা সেফটিপিন রহস্যের সমাধান করি। সেফটিপিন থেকে আসা তারের কারেন্টেই চলে উনার রুমের বালবটি, তারের অন্য প্রান্ত আর্থ করা।

আমরা চোরের ওপরে বাটপাড়ি করি। ওই সেফটিপিনেই বড়শি লাগিয়ে তার বেঁধে স্যারের নীতি ফলো করি। উনি মাঝে মাঝে খুলে ফেলেন, আমরা আবার বড়শি লাগিয়ে দেই। সরাসরি চার্জও করতে পারেন না, তাহলে উনার চুরিদারিও যে ফাঁস হয়ে যাবে!

গোল বাধে কিছুদিন পরে, যখন স্যারের আর্থের তার উঁইয়ে খেয়ে ফেলে। উনি সেফটিপিন সিস্টেমে ইলেকট্রিক হিটার চালাচ্ছিলেন। উঁইয়ে খাওয়া নড়বড়ে আর্থের কল্যাণে প্রচন্ড স্পার্কিং হয়, আগুন ধরার হাত থেকে কোনোমতে বেঁচে গিয়ে উনি সেফটিপিন প্রজেক্ট বাতিল করে দেন। আমরাও বঞ্চিত হই ফ্রি ইলেকট্রিসিটি থেকে।

*ছয়. আকাশের সখ্যতা*

"গ্যালিলিওর পরে আর কেউ নাকি আমার মত করে আর আকাশ দেখেনি।" এক বন্ধুবী কথাগুলো বলেছিলো মজা করে। তখন কবিতা লিখা হত খুব। আকাশ- চাঁদ- তারা- অসীম শূন্যের সীমা খোঁজা! কেউ কি কোনো রাতগভীরে নিঃশব্দ আকাশে দৃষ্টির লাগাম ছেড়ে দিয়েছেন কখনো? চাঁদটাকে ছাপিয়ে, কাছের তারাটি থেকে আরও দূরে, তারপর দূরে আরও। অন্তহীনতার অনুভব করেছেন কখনো? নিজের ক্ষুদ্রতার মহত্তম উপলব্ধি পেতে আকাশের চেয়ে বড় বান্ধব আর কাছে যাওয়া যায়?

প্রাইমারি স্কুলের শেষ বছর। গরমের দিনে স্কুল হোস্টেলের ছাদে ঘুমাতাম দল বেধে। পাটি বিছিয়ে, তারপরে তোষক, বালিশে মাথা ঠেকিয়ে শবাসনে ঠায় আকাশের দিকে তাকিয়ে একদল বন্ধু কথা বলতাম, গীবত, অন্যকে নাজেহাল করার গল্প, তারপর একসময় সুনসান চুপ হয়ে যেতাম সবাই আকাশের সাথে সবার মিতালী। ঘুম এসে একসময় ভাসিয়ে নিয়ে যেত। ভোররাতে বাথরুমের চাপে ঘুম ভাঙ্গলে ফিরে আসতাম নিজের রুমে।

একবার এরকম ঘুমিয়েছি। চৈত্র- বৈশাখ হবে। গরমের গায়ে হাত বুলিয়ে ঠিকই ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে ঝিরঝিরে বাতাসের পাখা। অনেক রাত্রে ধড়মড়িয়ে উঠি। আকাশে আর নক্ষত্র নেই কোনো। নিকষ কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেছে সমস্ত আকাশ। প্রবল বাতাস। ঘূর্ণিঝড় আসছে সবকিছু তছনছ করে। সবক' টা বন্ধু ভেগেছে ইতোমধ্যে। কোনোমতে তোষকটা পাকিয়ে বালিশটা হাতে দে দৌড় সিড়ির দিকে। আমার ছোট্ট পলকা দেহটা তখন সেই বোঝা হাতে কালবোশেখীর সাথে যুদ্ধে মগ্ন। খুব ইচ্ছে হয়েছে সেই ৯ বছরের শিশুটার একটা ছবি কোনো ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে।

পারি নি। না লিখায়, না তুলিতে!

# স্বপ্ন বোঝাই কাগজের নৌকা আমার

**অমিত আহমেদ**

---

বাবা আমাকে কখনও তেমন কোন খেলনা কিনে দেননি!

খেলনা পাবার তাগিদটা আমিও কোন অজানা কারনে কখনো অনুভব করিনি। ব্যাপারটা এমন যে আমাকে যে খেলনা কিনে দেয়া হয়নি - সেটাই আমি খেয়াল করেছি এই মাত্র ক'দিন আগে! কানাডার বন্ধুদের সাথে ছোটবেলার আলাপ হচ্ছিল। ওরা সবাই মিস্টার পটেটোহেড, জিআইজো, বারবি আর ট্রান্সফর্মারের ধাপ পার হয়ে এদ্দুর এসেছে।

সে আলোচনায় অংশগ্রহন করতে গিয়ে দেখলাম আমার আসলে সে সময় কোন খেলনাই ছিল না! একদম ছিল না বললে মিথ্যাচার হয়ে যাবে। মাথায় লাল-নীল বাতি সহ একটা খেলনা পুলিশের গাড়ি আমার ছিল - সেটা কোন জন্মদিনে কারও উপহার দেয়া। সে গাড়িটাও সিড়ি থেকে ফেলে দিলে কি হবে সে আবিষ্কারের নেশায় শতটুকরো করা হয়েছিল।

আমার ছোট ভাই সমিত আমার চার বছরের ছোট। ওকেও কোন খেলনা কিনে দেয়া হয়নি। কাকতালীয় ভাবে সমিতের একমাত্র খেলনাটাও জন্মদিনে পাওয়া, সেটা আবার একটা পুলিশ মটর সাইকেল। সে মোটর সাইকেলে সানগ্লাস পরা, সটান বসা এক প্লাস্টিকের পুলিশও ছিল। আমার উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিয়ে মা সেটাকে বেশিরভাগ সময় আমাদের নাগালের বাইরেই রাখতেন!

খেলনা না কিনে দেয়ার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে সেটা নিয়ে আমি বেশ কিছুদিন থেকেই ভাবছি। বাবাকে জিজ্ঞেস করলেই অবশ্য জানা যায়, কিন্তু এখন দেশের বাইরে থাকি বলে অল্পতেই বাবা-মার ব্যকুল হয়ে ওঠার বদঅভ্যাস হয়েছে।
এখন আমাকে ছেলেবেলায় খেলনা কেন কিনে কেন দেয়া হয়নি সে কৈফিয়ত চাইলে দু'জনেই মহা পেরেশানীতে পড়ে যাবেন। ভাববেন, আহা ছেলাটা না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে ছেলেবেলার সে ঘটনা মনে করে! এ নিয়ে আমাকে নিদেন পক্ষে দুই দিন ফোনে কথা বলে পরিষ্কার করতে হবে, মন খারাপ নয়, এমনিতেই জানতে চাইছিলাম।

আমার মনে হয় না এ নিয়ে কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাবার ছিল। আমাদেরকে খেলনা কিনে দেয়া হয়নি কারন আমরা কখনও চাইনি। আর বাবাও প্রয়োজন বোধ করেন নি। ব্যাপারটা অর্থনৈতিক নয় - পরিবারের প্রথম সন্তানের আবদার মেটাবার সামর্থ্য বাবার পুরোদমেই ছিল।

খেলনার অভাবেই হয়তো, আমি পড়তে শিখেছি খুব তাড়াতাড়ি। ক্লাস টুতে থাকতেই আমি ধুমিয়ে রঙিন ছবিওয়ালা গল্পের বই পড়া শুরু করেছি। বাবা খেলনা কিনে না দিলে কি হবে, বই কিনে দেবার ব্যাপারে উদারপন্থী ছিলেন। ক্লাস থ্রীতে উঠতে না উঠতে আমার মণীষীদের ছেলেবেলার তিনটে খন্ডই পড়া শেষ।

আমার কল্পনা শক্তি যেটা আছে সেটা হয়তো ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার অভ্যাসের কারনে। অন্যরা যখন ট্রান্সফর্মার পেন্সিল বক্স নিয়ে খেলতো, তখন আমি দেখতাম আমাদের বিল্ডিং বেয়ে তড়তড়িয়ে উঠে যাচ্ছে স্পাইডারম্যান। অন্যরা যখন লোগো সাজিয়ে গাড়ি বানাতে ব্যস্ত, তখন আমি পলিথিন কেটে বানাতাম প্যারাস্যুট।

আমার ছোট ভাইটাও ছিল একদম আমারই মত। ও হাঁটতে শেখার পর থেকে মনে হয় না কখনও আলাদা থেকেছি আমরা। আমাদের মধ্যে প্রতিযোগীতা ছিল, প্রতিদ্বন্দীতা ছিল, কাকে বাবা-মা বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন সে নিয়ে রেশারেশী ছিল, গুহামানবদের মত অদম্য মারামারিও ছিল, কিন্তু একজন আরেক জনকে ছেড়ে যে থাকা যায় সে ধারণাটা ছিল না। দেখা যেত এই হয়তো মারামারি-রক্তারক্তি হয়ে গেল, এর পরমুহূর্তেই দু'জনে মহানন্দে মার চোখ ফাঁকি দিয়ে শিরীষ কাগজ দিয়ে বারান্দার রেলিংয়ের রং সাফ করছি। ও পড়তে শেখার আগে আমিই পড়ে শোনাতাম কাঠুরের কুড়াল হারানোর গল্প কিংবা ছোট্ট মাছের বাঁধের পানিতে আটকা পড়ার গল্প।

## ঢাকার বাতাসে গ্রামের গন্ধ

আমদের আদি বাসস্থান ছিল মিরপুরে। আমার জ্ঞান হবার পরে দেখেছি যতদূর চোখ যায় কেবল ধানি জমি। আউশ-বোরো দুইই ফলতো। ছিল পুকুর, যেখানে জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরতেন। আর ছিল সারি সারি আম, জাম, পেয়ারা, বড়ই আর করমচার গাছ। বেশি দিন আগের কথা না কিন্তু! অথচ এখন নিজের কাছেই নিজের

অবাক লাগে ঢাকার বুকে এমন জায়গা থাকতে পারে ভেবে! তখন পীরেরবাগ নামের সে জায়গাটাতে রিক্সাও যেত না। শ্যাওড়াপাড়ায় নেমে গিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটতে হতো।

প্রথমদিকে আশে পাশে উঁচু কোন বাড়ি ছিল না আমাদের তিনতলা বাড়িটা ছাড়া। আমাদের বাসার একদম সামনেই ছিল রিটায়ার্ড সৈনিক চৌধুরী চাচার একতলা বাসা। সে বাসার নামটাও সেই রকম টংকার মেশানো "রণকেলী"! চৌধুরী চাচারা থাকতেন সিলেটে, তাই বাসাটা খালিই পড়ে থাকতো। সে বাসার সামনে দুটো টেনিস কোর্ট ফেলা যায় এমন একটা উঠোন ছিল, আর সে উঠোন ঘিরে ছিল আম, জাম আর পেয়ারা গাছ।
ডান দিকে ছিল মিতুদের টিনশেড বাসা। মিতু আমার কয়েক বছরের ছোট হবে হয়তো।
মিতুদের বাসার সাথেই লাগানো ছিল সিদ্দিক চাচাদের টিনশেড বাসাটা। রবীন্দ্রভক্ত সিদ্দিক চাচার বাসাটার নামটা ছিল খুব সুন্দর "সোনার তরী"। সে বাসার সামনেই বোম্বাইওয়ালাদের পাকা একতলা দালান। ও বাসায় যাঁরা থাকতেন তাঁরা আসলে ভারতীয়, এসেছিলেন বোম্বাই (হালের মুম্বাই) থেকে... সেই থেকেই নাম হয়ে গেছে বোম্বাইওয়ালার বাসা। উনারা মিশতেন না কারো সাথেই, বাসার চারপাশে দেয়াল, আর সে দেয়ালের একমাত্র দরজাটা যে সব সময় তালাবন্ধ থাকতো তা বেশ মনে আছে।
আমাদের বামদিকে একটু দূরেই আট-দশটা পরিবারের একটা ছোটখাট বস্তি ছিল। সেখানে থাকতো রিক্সাচালক, মুড়ি বিক্রেতা, পুরানো সংবাদপত্রের সওদাগর সহ আরও কিছু খেটে খাওয়া লোক।

আমার বাবা-মাকে যেসব কারনে আমি সম্মান করি তার একটা হলো বাংলাদেশীদের মজ্জাগত অর্থনৈতিক বৈষম্যতার বোধটা তাঁরা কখনোই আমার মাঝে ইমপ্ল্যান্ট করার বদচেষ্টা করেননি। মিতু, সিদ্দিক চাচার মেয়ে শাকিলা, সুমিদের সাথে আমি যেমন খেলেছি, ঠিক তেমনি খেলেছি বস্তির রহিম, করিম, জাকির আর জোহরাদের সাথে।

ক্লাস টু-থ্রী পর্যন্ত সমিতকে বাসায় রেখে খেলতে যেতে হতো আমার। বস্তির ছেলেমেয়েদের সাথে সবাই যে খেলতে পারেনা সেটা আমি প্রথমদিকেই বুঝে ফেলি যখন দেখি ওদের সাথে খেলতে মানা আমার অন্য বন্ধুদের। আমি দু'দলেই সমান ভাবে ছিলাম বলে আমাকে নিয়ে একটা টানাটানি ছিল। অন্যদলে সমবয়সী কোন ছেলে ছিল না বলে আমি রহিম, করিম, জাকিরদের সাথেই তুলনামূলক বেশি সময় পার করেছি। স্কুল থেকে এসেই বেড়িয়ে পড়তাম। দলবেঁধে ধানক্ষেতের আইলে ঘুরে বুনো হাসের বাসা খুঁজে বের করতাম। পাটকাঠি দিয়ে ফাৎনা, বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ছিপ আর এক টাকার চাঁপা শুটকি দিয়ে টোপ বানিয়ে ধরতাম মাছ। মায়ের সেলাইয়ের বাক্স থেকে সুতো সরিয়ে ঘুড়ির জন্য কখনও ডিম দিয়ে মারতাম ডিমমাঞ্জা আবার কখনও টিউবলাইট গুড়ো করে কাঁচমাঞ্জা। চলতো কোকের কর্ক এক মাথায় লাগিয়ে লাটিমের সুতো প্যাঁচানো আর পাউডারের কৌটো ফুটো করে নাটাই বানানো।

গ্রীষ্মকালে আমাদেরকে পাওয়া যেত গাছে। আম-জাম-পেয়ারা গাছে আমরা সারাটা দিন কাটিয়ে দিতাম। মা খুঁজে না পেলে প্রথমেই মাথা তুলে দেখতেন গাছের উপরে। কোন গাছে কি ফলেছে তার এত বেশি হিসাব থাকতো আমাদের কাছে যে কোন পেয়ারা গাছের কোন ডালের কোন পেয়ারাটা খোয়া গেছে তা আমরা ঠিক ঠিক ধরে ফেলতাম!

শামুক ঘষে আম ছিলার যন্ত্র তৈরী হতো, সেটা নিয়ে যাওয়া হতো পিঠাপিঠি দু'ভাই রহিম-করিমের ছাপড়ায়। সেখানে ওদের কর্মজীবী মা আমাদের ঘরে বিক্রির জন্য বানানো মুড়ির মোয়া খেতে দিতেন। ওদের বাসায়

দুপুরের খাবার খাওয়ার অভিজ্ঞতাও আমার আছে। বস্তির ছোট-বড় সবার নির্লোভ ভালবাসা আমি আর আমার ছোট ভাই পেয়েছি।

দিন যাবার সাথে সাথে চোখের সামনে কেমন ধুম-ধাম পালটে গেল পীরেরবাগ! চোখের সামনেই বাড়লো দোকানপাট, উঠলো বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট, ঢালাই হলো পাকা রাস্তা, আর সেই সাথে বাড়লো মানুষের ভিড়। সে সাথে বন্ধুর সংখ্যাও বাড়লো আমার। দূরত্ব বাড়তে শুরু করলো রহিমদের সাথে। ওদের চেয়ে নতুন বন্ধুদের সাথে ফুটবল, ব্যাডমিন্টন আর ক্রিকেট খেলাটাই বেশী লোভনীয় ছিল আমার কাছে।

বছর তিনেক আগের কথা। ঈদের দিনে মিরপুরের পুরানো বাড়িটায় যাচ্ছি, সেখানে এখনো আমার আত্মীয়রা থাকেন। যাবার পথে দেখা জাকিরের সাথে। সে রিক্সা থেকে হাত নেড়ে হইহই করে উঠলো, "অমিত, এই দিকে! এই দিকে!" আমি লাফ দিয়ে ওর রিক্সায় উঠে পড়লাম। সে রিক্সা চালনায় তার পারদর্শীতায় আমাকে মুগ্ধ করতেই হয়তো ঝড়ের বেগে রিক্সা ছুটালো! আমি ভয়ার্ত ভাবে দুই হাতে হুড ধরে বসে থাকলাম। সে নাকি সিজনাল রিক্সা চালক। নিজের দু'টো রিক্সা আছে। এমনিতে ভাড়া দেয়, কিন্তু যেসব দিনে ভাড়া বেশী ওঠে সেসব দিনে নাকি ও নিজেই একটা রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে যায়। রিক্সা থেকে নেমে ঈদের কোলাকুলি করতে গিয়েছি, জাকির কেমন জানি বিব্রত হয়ে জড়সড় হয়ে গেল, কাঁচুমাচু মুখ। অনুভব করলাম সে আড়ষ্ঠতায় শরীর শক্ত করে রেখেছে! ফেরত আসার পথে রহিমের সাথে দেখা। সে নাকি মুদির দোকান দিয়েছে। ওর সাথে কোলাকুলি করতে গিয়েও সেই একই ঘটনা!

বুঝলাম যে অসমতার বোধটা আমাদের আগে ছিল না সে বোধের বীজটা খুব যত্নের সাথেই আমাদের বুকের মধ্যে পুঁতে দিয়েছে আমাদের তথাকথিত সভ্যতা!

## রান্নাবাটি আর বোমবাস্টিক

বস্তির ছেলেগুলো ছাড়া আর কোন সমবয়সী ছেলে ছিল না মহল্লায়, তাই ছেলেবেলায় মেয়েদের সাথে রান্নাবাটিও খেলেছি অনেক। আমি গৃহকর্তার ভাবগম্ভীরতা বজিয়ে রেজে ঝোপঝাড়ে বাজার করতাম। ইটের গুড়ো, ঢোল কলমি ফুল, কাঁটা গাছের লাল-লাল ফল আর থোকা বেলেঞ্চা। মেয়েদের সে কাল্পনিক রান্নার প্রশংসা কিংবা সমালোচনাটাও আমাকেই করতে হতো। এ খেলায় আমার ছোট্ট ভাইটাও আমার সাথে থাকতো। সে আমার চেয়েও গম্ভীর ভাবে মাছ কিনেছে এমন ভাবে গাছের পাতা ঝুলিয়ে নিয়ে আসতো। মেয়েদের সাথে আরও খেলতাম বউছি, কানামাছি, রুমালচোর। এমন অনেক হয়েছে আমি রান্নাবাটি খেলছি আর দূর থেকে রহিমরা টেনিস বল নাচিয়ে বোমবাস্টিকের লোভ দেখাচ্ছে আমাকে। সে সময়ে বোমবাস্টিকের সাথে রান্নাবাটিটাও সমান ভাবেই লোভনীয় ছিল।

## অদল-বদল

বেস্টফ্রেন্ড বলে যদি কিছু থাকে তবে শর্মী আমার প্রথম বেস্টফ্রেন্ড। আমি টুতে পড়ার সময়ই মনে হয়, শর্মীরা আমাদের তিন তলাটা ভাড়া নিল।

শর্মীর সাথে ঘনিষ্টতা বাড়ার সাথে সাথে পাড়ার অন্যদের সাথে ঘনিষ্টতা কমতে লাগলো। শর্মী খেলাধুলা তেমন করতো না। ও ব্যস্ত থাকতো লেখাপড়া আর গানবাজনা নিয়ে। তাই মহল্লার খেলার মাঠে ওকে তেমন দেখা যেত না।

আমরা দু'জন সবসময় একসাথেই থাকতাম। ওকে নিচে রেখে আমি বানরের দক্ষতার পেয়ারা কিংবা আম গাছে উঠে পড়তাম। সে আম শর্মী আর ওর বড় বোন সীমা আপু কুচিকুচি করে কেটে চাটনি বানিয়ে ফেলতো। সে চাটনি আমরা আমাদের দেয়ালে পাশাপাশি বসে অমৃতের আনন্দে খেতাম। সমিত তখনো ছোট বলে বাসার গন্ডির বাইরে ওর যাবার মানা ছিল। তাই আমাকে-শর্মীকেও বাইরে যেতে দেবে না এমন একটা জিদ ছিল ওর। কখনো বড়ইয়ের লোভ, কখনো অন্যকিছু বলে আমরা ফাঁকি দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়তাম।

শর্মী আর আমি একই ওস্তাদের কাছে গান শিখতাম। আমার গানে আগ্রহ ছিল না বিন্দুমাত্র। মা গান করতেন তাই তাঁর ইচ্ছাতেই এই জগদ্দল পাথর আমার কাঁধে চাপানো হয়েছিল। আমার গান শেখা তাই বেশী দূর এগুলো না। শর্মী অসাধারণ গান করতো। সময়ে-অসময়ে রেয়াজ করতো মেয়েটা। আর সে শুনে আমাকে বকতেন মা, "দেখেছো, মেয়েটা কত রেয়াজ করে? তুমি বসো কখনো হারমনিয়ামটা নিয়ে?" সে একটা সময়েই কেবল প্রচন্ড রাগ উঠতো ওর উপর।

দিন বাড়ার সাথে সাথে আমাদের ঘনিষ্টতাও বেড়েছিল। যে সময়টায় আমাদের "প্রেম" শব্দটার মানে বোঝার বুদ্ধি হয় সে সময়ের আগে থেকে বন্ধুত্ব বলেই হয়তো আমাদের সম্পর্কে কোন জড়তা আসেনি। আমরা একজন আরেকজনকে বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি কখনো। কিন্তু তবু মহল্লার দেয়াল গুলো ভরে গেল "অমিত + শর্মী" লেখায়! আমার প্রচন্ড রাগ উঠতো সে লেখাগুলো দেখলে। সমিত আর শর্মীকে নিয়ে ইট ঘষে ঘষে মুছতাম সেসব লেখা। এ নিয়ে পরে শাকিলা-জোহরার সাথে ঝগড়াও লেগে গেল। হাতাহাতি হয়ে গেল রহিম-জাকিরের সাথে। তখন সমিতও বেশ কাবিল হয়েছে। ও স্পাইয়ের মত আমাকে এসে জানাত, "ভাইয়া, ওই দেয়ালে লিখেছে!"

ক্লাস সিক্সে প্রথম প্রেমপত্র পাই পাড়ার এক মেয়ের কাছ থেকেই। নামটা বলতে চাচ্ছিনা। মেয়েটা লাজুক লাজুক ভঙ্গিতে হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিল। আমি খুলতে গেছি, সে বলে, "না অমিত! এখানে না! বাসায় গিয়ে পড়বে!"
আমি বললাম, "বাসায় গিয়ে পড়তে হবে?"
ও বলল, "হুম! কাউকে দেখাতে পারবে না! গোপন!"
কি রকম একগুঁয়ে ছিলাম আমি তাই ভাবি! মেয়েটার বেদনার্ত চোখের সামনে আমি চিঠিটা টুকরো টুওরো করে ফেললাম! বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, "আমি গোপন চিঠি পড়ি না!"

শর্মীরা বাসা ছেড়ে চলে যায় সম্ভবত আমি যখন সিক্স কি সেভেনে। আমার মনে আছে সেরকম দুঃখ আমি এর আগে আর কখনো পাইনি! যে মেয়েটা ছিল আমার সব কিছুর সঙ্গী, যে মেয়েটা আমার নাখ দিয়ে রক্ত পড়া দেখে কেঁদে ফেলতো, যাকে ছোট বলে আমি ঈদে সালাম করার ফতোয়া জারি করতাম, সে চলে যাবার অনেকদিন পরও আমি শর্মী আর কাছে নেই সে ধারণাটা আমি মেনে নিতে পারিনি। বিশ্ব উদ্ধার করে যখন সে ঘটনা বলার জন্য শর্মীর খোঁজে বেরিয়েছি, খঁচ করে মনে পড়েছে ও নেই! তখন বয়সটা আবেগ ঢেকে রাখার বয়স। আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটির চলে যাওয়ার বেদনা আমি কাউকে প্রকাশ করিনি। এমন একটা ভাব করেছি, চলে গেছে তো কি হয়েছে! আমার কি বন্ধুর অভাব!

ক্লাস টু পর্যন্ত আমি পড়েছি সানরাইজ কিন্টারগার্টেনে। সে স্কুল এখনও টিকে আছে নাকি কে জানে। সে স্কুলটা হয়তো ইংলিশ মিডিয়াম ছিল না, কিন্তু ইংলিশে জোর দেয়া হতো ভালই। সে সময় ভাল স্কুল বলতে সবাই তিনটে স্কুলকে চিনতো - গভঃ ল্যাব, ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ আর সেইন্ট জোসেফ। থ্রীতে ওঠার আগে বাবা ঠিক করলেন আমাকে ধানমন্ডি গভঃ বয়েজের ভর্তি পরীক্ষা দেয়ানো হবে। গভঃ ল্যাব বাতিল করা হলো কারন ফর্ম কিনতে যাবার দিন ঢাকা কলেজ আর গভঃ ল্যাবের ক্লাস টেনের তুমুল মারামারি - পুলিশের টিয়ারগ্যাস খেয়ে বাবা বললেন, "ওখানে পরীক্ষা দেয়ার দরকার নাই।" সেইন্ট জোসেফ বাতিল হয়ে গেল ইংলিশ মিডিয়াম বলে। এটাও আমার বাবা-মাকে শ্রদ্ধার আরেকটা কারন।

সে সময়ে বাচ্চাদের ভর্তিযুদ্ধ নিয়ে আমার কোন ধারণা থাকার কথা না, ছিলও না।

আমাদের পাড়ায় পিকনিক করার একটা রেয়াজ ছিল। বড় আপুরা সবার বাসা থেকে চাল-ডাল-মাংস নিয়ে "রণকেলী"র উঠোনে খড়ি-পাতা জ্বালিয়ে রান্না করতো। সে বাসায় কেউ থাকতো না বলে বাসার উঠোনটা আমাদের সবার হেডকোয়ার্টারের মত ছিল বলা যায়।

তেমনই এক পিকনিকে আমি এক বিশাল ম্যাসাকার বাঁধিয়ে শর্মীকে নিয়ে গুম হয়ে মাঠের এক কোনে বসে আছি। রণকেলীর ছাদের সিড়ি ছিল বাইরে। তো কাহিনী হয়েছে এই রকম, সেই সিড়ি দিয়ে একগাদা বড় বড় মাটির ঢেলা নিয়ে আমি আর শর্মী ছাদে উঠেছি। আমাদের পরিকল্পনা ছাদ থেকে লুকিয়ে বড় আপুদের গায়ে ঢিল মারা। প্রথম মাটির ঢেলাটা খুব তাক করে মেরেছি, সেটা গিয়ে পড়েছে ডালের পাতিলে। কেউ দেখেনি বলে রক্ষে। আমরা চোরের মত নেমে গিয়ে ভাল মানুষের মত মুখ করে মাঠের এক কোনায় গিয়ে বসেছি। এমন সময় দেখি বাবা গাড়ি থেকে নামলেন। এই দুপুরে বাবার অফিস ছেড়ে বাসায় আসার কথা না। আমি বুঝে গেলাম কিছু একটা ঘটেছে। তাও বাবার হাতে মিষ্টির প্যাকেট। আমরা যেই ছুটে কাছে গিয়েছি বাবা আমাকে কোলে তুলে সবার সামনে চুমু খেয়ে ফেললেন। আমি বাবার এ অবিবেচনায় জানপরনাই বিরক্ত হয়ে আড়চোখে ঘটনাটা কে কে দেখেছে ঠাওর করার চেষ্টা করছি, এদিকে মা গাড়ির শব্দ শুনে বারান্দায় চলে এসেছেন... বাবা চিৎকার করে বললেন, "ছেলে চান্স পেয়ে গেছে! রেজাল্ট নিয়ে এলাম।"

এতদিন চলে গেছে আমার যে কোন সাফল্যে বাবা-মার উত্তেজনা এখনও ঠিক আগের মত। পরীক্ষার রেজাল্ট হোক, রিসার্চ অ্যাওয়ার্ড হোক, মাস্টার্স কনভোকেশন হোক কিংবা হোক পিএইচডি অ্যাডমিশন, বাবা এখনো আগের মতই চিৎকার করে সারা দুনিয়াকে জানান, মা সেই আগের মতই গর্বের সাথে চোখের জল মোছেন। আসলে অনেক কিছুই বদলায় না। থেকে যায় ঠিক আগের মতই!

আবার বদলায় অনেক কিছুই। কলেজে পড়ার সময় এক বিয়ে বাড়িতে দেখা হয়ে গেল শর্মীর সাথে। আমার মা আর ওর মা খুব উত্তেজনা নিয়ে আমাদের দু'জনকে পাকড়াও করে একসাথে করে দিলেন। ছোট বেলার দুই বন্ধু দু'জনকে দেখে কি করে তা দেখার জন্য তাঁদের বাঁধ ভাঙা উত্তেজনা। আমি দেখলাম সালোয়ার-কামিজ পড়া এক তরুনী। এত্ত বড় হয়ে গেছে! ওকে তো ফ্রক ছাড়া দেখিনি কখনো! তেড়েফুঁড়ে বেড়ে ওঠা মেয়েটা আমাকে দেখে চোখ নামিয়ে নিল।
"কেমন আছ?" জিজ্ঞেস করে আর কিছু বলার খুঁজে পেলাম না আমরা। আমি আমার দু'হাত ভাজ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আর ও ওড়নার এক প্রান্ত আঙ্গুলে প্যাঁচাতে লাগলো। আমাদের মা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, ওঁদের সামনে কথা বলতে পারছি না ভেবে আমাদের একা রেখে চলে গেলেন। ওঁদের চলে যাবার পরও

আমরা নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। প্রজাপতির মত হাজার চিন্তা মন থেকে গলা পর্যন্ত এসে কথা হয়ে বেরুতে না পারার কষ্ট হয়েই আটকে থাকলো। আমাদের আর কথা হলো না!

## গার্ডিয়ান এঞ্জেল

সমিত আমার মতই প্রথমে সানরাইজ কিন্টারগার্টেনে ভর্তি হয়। সেখানে কেজি ওয়ান, কেজি টু পড়ে ও ধানমন্ডি গভঃ বয়েজের এলিমেন্ট্রি সেকশনের ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়ে গেল। মর্নিং শিফটে এলিমেন্ট্রির ক্লাস হতো, আমরা বলতাম "ফীডার সেকশন"!

সে সময়টাতে আমার ছোট ভাইটা বেশ নাদুশ-নুদুশই ছিল। সে নিয়ে ওকে কেউ কিছু বললেই, হোক সেটা স্কুলে কিংবা পাড়ায়, সরাসরি আমাকে এসে নালিশ জানানো হতো। শুনে মাথায় রক্ত উঠে যেত আমার, ছোট ভাইকে নিয়ে সেই নচ্ছারের খোঁজে রেরুতাম। এ নিয়ে কত মারামারি যে করেছি! আমাদের শোবার জায়গা ছিল আলাদা, কিন্তু রাতে ভয় পেয়ে প্রতি রাতেই পিচ্চি সমিত চলে আসতো আমার বিছানায়। আমাকে বিরক্তির শিখরে পৌঁছে দিয়ে ঠেলেঠুলে জায়গা করে নেয়ার চেষ্টা করতো আমার কম্বলের তলায়। আর ছোট ভাইয়ের নালিশ গুলো সাধারণত আমার কাছেই হতো। বাবা-মার কাছে ওর নালিশ গুলো হতো আমাকে নিয়ে, "আম্মু, ভাইয়া আমাকে খেলতে নেয় না।" কিংবা "আম্মু, ভাইয়া মারে!" দু'জনে যতই মারামারি হোক না কেন, আমাদের দু'জনকে কখনো আলাদা করা যেত না। দাবা, ইয়ো-ইয়ো, হাউস অব ডেড, ফিফা ৯৪, সিনেমা, বই, টিভি সবই আমরা একসাথেই করেছি! সেই আঠার মত লেগে থাকা ভাই এখন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী। কানাডা-অস্ট্রেলিয়া সময় সমীকরণ মেলাতে না পারায় আমাদের দেখা নেই প্রায় চারটে বছর!

তবে আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে যে পক্ষপাতিত্বটা আগে ছিল সেটা এখনও পুরোদমেই আছে। আমি যাই করি না কেন, আমি নিশ্চিত থাকি ওর সমর্থন আমি পাব। সেও জানে যে কোন সমস্যায় ভাইয়া আছে সাথে।

## মা-বাবা

আমার বাবার রাগ প্রচন্ড। আমরা দুই ভাই কত মার যে খেয়েছি বাবার হাতে। বাবার আবার মারার পরই মন খারাপ হয়ে যেত। সে মন খারাপ দূর করার জন্য আবার নানান বাহানা হতো। হয়তো হুট করে বের হয়ে ইগলুর এক বাক্স আইসক্রিম নিয়ে এলেন। পেটুক সমিতকে হাতে আনার জন্য অবশ্য সেটাই যথেষ্ট ছিল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে বাবার কাছে গিয়ে বলতো, "আইসক্রিম? আব্বু??" ওর সব রাগ পানি! আমার রাগটাও বেশী, জিদটাও বেশী। আমি গুম হয়ে বলতাম, "খাব না"। বাবা সাধাসাধি করে না মানাতে পেরে রাগ করে চলে যেতেন। আর একটু পর পর মা কে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, "অমিত আইসক্রিম খেয়েছে?" রাগ আমারো ভাঙতো ঠিকই, একটু দেরি লাগতো, এই আরকি! তখন আমি বাবার গেঞ্জির ভেতরে পেটে মাথা রেখে শুয়ে থাকতাম। এ অভ্যাসটা আমার অনেকদিন পর্যন্ত ছিল।

বাবার সিগারেটের ভাল নেশা ছিল তখন। দিনে দেড় প্যাকেট গোল্ডলীফ লাগতো কম করে হলেও। সে বদঅভ্যেস ছাড়তে হলো প্রধাণত সমিতের জন্য। ওকে বোঝান হলো সিগারেট খারাপ, মানুষের খারাপ রোগ হয়। আর যায় কোথায়, সিগারেট দেখলেই চিৎকার করে বাসা তোলপাড় করতো ও। সব ভেঙে টুকরো-টুকরো করতো। একদিন মার খেয়েছে এজন্য বাবার কাছে। কিন্তু আমাদের জন্য ওর মায়াটা বোধহয় একটু বেশিই।

মার খেয়ে সে হাউমাউ করে কাঁদছে ঠিকই কিন্তু সেই সাথেই বলছে, “আর খাবা না! বল আর খাবা না।” সেই বিলাপ শুনে কি হলো বাবার কে জানে, সেই যে সিগারেট ছাড়লেন, ছাড়লেনই। আর খাননি কক্ষণও!

মাঝে মাঝে আমাদেরকে নিয়ে এখানে সেখানে যেতেন বাবা। অফিসে, মেলায়, পার্কে এমনকি ঘরোয়া রাজনৈতিক মিটিংয়েও। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল্য বই পড়ে জানতে হয়নি আমাদের, আমাদের রক্তেই ছিল সেটা। একটা ঘটনা বলি। বাবার সাথে কোন একটা মিটিংয়ে গেছি। বাবা একজন সাদামাটা লোককে দেখিয়ে বললেন, “উনার নাম কাদের সিদ্দিকী, খুব বড় মুক্তিযোদ্ধা!” আমার বয়স তখন কত হবে, ১০/১১। আমি পকেট থেকে খাতা বের করে উনার কাছে গেছি অটোগ্রাফ চাইতে। উনি বিস্ময় নিয়ে খাতায় স্বাক্ষর করতে করতে বললেন, “তুমি জান আমি কে?”
আমি বললাম, “মুক্তিযোদ্ধা!”
উনি বললেন, “মুক্তিযুদ্ধ কি তুমি জান?”
আমার জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে দেখে আমি গলায় আঁচ এনে বললাম, “জানবো না কেন? আব্বুর কাছে শুনছি না!”
উনি বললেন “বাবা, তোমার আব্বু কোথায়?” আমি হাত তুলে দেখিয়ে দিলাম।
উনি গিয়ে বাবার হাত ধরে ফেললেন, “আপনি নিশ্চই মুক্তিযোদ্ধা! একজন মুক্তিযোদ্ধাই পারে ছেলেকে এমন শিক্ষা দিতে!”

আমরা দুই ভাইই খুব মা ঘেঁষা ছেলে। মা যখন রান্না ঘরে সবজী কাটছে আমি তখন গুটিগুটি পায়ে গিয়ে মাকে পেছন থেকে জড়িয়ে থাকতাম। মাঝে মাঝে মটরশুটিটা- সজনেটা বেছে দিতাম। মার অনুমতি ছাড়া কখনো কিচ্ছু করতাম না আমি। ফ্রীজটা খোলার আগে পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতাম, “আম্মু খুলবো?” আর প্রতিদিন মুখে তুলে খাইয়ে দেয়া তো আছেই। এ অভ্যেস গুলো এখনো অনেকটাই থেকে গেছে।

শর্মীর মা এটা নিয়ে খুব ঠাট্টা করতেন মনে আছে। উনি বলতেন, “বিয়ের পর কি হবে? কে খাইয়ে দেবে?” আমার খুব রাগ উঠতো তখন। বলতাম, “আম্মুই খাওয়াবে!”
উনি দুষ্টুমি ভরে বলতেন, “কেন বউ খাওয়াবে না?”
আমি সে প্রশ্নের জবাবও দেয়ার প্রয়োজন বোধ করতাম না!

## সেন্টু চাচ্চু, মিলিন আর লিসা খালামনি

বাবারা দশ ভাই বোন। সাত বোন, তিন ভাই। বাবার বড় এক বোন, আর বাকি সবাই ছোট। বড় ছেলে বলে বাবার কাঁধেই সবার দায়িত্ব ছিল। এখন বুঝি কি কষ্টটাই না বাবা করেছেন পরিবারের জন্য। ছোট ভাই, সেন্টু চাচ্চু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন বলে আমাদের সাথেই থাকতেন। বাকিরা সবাই রাজশাহীতে।

সেন্টু চাচ্চুর খুব ভক্ত ছিলাম আমি। চাচ্চুর কাছে আমার আবদার থাকতো স্টিকারের। চাচ্চু নিয়ম ধরে প্রতিদিন পকেটে করে স্টিকার নিয়ে আসতেন, কক্ষণও ভুল হয়নি। চাচ্চুর ভূমিকাটা আমার কাছে ছিল অনেকটা বড় ভাইয়ে মত। ম্যাকগাইভার দেখার সময় ইংরেজী সংলাপের মানে আর মাঠে প্রথম সাইকেল চালানোর অভিজ্ঞতা এই চাচ্চুর সাথেই।

মনে আছে একবার ক্লাস ফোরে কি ফাইভে রাগ করে চিঠি লিখে দুপুরে বাসা থেকে পালিয়ে গেছি। রাস্তা কিছু চিনি না। দুই পাড়া বাদে একটা পুকুরের পাড়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে ভাবছি এখন থেকে রিক্সা চালাবো না ইট ভাঙবো। এমন সময় দেখি বড় বড় পা ফেলে চাচ্চু আসছে। আমি দিলাম ছুট। খানাখন্দ ছুটে আমাকে পাকড়াও করা হলো। আমি শক্ত বাহুডোরে হাত পা ছুঁড়ে বলছি, "বাসায় যাব না... ছেড়ে দাও! বাসায় যাব না! আব্বু-আম্মু ভালবাসে না। বাসায় যাব না!"

চাচ্চু সে অবস্থাতেই জাপটে ধরে বাসায় নিয়ে এলেন। আসতে আসতে বললেন, সমিত নাকি আমি চলে যাবার পর থেকে কাঁদছে আর মাকে বকাবকি করছে। মা নাকি দুপুর থেকে না খেয়ে আছেন। বাবা নাকি অফিস থেকে আগে চলে এসে পাগলের মত আমাকে খুঁজছেন। ভাল না বাসলে কেউ করে এমন? চাচ্চুর গল্পের সাথে সাথে আমার হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি গতি শ্লথ হয়ে আসে। আমি চুপচাপ চাচ্চুর হাত ধরে বাসায় ঢুকে পড়ি।

ওই দিকে আমার চার খালা আর চার মামা। মা সিরিয়ালে পাঁচ নম্বর। ছোট দুই খালা আর এক মামা। তখন আমার কলেজে পড়া দুই ছোট খালা - মিলিন খালামনি আর লিসা খালামনিও বলতে গেলে আমাদের সাথেই থাকতেন। ছোট ভাইয়ের জন্ম দেবার আগে পরে মিলিয়ে মা ক'বছর অসুস্থ থাকেন, কমপ্লিট বেডরেস্ট। সে সময়টা আমার দুই খালা আমাদের জন্য এত করেছেন! আমাকে অনেক বয়স পর্যন্ত খাইয়ে দিতে হতো। মা তো আছেই। দুই খালার কাছেও কত যে খেয়েছি। বাবা আর কালেভদ্রে চাচার কাছেও খেয়েছি। আমার তখন হিসাব করা থাকত। আজ মা, পরদিন মিলিন তার পরদিন লিসা খালামনি। কারও উপর রাগ হলে আবার সে হিসাবের হেরফের ঘটতো। আমাকে খাওয়ানো বেশ ঝক্কির ব্যাপার ছিল। এক তো আমি এক জায়গায় থাকতাম না। মুখে খাবার গুঁজেই ছুট লাগাতাম। খাবার নিয়ে আমার পিছে পিছে ছুটতে হতো। আর মাঝে মাঝে আমার আবদার থাকতো গল্প শোনানোর। অনেক রূপকথার গল্প জানতো বলে লিসা খালামনির কাছেই আমার এ আবদার বেশী থাকতো। আরেকটা অভ্যাস ছিল খেতে খেতে হঠাৎ করেই বলতাম, "আর খাব না!" তখন বাকিটুকু খাওয়াবার জন্য নানান বাহানা করতে হতো।

ক্লাস থ্রীতে প্রথম লেখার হাতেখড়ি ছড়া দিয়ে। সে ছড়া প্রথমে লেখা হত রাফ খাতায়, পরে হাতের লেখা মুক্তোর মত বলে সে লেখা লিসা আর মিলিন খালামনিকে দিয়ে ফাইনাল খাতায় টুকিয়ে নেয়া হতো।

পা ছুঁয়ে সালাম করাটা আমাদের পরিবারে তেমন চলে না। তবু আমি তিন জনকে পায়ে ছুঁয়ে সালাম করি। আমার মা আর এই দুই খালা। আমি দেশে গেলে, কিংবা দেশে ছাড়ার সময় এখনও দুই খালা হাউমাউ করে কাঁদেন। আমার খালাত ভাইগুলো হিংসায় ছোট হয়ে আসা চোখে দেখে ওদের মা-রা ওদের পঁচিশ বছরের পিএইচডি করা তাগড়া ভাইটাকে এখনও মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্ছেন!

## স্কাউট, অগ্রদূত, বিশ্বসাহিত্য, গো-দল আর টমাস আলভা

ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাই স্কুলে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত স্কাউটিং করেছি। কাব স্কাউটে গ্রীন ডেনের ডেন লিডার ছিলাম। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের আদর্শে ইউনিফর্ম পরে জুনিয়রদের উপর খবরদারী, ওদের স্যালুট রিসিভ আর একা একা জঙ্গলে ক্যাম্পিংয়ের মধ্যে একটা হিরোইজম ছিল। সে মোহে আমার ধ্যান-ধারনায় তখন কেবলই স্কাউট। বাবা সিক্সে ঘোষণা দিলেন স্কাউটিং বন্ধ, আমার লেখাপড়া নাকি গোল্লায় যাচ্ছে! খুব মন খারাপ হয়েছিল তখন। এক তাড়া সার্টিফিকেট জমেছিল, সেগুলো সব ছিঁড়ে ফেললাম। আমার রোল ছিল তখন ১২। স্কাউটিং ছাড়ার

পরই হয়ে গেল ২! বাবা তাঁর সিদ্ধার্ন্তের সাফল্যে মত আর পরিবর্তন করলেন না। সেই রোল নাম্বার আমার সাথে পাকাপাকি ভাবেই সেঁটে গেল! নাইন-টেনে দোস্তরা আমাকে ডাকতো "রোল-২-সাব্বির"।

ক্লাস সিক্স পর্যন্ত আমার জিগরী দোস্ত ছিল ইমরান। ওর সাথে বন্ধুত্ব যেমন ছিল, তেমনি ছিল নানান জিনিস নিয়ে ছেলেমানুষী প্রতিযোগীতা! পরীক্ষার ফলাফল দেবার পর আমরা দেখতাম কে কার চেয়ে কোন বিষয়ে বেশি নাম্বার পেয়েছে। আমি কোন বিষয়ে ফেল করলেও খুশি, যদি দেখি ইমরান তার চেয়েও কম পেয়েছে।

আমাদের দু'জনের কিছু ব্যাপারে মিল ছিল। আমরা দু'জনেই একগুঁয়ে, জেদি। দু'জনেরই দলনেতা হবার সহজাত প্রবৃত্তি। তাই রেশারেশীটা বেশি ছিল। সবাই আমাদেরকে প্রথম দেখেই সেটা আঁচ করতে পারতো। প্রায় সব বিষয়েই ইমরান অবশ্য আমাকে টেক্কা দিয়ে যেত। ও হলো ফাস্ট ক্যাপ্টেন, আমি সেকেন্ড। ও হলো স্কাউটের সবচে প্রেস্টিগিয়াস ব্লু ডেনের লিডার আমি তার প্রতিদ্বন্দী গ্রীন ডেনের। ও রেজাল্টও আমার চেয়ে ভাল হতো। আবার কিছু বিষয়ে আমি টেক্কা দিতাম ওকে। ক্লাস ফাইভে হাতের লেখা প্রতিযোগীতায় আমি হয়ে গেলাম ঢাকা জেলায় তৃতীয়, ও কোন পদক পেল না। আন্তজাতিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় (সম্ভবত ইউনেস্কোর আয়োজিত) আমি হয়ে গেলাম বাংলাদেশের পঞ্চম, ইমরান সেখানেও কোন পদক পেল না। কার কয়টা সার্টিফিকেট সেটা নিয়েও একটা গোনাগুনি চলতো প্রায়ই!

ক্লাস ফাইভে আমি আর ইমরান মিলে একটা লাইব্রেরী বানিয়ে ফেললাম। নাম দিলাম "অগ্রদূত পাঠাগার।" এখন ভাবি আর অবাক হই, সে বয়সে কতটা দক্ষ ম্যানেজমেন্ট পাওয়ারই না ছিল আমাদের! লাইব্রেরীটা ছিল আসলে ভ্রাম্যমান। আমি আর ইমরান সদস্য নিতাম। সবাইকে সপ্তাহে ২ টাকা করে দিতে হবে। ১৫ জন ২ টাকা করে দিলে ৩০ টাকা হয়ে যায়। তার মানে মাসে ৪টা সেবা প্রকাশণীর বই কেনার টাকা উঠে যেত - অনুবাদ, কিশোর ক্লাসিকস, তিন গোয়েন্দা আর মাসুদ রানার চাহিদা ছিল তখন। আমাদের খাতায় কে কত টাকা দিয়েছে তার হিসাব থাকতো। সে হিসাব ধরে আমরা বই ভাড়া দিতাম ১ দিনের জন্য। সদস্য নয় এমন কাউকে পড়তে হলে প্রতি বই ২ টাকা করে দিতে হতো। বই গুলো ভাগ করে আমার আর ইমরানের কাছে থাকতো। নতুব বই আমাদের ব্যাগেই থাকতো, কেউ পড়তে চাইলে বের করে দেয়া হতো। আর পুরান বই হলে পরদিন নিয়ে আসা হতো। সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া লেগে (আমি মাসুদ রানার বদলে ওয়েস্টার্ন কিনেছি, যেটা কিনা ওর আগেই পড়া) আমাদের সে শখের লাইব্রেরীটা ভেঙে গেল ৬/৭ মাস পরেই।

তখন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া কর্মশূচিতে নাম লেখালাম দু'জনে। প্রতি বৃহস্পতিবারে স্কুলে বইয়ের ট্রাক আসত। সেখান থেকে কে কত বই নিয়ে পড়তে পারে সে নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল ইমরানের সাথেই। সে সুযোগে দু'জনের পড়া হয়ে গেল শাহনামা, সেক্সপিওর থেকে লিও টলস্টয়। ইমরানের সাথে বন্ধুত্ব শেষ হয়ে গেল যখন আমি ডে-শীফট থেকে ট্রান্সফার করে ক্লাস সিক্সে মর্নিংয়ে চলে গেলাম।

"তিন গোয়েন্দার" পদক্ষেপ অনুসরণে ক্লাস সেভেন কি এইটে আমি, সমিত আর অনিক মিলে খুললাম আমাদের নিজেদের গোয়েন্দা দল গো-দল (গো মানে গোয়েন্দা আগেই বলে নিচ্ছি কিন্তু!)।
অনিক আর ডালিয়া আপার কথা বলা হয়নি আগে। আব্বার বিজনেস পার্টনার মতিন চাচার ছেলে-মেয়ে ওরা। মতিন চাচার পরিচয় আব্বুর বিজনের পার্টনার কিংবা বন্ধু বললে আসলে কিছুই বোঝানো হয় না। মতিন চাচা আমার আপন চাচার মতই। সব সময় একসাথে ছিলাম ও আছি আমরা এই দুই পরিবার। মিরপুরে আমদের নিজেদের বাসা হবার ক'বছরের মধ্যেই মতিন চাচারাও আমাদের কাছেই বাড়ি বানিয়ে চলে এলেন। আমরা এখন বনানীতে যেখানে থাকি, সেখানেও আমাদের বাস উপরে-নিচে। যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে দুই

পরিবারের এক সাথে মিটিং হয়। অনিক আর আমার বছর চারেক বড় ডালিয়া আপাকে সে হিসেবে আমার চাচাত ভাই বোনই বলা যায়।

তখন শর্মীরা চলে গেছে। তাই আমাদের তিন তলায় বানানো হলো আমাদের গোদলের হেড কোয়ার্টার। সেখানে আমরা বাসা থেকে স্যান্ডউইচ আর শরবত নিয়ে আসতাম। আর অনিকের বাসা থেকে সাফাই করা চাকুটা ছোঁড়ার প্র্যাকটিস করতাম। নিয়মিত প্র্যাকটিসে আমাদের একটা দরজা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। আমাদের গোয়েন্দা দলের একমাত্র সাফল্য গাঁথা বলতে সেটাই... যেটা ধরা পড়ার পর আমার সৈরাচারী মা আমাদের সেখানে যাবার অধিকার রোধ করলেন। গোদলও ভেস্তে গেল।

গোদল ভাঙার পরে সে তিনজনই আমরা একটা ল্যাবরেটরি বানিয়ে ফেললাম। এবার সেটা অনিকদের চিলেকোঠায়। নাম দেয়া হলো টমাস আলভা ল্যাবরেটরি। সেখানে আমরা সিরকা (একটিক এসিড) আর রাংতার (অ্যালুমিনিয়াম) রিঅ্যাকশনে পানির হাইড্রোজেন আলাদা করতাম। সেটা পলিথিনে ভরলে গ্যাস বেলুনের মত উড়তো। আমরা সেই বেলুন নিয়ে নোবেল জিতে নেয়ার মত করে পাড়া ঘুরে বেরাতাম। সেই ল্যাবও বন্ধ হয়ে গেল রান্না ঘর থেকে নিয়মিত সিরকা, বেকিং সোডা, লবন, লেবু খোয়া যাওয়া আর চিলেকোঠা থেকে অনিকের চাচার শখের রেডিওর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করার পরে।

## ডুপ্লিকেট, মাইকেল, মুনিয়া, ব্যাঙ-দল, খলশে, পিংকি আর লায়ন

পশু-পাখীর প্রতি যে টানটা আমি আর আমার ছোট ভাই পেয়েছি সেটা সম্ভবত এসেছে আমার দাদা-নানার কাছ থেকে।

আমার দাদাকে যে কি বলবো তাই ভাবি! উনাকে কৃষক বলা যায়। এক সময় উনি আক্ষরিক অর্থেই কৃষক ছিলেন। বাবার কাছে শুনেছি, সেই সূর্য ওঠার আগে তাঁকে মহিষের গাড়ি করে ক্ষেতে পাঠানো হতো। দাদা নামাজ পড়ে, নাস্তা করে, ধীরে সুস্থে পরে যেতেন। দাদা এক সময় গ্রামের বাজারে একটা দোকানও দেন। এমনকি মসজিদে ইমামতি করার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। গ্রামের কৃষক মানেই গাড়ির মহিষটা, হালের বলদটা, উঠান ভর্তি মুরগী-হাঁস আর আরো হাজারো পশু-পাখি-গাছের প্রতি সীমাহীণ ভালবাসা।

আমার নানা ছিলেন পশু চিকিৎসক। তাঁরও ছিল পশু-পাখি আর গাছ-গাছালির প্রতি একটা অদম্য ভালবাসা। ঢাকার সাভারে তাঁর বাড়ি "মধ্যমনি"তে তিনি ফলিয়ে ছিলেন আতা, পেয়ারা, বড়ই, এমন কি আঙুর! তাঁর একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুরও ছিল। আর একটা কথা বলা ময়না পাখি। সে কুকুর কিংবা ময়না আমার দেখার সৌভাগ্য অবশ্য আমার হয়নি।

আমার বাবা-মা তাঁদের বাবার প্রানী-প্রীতি পাননি কিন্তু উদ্ভিদ-প্রেমটা পেয়েছেন ঠিকই। বাবা পড়েছেন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমনকি বৃত্তি নিয়ে নেদারল্যান্ডে একটা ডিপ্লোমাও করেছেন। শাঈখ সিরাজের "মাটি ও মানুষে" বাবাকে প্রায়ই দেখা যেত। আমাদের বাসার পেছনের বিশাল খালি জমিতে আমার মা'র একটা চমৎকার বাগান ছিল। সেখানে খোপে খোপে ফলতো সীম, বরবটি, বেগুন, টমেটো, আলু, পটল, লাউ, মূলা, গাজর, ঝিঙা, করল্লা, পুঁই, পালঙ, লাল শাক থেকে শুরু করে কলা, আখ - যখন যেটার মৌসুম! আর আমাদের ছাঁদ ভর্তি ছিল সারি সারি টবে দেশী-বিদেশী ফুলের গাছ।

আমাদের দুই ভাইয়ের আগ্রহটা উদ্ভিদের চেয়ে প্রানীতেই বেশী ছিল। সেই ক্লাস টুতে আমাদের প্রথম পোষা প্রানীটি ছিল একটি দেশী কুকুর ছানা। সেটার নাম দিয়েছিলাম "ডুপ্লিকেট"। ডুপ্লিকেট কেবল দুই কি তিন মাস ছিল আমাদের সাথে। বাবা-মাকে কোন মতেই রাজী করানো গেল না ডুপ্লিকেটকে সাথে রাখার। তাকে মিলিয়ে দেয়া হলো আরো শত বেওয়ারীশ রাস্তার কুকুরের সাথে।

সেই ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই দেখা গেল জাকির একটা কুকুর পালতে শুরু করেছে। সেটার নাম সে রেখেছে "মাইকেল"! সেই নামকরনের শানে নজুল জানতে চাইলে সে বলল,
"মাইকেল জেকসনের নাম শুনো নাই? হের নামে নাম রাখছি!"
আমি চরম বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি মাইকেল জ্যাকসনকে চিন?"
সে বিরক্তি নিয়ে বলল, "মাইকেল জেকসনকে কেডায় না চিনে!"

বস্তিতে কুকুর পালা খুবই সহজ। খাবারের চিন্তা করতে হয় না। মাইকেল নিজেই আস্তাকুড়, মোড়ের কসাইয়ের দোকান আর বাশঝাঁড়ের বাজার থেকে নিজের খাবারের ব্যবস্থা করে নিত। আর বস্তিবাসী যারা আছেন তাঁরাও মনে চাইলে দু'একটা বিস্কুট কি একটু ভাতের মাড় দিতেন। গোসলের তো প্রশ্নই আসে না, কেবল বৃষ্টি হলে মাইকেলকে জোর করে সেই বৃষ্টিতে ভেজানো হতো। কিন্তু তাতে যে ময়লা দূর হয়না সেটা আমরা মাইকেল কাছে এলেই বুঝতে পারতাম। ভক করে একটা দূর্গন্ধ নাকে লাগতো। আর সেই সাথে গা ভর্তি উকুন তো আছেই। সে কথা আবার জাকিরকে বলা যেত না, বললেই সে রেগে মেগে একটা কান্ড করতো। এর মাঝে মুসলমানীর মত করে মাইকেলের লেজের আগা কেটে দেয়া হলো। এতে নাকি কুকুরের তেজ বাড়ে। তবে এত করেও মাইকেল বেশী দিন আর জাকিরের থাকলো না। বাশঝাঁড়ের বাজারে খাবারের সুবিধা বেশী বলে সে ওখানেই স্থায়ী আস্তানা গাড়লো। তবে আমাদের কিন্তু সে চিনতো ঠিকই। বাজারে গেলেই সে পরম আহ্লাদে কাছে এসে লেজ নাড়তো।

এর মাঝে আমার আর সমিতের পীড়াপীড়ি আর চিল্লাচিল্লী সহ্য করতে না পেরে বাবা এক খাঁচা ভর্তি মুনিয়া পাখি নিয়ে আসলেন। কুকুর বেড়ালের চেয়ে খাঁচার পাখি ঢের ভাল, ঝামেলা নেই বললেই চলে। দুই বেলা খাবার, আর ক'দিন পর পর গাছে পানি দেবার ঝাঁঝরি দিয়ে গোসল - ব্যাস, ল্যাঠা চুকে গেল। মুনিয়া পাখি চার মাস পর পরই পালক বদলায়, সে সাথে গায়ের রঙটাও বদলে যায়। সেটা এক চরম উত্তেজনার বিষয় ছিল। তবে কিছুদিন যাবার পরই খাঁচা ব্যাপারটা আমাদের দুই ভাইয়ের তেমন ভাল লাগলো না। ছোট্ট খাঁচায় গুটিশুটি মেরে ছয়টা মুনিয়া। ঠিক মত যে বসবে সে জায়গাটাও নেই। তাই একদিন আমি আর ছোট ভাই মিলে দিলাম সব গুলোকে উড়িয়ে। বাবা-মাকে না বলেই। ধারনা ছিল বাবা-মা জানলে তুলকালাম হবে। কিন্তু তা কিন্তু হয়নি, বরং বাবা-মা জানতে পেরে খুশিই হয়েছিলেন!

সে সময় হাতে পেলাম একটা বই, "খুদে বিজ্ঞানীর প্রজেক্ট"। সেখানে ব্যাঙের জীবনযাত্রার ছবি সহ বর্ণনা ছিল। কিভাবে ডিম থেকে ব্যাঙাচি, ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ।

ব্যাঙ ডিম পাড়ে পানিতে, জন্মায়ও পানিতে। সে সময় কোন পা থাকে না, থাকে সাঁতারের জন্য লেজ আর থাকে শ্বাস নেবার জন্য মাছের মত কানকো। সময়ের সাথে সাথে সেই কানকো আর লেজ মিলিয়ে যেতে থাকে, গজাতে থাকে ফুসফুস আর পা! পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙ লেজ আর কানকো হারিয়ে চার পা আর ফুসফুস নিয়ে উঠে আসে ডাঙায়! সে সময় আবার ডাঙায় থাকলে সে অক্সিজেন নেয় ফুসফুস দিয়ে আর পানিতে থাকলে চামড়া দিয়ে!

অ্যামফিবিয়ান গোত্রের এই রহস্যময় প্রানীটির প্রতি তখন আমার সীমাহীণ আগ্রহ! ছোট ভাইকে নিয়ে ঠিক করে ফেলি "ব্যাঙ পর্যবেক্ষণ প্রোজেক্টের" কার্যপদ্ধতি। "ব্যাঙ দেখলেই গা ঘিন-ঘিন করে" বলে অনিক আর শর্মীকে কোন ভাবেই এ প্রোজেক্টে জড়িত করা গেল না। তাই ছোট ভাইকে নিয়েই সংগ্রহ করে ফেলি ব্যাঙের ছ'সাতটা ডিম পাশের ধানক্ষেত থেকে। মায়ের রান্নাঘর থেকে একটা বড় গামলা সরিয়ে আমাদের বারান্দায় নিয়ে সেটায় বানানো হয় পুকুরের প্রোটোটাইপ। গামলার তলে বালি-কাদা আর তার মাঝে অর্ধেক পানির উপর উঠে থাকা একটা বড় পাথর, যেন পা গজালে ব্যাঙাচিরা সেটায় উঠে বসতে পারে। কিছু টোপা পানা, যাতে ব্যাঙাচি সেগুলোর শেকড়ের ফাঁকে ফাঁকে ঝুলে থাকতে পারে।

ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার দিন আমরা দুই ভাই মাতৃ আনন্দে আত্মহারা। সব গুলো ডিম থেকেই বাচ্চা হয়েছে, নষ্ট হয়নি একটাও, সেটাই আনন্দের মূল কারণ। আমরা ক্যালেন্ডার ধরে ব্যাঙের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করতে থাকলাম। পা গজানোর আগে দিয়ে ব্যাঙের প্রোটিনের দরকার হয়, সে প্রোটিনের জোগান দেয়া হলো সেদ্ধ ডিমের সাদা অংশ দিয়ে। সে খাবার দিয়ে রেখেছি, ব্যাঙাচি মুখেও দিচ্ছে না। আমরা সেটা নিয়ে জানপরনাই চিন্তিত, তাহলে কি এই প্রোটিনে চলবে না? মৃত মাছ লাগবে? ক'দিন পর যখন ব্যাঙাচি ডিম খাওয়া শুরু করলো, আমাদের আর পায় কে! বাসায় মেহমান আসলেই আমি আর ছোট ভাই নিয়ে যেতাম আমাদের বারান্দায়। সেখানে ততদিনে ব্যাঙাচির লেজ প্রায় বিলীন হয়ে চারটে পা গজিয়ে গেছে। তারা দিব্যি পাথরের উপরে বসে রোদ পোহায়। জন্ম থেকেই আমাদের দেখছে বলে মানুষ নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র ভয় নেই, মাথা ঘুরিয়ে আমাদের দেখে আবার নিজেদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লেজ পুরো অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আমরা জানতাম ওদেরকে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে। সেদিন মন খুব খারাপ ছিল দু'জনের। এই কয় মাসেই আপন হয়ে গিয়েছিল ব্যাঙ গুলো। কোনটা পেটুক, কোনটা অলস আর কোন ব্যাঙটা রোদ বিলাসী তা ভাল মতই জানা হয়ে গিয়েছিল! আমরা আমাদের ব্যাঙ-দলকে পুকুরে ছেড়ে দিয়েও অনেকক্ষন বসে রইলাম। বৃথাই চেষ্টা করলাম অগুনতি ব্যাঙের ফাঁকে আমাদের প্রিয় ব্যাঙ গুলিকে খুঁজে বের করতে।

ব্যাঙ গুলো চলে যাবার পর পরই আমি একটা খোলশে মাছ পেয়ে গেলাম! আমাদের পাশের খালটাতে (এখন আর নেই) প্রায়ই জেলেরা মাছ ধরতে আসতেন। সেই মাছ ধরার সময়ই একটা খোলশে মাছ উঠে আসে। এত সুন্দর মাছ আমি আগে কক্ষনো দেখিনি! মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা, ঝকঝকে সবুজ রঙ, তবে গোল্ডফিসের মত ন্যাতপ্যাতে শরীর নয়, বরং বেশ শক্ত পোক্ত। খোলশে মাছের জান বড় শক্ত, আমি হাতে নিয়েই দিলাম ছুট, এক ছুটে বাড়িতে। বাসায় একটা বড় কাঁচের বয়াম ছিল, মা এটা-সেটা রাখতেন। সেটা খালি করে পানি ভরে খলশে মাছটাকে রেখেই দিলাম আরেক ছুট। জেলের কাছ থেকে জানতে হবে এ মাছ কি খায়। জানা গেল, খলশে খায় মাটি (জুও/সাইটোপ্লাঙ্কটন) আর টোপা পানার শিকড়।

খলশে মাছটাকে আমি বলবো আমার প্রথম সত্যিকারের পোষা প্রানী। একটা দূর্বোধ্য ভালবাসা ছিল আমার মাছটার প্রতি। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতাম সেটাকে সাঁতার কাটতে দেখে। আর এর মালিকানা নিয়েও আমার মধ্যে একটা বাড়াবাড়ি ছিল। সমিতকে আমি খলশের কাছেই যেতে দিতাম না। কাছে গেলেই আমার হাঁকডাক শুরু হয়ে যেত। আমি নিজেই মাসে মাসে পানি বদলাতাম, নিজেই ক'দিন পর পর নতুন টোপা পানা আর পঁচা মাটি নিয়ে আসতাম, সাথে নিতাম না কাউকে। এমনকি মাঝে মাঝে কথাও বলতাম ওর সাথে! খলশেকে নিয়ে আমার ফ্যাসিনেশন এই পর্যায়ে চলে গেল যে একটা সময় আমার মনে হলো সে বড় একা, ওর সঙ্গী দরকার! সে দরকার মেটাতে আমি যত জেলে ছিল সবাইকে বলে দিলাম এই রকম আরেকটা মাছ আরেকটা পেলে যেন অবশ্যই আমাকে জানায়।

সেই প্রিয় খলশেকে নিয়ে একদিন একটা ভয়াবহ কান্ড ঘটে গেল! আমি স্কুল থেকে বাসায় এসেছি, এসেই গেছি খলশের কাছে। বাসায় আসায় পর প্রতিদিন এটাই আমার প্রথম কাজ ছিল। গিয়ে দেখি বয়ামের পানি রক্তে লাল হয়ে আছে, আর সে পানির উপরে ভাসছে আমার সবুজ খলশে! আমি তখন ক্লাস থ্রী কি ফোরে পড়ি। সেই প্রথম কোন মৃত্যু আমাকে নাড়া দিয়ে গেল। এত তীব্র ভালবাসা ছিল আমার মাছটার প্রতি, আমার মাথা মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল! মাছটা যে মরে গেছে, আর বেঁচে উঠবে না, এটাই আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। আমি মাছটাকে হাতে নিয়ে আবার পানিতে ছাড়লাম, এই বুঝি সাঁতার কাটে। ঘোরের মধ্যে কতবার যে করেছি এ কাজ! ঘোর কাটতেই আমি ছুটলাম সমিতের খোঁজে, ও ছাড়া যে আর কেউ এটা করেনি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ওকে পাওয়া গেল ওর রুমে। চোরের মত মুখ করে বসে আছে। ওর সাথে আমার কথা হলো এরকম,
“দেখ আমি জানি তুই করেছিস! স্বীকার কর, করলে কিচ্ছু বলবো না। স্বীকার না করলে মারবো! এত প্রচন্ড মারবো যে তুই কল্পনাই করতে পারবি না!”
ও ভয়ে ভয়ে বলে, “স্বীকার করলে মারবা না?”
আমি ঠান্ডা গলায়, “না!”
“আমিই করছি...” ও বলে শেষ করেছে কি করেনি আমি শুরু করলাম মার। ওর সাথে আমার মারামারি হতো ঠিকই, কিন্তু আমার মাথায় থাকতো সব সময়, আমারই ছোট ভাই, জোরে মারা যাবে না, ব্যাথা পাবে। কিন্তু ওই দিন আমার মাথায় আর কিছু ছিল না। আমার চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়ছে, আর আমি মারছি! কেজিতে পড়া সমিতও জানে দোষ করেছে, তাই মার খেয়েও সে কিন্তু মাকে ডাকেনি। কেবল কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, “তুমি বলছিলা মারবা না, মারবা না বলছিলা ভাইয়া!”

খলশেকে আমি আর শর্মী মিলে কবর দিলাম। সে কবর দেয়ার সময় নেয়া হলো না সমিতকে। সে সময় বুঝিনি, আজ বুঝি, এই একটা ক্ষেত্রেই ওকে সাথে নেইনি আমি। আমার সব কাজেই আমার ছোট ভাইটা সাথে সাথে থাকতো, কিন্তু খলশের সাথে মালিকানার সীমানাটা মোটা দাগেই দেয়া ছিল, যেটা তখন ওর ছোট্ট মন সহ্য করতে পারেনি। এটা করে সে যে অনুশোচনায় ছিল এটাও বেশ বোঝা যেত। কোথায় কবর দিয়েছি সেটা তাকে জানতেই হবে, জানার পর আবার সেখানে গিয়ে ছোট্ট হাত তুলে দোয়াও পড়া হবে... আহারে!

ক্লাস ফাইভ কি সিক্সে রাস্তা থেকে দু’টো কুকুরের বাচ্চা তুলে নিয়ে এলাম আমরা। একটার চোখই ফোটেনি বলতে গেলে, আরেকটা বেশ পোক্ত হয়েছে। বাবা-মা খুব বিরক্ত হলেন, কিন্তু সে মুহূর্তে কিছু বললেন না। বড়টার নাম দেয়া হলো “পিংকি”, আর ছোটটার নাম দেয়া হলো “লায়ন”। লায়ন নামটা আমার মোটেই পছন্দ ছিল না, কিন্তু সেটা রাখতে হলো আমাদের বাসায় কাজ করা ছেলেটার পীড়াপীড়িতে। সে নাকি কবে কোন কুকুরের নাম দেখেছে “লায়ন” তাই আমাদেরটার নামও তাই রাখতে হবে। সেটাই রাখা হলো।

পিংকি আর লায়ন আমাদের চিলেকোঠা আর ছাদে থাকলো কয়েক মাস। এরপর বাবা-মার সাথে এ নিয়ে জরুরী সভা হলো। তাঁদের শেষ কথা, পিংকি আর লায়নকে যেতে হবে। কুকুর পোষা নাকি খুব কঠিন - কে ওদের খাওয়াবে, কে ওদের গোসল করাবে, হ্যান ত্যান। আমি আর সমিত যতই বলি আমরা করবো, বাবা-মা মানেন না। তাঁদের আরো দাবী রাস্তার কুকুর (যাকে চলতি ভাষায় আমরা বলি নেড়ী) নাকি পোষ মানে না, যতই শেখানো হোক কিচ্ছু শেখে না!

এ নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি চললো, পরে ঠিক হলো কেবল একটাকে রাখা যাবে, তাও কয়েক মাসের জন্য। এর মধ্যে যদি আমরা তার ভাল যত্ন নিতে পারি তাহলে থাকবে, তা নাহলে সেটাকেও ফেলে দিয়ে আসা হবে।

আমরা তখন সেটাতেই রাজী! বয়স কম বলে লায়নকেই রাখবো ঠিক হলো, পিংকিকে ছেড়ে দিয়ে আসা হলো অন্য পাড়ার রাস্তায়। পিঙ্কির জন্য মন খারাপ ছিল কয়েকদিন। মন খারাপ যে বাবা-মা'রও হয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম পরে, যখন একদিন শুনে ফেললাম মাকে বলছে বাবা, "আজ পিঙ্কিকে দেখলাম রাস্তায়!"
মা আবার জিজ্ঞেস করেন, "কেমন দেখলে?"
বাবা বলেন, "ভালই! সাথে আরো কয়েকটা ছিল। দলে ঢুকে পড়েছে একেবারে!"

লায়ন আমাদের সাথে ছিল অনেক বছর। আমাদের চোখের সামনেই সে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলো। বাবা-মা, এমনকি সেন্টু চাচ্চুও বাইরে থেকে যতই দেখাক লায়নকে পছন্দ করে না, কিন্তু টানটা টের পাওয়া যেত ঠিকই। লায়নের জন্য বাজার থেকে মাংস আর মোটা চাল কিনে আনতেন বাবা। আর মা সেটা খুব যত্ন নিয়েই একসাথে মিলিয়ে সেদ্ধ করতেন। আড়াল থেকে দেখতাম, আমরা কাছে নেই ভেবে বাবা কিংবা চাচ্চু লায়নকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দিচ্ছেন। ভালো খাবার আর নিয়মিত যত্নে লায়ন অল্প কয়দিনেই বেশ তাগড়া হয়ে উঠলো। বাইরের লোকে অনেকেই বিশ্বাস করতেন না লায়ন আসলেই রাস্তার কুকুর।

নানার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে লায়নকে আমি আর সমিত মিলে ট্রেনিং দেয়া শুরু করলাম। মাত্র ক'দিনেই লায়ন সুন্দর থাবা তুলে সবার সাথে হ্যান্ডশেক করতে শিখে গেল। তাকে বসতে বললে বসে, দাঁড়াতে বললে দাঁড়ায়, শুয়ে পড়তে বললে শুয়ে পড়ে, খাবার দিয়ে খেতে না বললে খায় না, অচেনা মানুষকে দেখলেই তেড়েফুঁড়ে ছুটে যায়, আবার থামতে বললে গর্জন থামিয়ে সুন্দর থাবা বাড়িয়ে দেয়! আমাদের বাসার সামনে লাগানো হলো একটা ছোট্ট সাইনবোর্ড, বাংলায় ও ইংরেজীতে যেখানে লেখা "কুকুর হতে সাবধান!" সে সাবধানবাণী যে ফাঁপা নয় সেটাও লায়ন প্রমান করে দিল দুই দুই বার রাতে ছিঁচকে চোর ধরে।

আমাদের পেছনে যে বাগানটা ছিল বলেছি সে বাগানের ফসল নষ্ট করতো নানান পাখি। সে পাখি তাড়ানোর কাজ নিজে থেকেই করতো লায়ন। তার পাখি ধরার দৃশ্যটা একটা দেখার মতই ব্যাপার। ঠিক যেন সিংহ শিকার করছে কোনো বুনো হরিন! চার পা গুটিয়ে আস্তে আস্তে মাটি ঘেঁষে কাছে গিয়েই এক লাফে পাখি থাবায় করায়ত্ত্ব! লায়নের গতিও ছিল ঠিক যেন চিতার মত! এই হয়তো সে ছাদে, মুহূর্তে সে বাগানে, এর পর মুহূর্তেই সে বারান্দায়। লায়নকে প্রাকৃতিক কর্ম সারার কাজটা শেখাতে আমাদের সময় লেগেছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু শিখে ফেলার পরে সে নিজেই গিয়ে বাগানে কাজ সমাধা করে ফিট বাবুটি হয়ে হেলতে দুলতে বাসায় চলে আসতো! তার সিভিক সেন্সও ছিল বেশ টনটনে! শর্মীর বাবা-মা লায়নকে দেখতেই পারতেন না, বাসায় ঢুকতে দেয়া তো দূরের কথা। তাই ওদের দরজা খোলা থাকলেও সে কখোনো ভেতরে ঢুকতো না, চুপচাপ অপেক্ষা করতো বাইরে।

লায়ন মারা গেল খুব অনাকাঙ্খিত ভাবেই। যাঁদের কুকুরের শখ আছে তাঁরা জানেন, পেটের গোলমাল হলে কুকুর লতা-পাতা-ঘাস চিবুতে পছন্দ করে। সে সময় আমাদের বাগানে দেয়া হয়েছিল কীটনাশক। যে লোকটি কীটনাশক দিয়েছিল, সে যে কি পরিমানে দিয়েছিল তাই ভাবি! ঘাসে মেশা কীটনাশক খেয়ে মারা গেল আমাদের সবার প্রিয় লায়ন!

ওর অভ্যাস ছিল আমাদের দুই ভাইয়ের স্কুল থেকে ফেরার সময় হলেই বারান্দায় গিয়ে একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে থাকা। আমাদেরকে দেখলেই তার সে কি বাঁধভাঙা উল্লাস। গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে এক ছুটে নিচে চলে যাবে, সেই সাথে উদ্দাম লাফালাফি, এই লাফিয়ে শরীরে উঠে পড়ে তো এই পাক দিয়ে ঘুরতে থাকে। সেদিন বিস্ময়জনক ভাবেই সেসব কিছুই হলো না। আমি মাকে জিজ্ঞেস করেছি, "আম্মু লায়ন কই?"

মা কেমন ভাবে জানি বলল, "আছে মনে হয় কাছে কোথাও!"
আমি আর পাত্তা না দিয়ে গল্পের বই নিয়ে বসেছি, ছোট ভাই বসেছে "বাঁটুল দি গ্রেট" নিয়ে। মা বারে বারেই কাছে এসে এটা সেটা বলছেন, আসল কথাটা আর বলতেই পারছেন না। শেষমেষ যখন বললেন আমি বিশ্বাসই করিনি! এইতো এই সকালে দেখলাম! কি প্রানবন্ত!

আমার ছোট ভাই শুরু করলো কান্না! কিন্তু আমি ততদিনে আবেগ চাপা দিতে শিখে গিয়েছি। শক্ত মুখে আমরা দুই ভাই মিলে কবর দিলাম লায়নকে। সে মারা যাবার পরই পোষা প্রানীর শখটা আমাদের দু'জনেরই কেমন জানি চলে গেল। তবে এখনো কোন কুকুর দেখলেই আমার মনে পড়ে লায়নের কথা। কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেই, মনে মনে বলি, "তোকে আমরা ভুলিনি রে!"

## লেখালেখি

লেখালেখির প্রসঙ্গ দিয়েই এ ঘ্যানঘ্যানে লেখাটা শেষ করে দিচ্ছি! আগেই বলেছি অনেক ছোটকাল থেকেই আমার লেখালেখির শখ। লেখালেখিতে উৎসাহটা আমি প্রধানত পেয়েছি আমার ছোট মামা আর আমার ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে। বাচ্চু মামা নিজে চিত্রকর, কিছু লেখালেখিও করেন। উনি আমাকে এনে দিলেন বাংলা একাডেমির "শিশু" আর "ধানশালিকের দেশ", বললেন, লেখা ভাল হলে নাকি ওসব পত্রিকায় ছাপান হয়। আমাকে তখন পায় কে। আমি তোড়া তোড়া লেখা লিখে মামাকে দিতাম।

আমার সব লেখার প্রথম পাঠক ছিল সমিত। ওর মতামত পেলে তবেই লেখা ফাইনাল করতাম আমি। এর আগে পর্যন্ত সে লেখায় কাঁটাছেড়া চলতো। ওর উৎসাহ না পেলে আমি লেখা সেই কবেই ছেড়ে দিতাম, সে নিয়ে সন্দেহ নেই। আমার বাবা-মার লেখা নিয়ে প্রথমে কোন আগ্রহ ছিল না। পরে সেটা কিভাবে আসলো সেটা আরেক কাহিনী, পরে বলবো না হয় একদিন!

একটু বড় হয়ে ক্লাস সিক্সে আমার প্রথম লেখা পাঠালাম "কিশোর পত্রিকায়"। মহাবিজ্ঞানী নিউটন বিয়ে করতে গিয়ে কি সমস্যার পড়েছিলেন তার এক রসালো বর্ণনা। প্রথম লেখাটাই ছাপানো হয়ে গেল। এর পর থেকে ধুমিয়ে লিখেছি "কিশোর পত্রিকায়"। ওরা লেখা ছাপানো হলে সৌজন্য সংখ্যার সাথে সাথে ১৫ টাকা সম্মানীও দিত। সেটা যে ক্লাস সিক্সের একটা ছেলের জন্য কতটা গৌরবের সেটা লিখে বোঝান সম্ভব না। পরে আমার শিশুতোষ লেখা গুলো ছাপানো হতে লাগলো "ছোটদের কাগজ", "কিশোলয়" আর স্কুলের পত্রিকা গুলোতে। এমনকি "উন্মাদে" কার্টুন পাঠিয়েছিলাম কয়েকটা - সেগুলোও ছাপানো হয়ে গেল!

জাতীয় সংবাদপত্রে প্রথম লেখা পাঠাই কলেজের প্রথম বর্ষে "ভোরের কাগজে"। তখন সেটাই দেশের সেরা পত্রিকা। "ভোরের কাগজে"র সাপ্লিমেন্ট গুলোতে বিষয় ভিত্তিক লেখা চাওয়া হতো, সেখানে কালে ভদ্রে লেখা পাঠাতাম, সব গুলোই ছাপানো হতো। সেই সাথে শুরু করলাম "কিশোর পত্রিকায়" নিয়মিত গল্পধাঁধা লেখা। সেই চললো দু'বছর। এইচএসসি দেবার পর লেখার সংখ্যা বাড়িয়ে দিলাম। "ভোরের কাগজের" সাপ্লিমেন্ট "অবসরে" নিয়মিতই লেখা পাঠাতাম তখন। আরিফ জেবতিক ভাই তখন ছিলেন "পাঠক ফোরামের" দায়িত্বে। "পাঠক ফোরামের" তখন সেই রকম নাম-ডাক, সেখানে লেখা ছাপা হওয়া মানে সেই রকম ব্যাপার! সেখানে একটা বিষয় ভিত্তিক সংখ্যার সেরা লেখক নির্বাচিত হয়ে গেলাম। এর পরপরই একদিন দেখি "অবসরে" আমার লেখার নিচে ছোট্ট নোটিশ, "লেখককে যে কোন মঙ্গলবার ৪-৫টার দিকে ভোরের কাগজ অফিসের চারতলায় "অবসরের" সহসম্পাদকের (সেটা তখন ছিলেন রেজা ভাই) সাথে দেখা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে!"

এর পরের ঘটনা অন্য লেখার বিষয়বস্তু। তবে সব স্বপ্নের কাগজের নৌকা ডুবে এই একটা নৌকাই কিন্তু এখনো আমার একটা স্বপ্ন নিয়ে উত্তাল সমুদ্রে একা ভেসে আছে। সে নৌকার যাত্রা আর কতদূর, কতক্ষণ তাই ভাবি মাঝে মাঝে!

***কৃতজ্ঞতা স্বীকার***

*অঞ্জন দত্তঃ লেখার শিরোনামটা অঞ্জন দত্তের লেখা নীল দত্তের সুর করা শানের গাওয়া "মাঝি রে" গানটি থেকে ধার করা।*

***ছবির ক্যাপশন***

*আমাদের বাসার ছাদে পানির ট্যাঙ্কির উপরে আমরা দুই ভাই। সেখানে মা আচারের জন্য বড়ই শুকাতে দিতেন। সে বড়ই আমরা দুই ভাই সাবড়ে দিতাম। ছবিটা সে সময়ে আমাদের সতর্ক না করে সেন্টু চাচ্চুর তোলা। আমাদের মুখ ভর্তি তখন শুকনো বড়ই!*

© aumit.ahmed@gmail.com

# আমার ছেলেবেলা

**অরূপ**

---

*(ছেলেবেলা স্মৃতিচারনের কোন বাঁধা সময় নেই। কিন্তু ঊনত্রিশ বছরে কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসার কথা ভাবতেই হাসি লাগে। সম্পাদকের বাহানায় খানিকটা দ্বিধা নিয়ে এই কাজটা করতে বসেছি। ছাইপাশ যাই লিখি পাঠকের কৃপা আগেই প্রার্থনা করে রাখা হল)*

ছেলেবেলা নিয়ে লিখতে হলে শৈশবের স্মৃতি হাতরে আনতে হয়। পঁচিশ বছর আগে ফিরে গিয়ে শৈশবগাঁথা লেখাটা সহজ নয়। মজার ব্যাপার হল, কিছু দৃশ্য কল্পনা করতে আমার কখনওই কষ্ট হয় না। শৈশব নিয়ে সেই ছবি গুলোই আমার সম্বল।

আমার জন্ম রাজশাহীতে। বাবা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। সেই সূত্রে বাসা পেয়েছিলেন ক্যাম্পাসে। চারতলার বিশাল ব্যালকনীতে খেলতে মোটেও অসুবিধা হতো না। রাতে ঘরে জ্বোনাকী আসতো ঝাঁকে ঝাঁকে। রাজশাহী তখনও ঠিক শহর হয়ে ওঠেনি। রাতে শেয়ালের হুক্কা হুয়া শুনে ঘুমানো যেত। সন্ধ্যাবেলা মাঝে মাঝেই ব্যালকনী থেকে দেখা যেত শেয়ালের ছোটাছুটি। মা বলতেন এগুলো আমাদের পোষা শেয়াল।

আমার বয়স তখন চার। চার বছরের স্মৃতি আমি কিভাবে মাথায় নিয়ে ঘুরি সেই ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই। তবে বড় হয়ে যখন বেড়াতে গেলাম, ছবিগুলো মিলে গেল অবলীলায়!

জীবনের প্রথম বন্ধুটি জোটে সেই সময়, শিখন। জন্ম আগে হলেও আকারে প্রকারে সেই আদর্শ ছিল বন্ধু হবার। শিখনদের বাসা তিনতলায়। হয় আমি নীচে যাই, কিম্বা ও আসে উপরে (সাথে কেউ একজনথাকতোই)। কখনওবা মাঠে ময়দানে দৌড়-ঝাঁপ। প্রথম বন্ধুর সব কথা কোন কারনে ঝাপসা হয়ে গেলেও, মৌচাকে খোঁচা দেবার দুঃসাহসিক অভিযানের স্মৃতি এখনও টাটকা। বিশাল মৌচাকে লাঠি দিয়ে খোঁচানো মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়, চার বছরের দুটি শিশু কোন উৎসাহে এই অকর্মটি করে সেটিও আজওবোধগম্য নয়। সেদিন দুজনেরই কেউই ছাড়া পাইনি। কালো মেঘের মতো ছুটে আসা ক্রুদ্ধ মৌমাছির ঝাঁককে সারাজীবন ভয় করতে শেখার জন্য এই একটা অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট ছিল।

ইশকুলে ঢোকার যখন বয়স, তখন বাবা রাগ করে রাজশাহী ছাড়লেন। আমার মাথা গরম রোগটা তার কল্যাণেই পাওয়া। ঢাকায় আসার পর জীবনে দুটি মানুষের প্রভাব পড়ল। একজন আমার অগ্রজ, আরেকজন মেজমামা। আমাদের পরিবারে গুণী শিল্পী ছিলেন অনেক। কিন্তু সংসারের ধাক্কায় কেউই আর পেশাদার হতে পারেননি এক মেজমামা ছাড়া। চিরকুমার লিকলিকে এই মানুষটি ফোটোগ্রাফী করতেন আর সবাইকে উৎসাহ দিয়ে বেড়াতেন। আঁকার হাত ভালো ছিল বলে, আদরের ভাগটা বেশী পেতাম। ক্যামেরা বস্তুটাকে খুব কম বয়সে চেনা হয়েছে এই ভদ্রলোকের কল্যাণে। আমার অগ্রজের জন্ম আমার সাত বছর আগে। বেশ খানিকটা সময় জাপানে কাটিয়ে এই দেশে এসেছিল সে। ফলে জাল হাতে নিয়ে পোকা ধরা, পাখি, ব্যাঙ আরকাঁকড়া পোষা, দেওয়াল পত্রিকা করার বিচিত্র বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল। আমি তার কপি-ক্যাট। ভাইয়ার শেষ বাতিক ছিল বডি বিল্ডিং, ততোদিনে আমার নিজের অসংখ্য বাতিক জন্মে গেছে।

আমার আঁকার হাত নিয়ে পারিবারিক গন্ডীতে হালকা খ্যাতি ছিল। কেউ যখন জিজ্ঞেস করতেন, " বাবু কি হবে বড় হয়ে?" আমি যতসম্ভব গম্ভীর হয়ে বলতাম " আর্টিস্ট"। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই উত্তরটা বদলাতে লাগলো, কখনও প্রানীবিদ, কখনও ফিজিসিস্ট, কখনওবা ইলেকট্রিকাল ইন্জিনিয়ার। শিল্পী আমি হইনি, তবে ভেতরে যে একজনবাস করে সেটা টের পাই।

ছোট বেলায় আমার সবচে' প্রিয় কাজ ছিল জিনিস ভাঙ্গা আরকাটাছেঁড়ায়। সেটা রেডিওই হোক কিম্বা দামী হাত ঘড়ি। ভেঙ্গেচুরে নাড়ীভূড়ি ঘেঁটে একটা মানুষ কি গভীর আনন্দ পেতে পারে সেটা বোঝানো কঠিন।

আরেকটা অদ্ভুত আগ্রহ ছিল। বড় হয়ে জানলাম একে বলে পাইরোম্যানিয়া। পাইরোম্যানিয়া হল আগুন নিয়ে খেলার বাতিক। সুযোগ পেলেই আগুন ধরাতাম, তা কাগজেই হোক কিম্বা কেরোসিন তেলেই। সেদিন লাইটার ফ্লুয়িড হাতে পেয়ে পুরোনো খেলার ইচ্ছাটা অঙ্কার হল। বাকিটা না বলাই মঙ্গল।

স্কুলে ঢোকার দিনটা আমার কোনদিনই পছন্দের না। মা যে এভাবে নিষ্ঠুরের মতো হাজারটা লোকের মাঝে আমাকে ফেলে চলে যাবে এটা ভাবতেই পারিনি। উদয়নে হয়নি, বলল বয়স নাকি বেশী! আমার বাঁকাত্যাড়া ভাবনার প্রকাশ সেই সময় থেকেই। ছবি দেখিয়ে যখন জিজ্ঞেস করেছিল, " বলতো কয়টা পাখি?" আমি উত্তরে বলেছিলাম তিনটা আর দুইটা। উত্তরটা প্রশ্নকর্তার পছন্দ হয়নি। বড়বেলায় স্কুলের অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার নিয়মিত আমার খাতা ছুড়ে ফেলেন দিতেন। তাঁর প্রধান অভিযোগ ছিল, " সবাই এক নিয়মে অংক করে, আর এইটা করে আরেক নিয়মে"। তার রাগের আরেকটা গুপ্ত কারন ছিল, আমার অংকের উত্তর মিলতো না, কিন্তু ভুল স্টেপটাও খুঁজে বের করা যেত না। একজনঅ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টারকে এতোটা অসহায় পরিস্থিতিতে ফেলে দিলে কার মাথা ঠান্ডা থাকে?

স্কুলে থাকতে আমি মুহম্মদ জাফর ইকবালের " সাইনটিশ" টাইপ ক্যারেক্টার গুলোর মতো ছিলাম। একটা ছেলে গভীর আগ্রহে ব্যাঙের পিছনে ছোটে, পোকা ধরে ধরে হেমিওপেথির শিশিতে ভরে, আর সোলডারিং আয়রন দিয়ে হাত-পা পুরিয়ে বিচিত্র যন্ত্র বানায়, এই কান্ড অন্যরা দেখে কি ভাবতো সেটাই আজজানতে ইচ্ছে করে।

সেই দিনগুলোতে বিকেল পাঁচটা বিশ মানে দৌড়ে বাড়ি ফেরা। বিটিভিতে তখন কার্টুন দেখানোর সময়। উইকডেইস এ পপাই, ডিফেন্ডার্স অফদ্য আর্থ, মাইটি মাউস, আরশুক্রবারে থান্ডারক্যাটস – জীবনের সমস্ত আনন্দ এসব দেখায়। আরেকটু বড় হবার পর পছন্দের তালিকায় যোগ হল: দ্য ফল গাই, দ্য এ টিম, নাইটরাইডার, স্ট্রীটহক, অটোম্যানের মতো সব টিভি সিরিজ। তবে ম্যাকগাইভার ছিল সবার সেরা। সুইস আর্মি নাইফ আরডাক্টটেপ দিয়ে জগত জয় করে ফেলা নায়ক মনের অনেকটা জায়গা দখল করেছিল, অনেকগুলো দিনের জন্য।

যখন ছোট ছিলাম রাজনীতির বিষয়টা বড় অস্পষ্ট ছিল। জিয়াউর রহমান যেদিন মারা গেলেন, মনে আছে, সেদিন কেমন থমথমে পরিবেশ ছিল চারপাশে। তার কদিন পর " সাত্তার" নামটা শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেল। আরো কদিন পর " কারফিউ" শব্দটা শিখলাম। বারান্দা থেকে কাঁটাবন রেলগেট রাস্তা দেখা যেত। একদিন দেখি রাস্তায় কান ধরে ওঠবস করছে অচেনা পুরুষ। সামনে সসস্ত্র সৈনিক। তখন হেসেছিলাম, এখন বিমর্ষ হই। জানালার কাঁচ ভেঙ্গে পুলিশ জবাই করার ভয়াবহ গল্পও তখন শোনা। আমি ছবির বই পছন্দ করতাম। একটা বইয়ে ছবি কম ছিল বলে ভালো লাগতো না। দেখতাম বাবা মুখ গম্ভীর করে পড়ছেন। বইটায় অবাক হবার মতো একটা ছবি ছিল, সিড়িতে লুঙ্গি পরা একটা লোক ঘুমিয়ে আছে। পরে জানলাম লোকটাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। বড় হবার পর খুব আগ্রহ করে বইটা পড়েছি, অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাসের " লিগ্যাসী অফব্লাড"।

জীবন প্রথম মদ্যপ দেখি ছয় বছর বয়সে। কাঁটাবনে " নাজু মটর্স" বিখ্যাত ছিল গাড়ি সাড়াই এর জন্য। " নাজু মিয়া একবার দেশী মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তান্ডব চালালো। চারতলার বারান্দা থেকে সেই দৃশ্য দেখতে অবাকই লাগতো। ওই এলাকায় তখন প্রচুর কন্সট্রাকশন চলছিল। একজন রাজমিস্ত্রী পাড়ার পিচ্চিদের কাছে ভীষন প্রিয় ছিলেন। সেলিব্রিটির মতো। একদিন পুলিশ এসে, হাত পিছমোড়া করে বেঁধে তাকে থানায় নিয়ে গেল। দায় সাইকেল চুরির। সম্ভবত সেটাই প্রথম চোর দেখা। একটা পুরোনো ফক্সওয়াগন গাড়ি ছিল দোতলার বাবু ভাইদের। মাসে তিরিশ দিনই নানা কারনে বিকল। একদিন সেই গাড়িটায় আগুন লাগলো। দাউ দাউ শিখায় জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল সেটা (দুর্জনে বলতো ইনসিউরেন্সের টাকা মেরে দিতে ইচ্ছা করেই এটা করা হয়েছিল)। আমার বয়স সাত কিম্বা আট প্রথম দেখা দুর্ঘটনা মনে হয় এটাই।

আমাদের এলিফেন্ট রোডের পাড়াটা ছিল আলাদা। একই পরিবারের ভাইবোনেরা বাড়ি করে একটা পাড়া বানিয়ে ফেলেছে। পরিবারে কাচ্চাবাচ্চা আরভাড়াটেদের বাচ্চা মিলে বিশাল গ্যাঙ। বিকেলে সেই পরিবারের বৃদ্ধ বাবা লাটি ভর দিয়ে হাটতে নামতেন। আমরা সবাই তাকে " নানা" ডাকতাম। নানাকে দেখে একদঙ্গল ছেলে লাইন ধরে দাঁড়াতো হ্যান্ডশেক করার জন্য। এমন ঘটনা কি এখন ঘটে?

আমার পশুপ্রীতি নিয়ে বিস্তর কাহিনী লেখা যায়। সেই দীর্ঘ গল্প বলার আসরএটা নয়। তবে কিছু বিষয় না বললে শৈশবস্মৃতির সাথে অনাচার হবে। ফুলাররোডে থাকতেন বড়মামারা। একটা ভীষন ঝড়ে কে যেন কুড়িয়ে পায় একটা টিয়া পাখির ছানা। ভাইয়ার আগে পাখি ছিল। তাই শেষে তাকেই দেওয়া হল পোষার জন্য। টিয়া পাখির কথা শেখার গুন আছে। এই পাখিটার বাড়তি ছিল বুদ্ধি। তখন " মিন্টু আমার নাম" নামে একটা বাংলা সিনেমা বেশ নাম করেছে। কাজের মেয়ে সাজেদা রেডিওতে সেই কাহিনী শুনতে বসে যায় প্রতিদিন। একবিকেলে আমাদের সবাইকে অবাক করে পাখিটা " মিইইন্টু... মিইইন্টু" বলে ডাকতে লাগলো। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল মিন্টু। মিন্টু বেঁচে ছিল প্রায় চৌদ্দবছর। পেপসির বোতল খুললেই হল, মাতাল হয়ে খেয়ে যেত পাখিটা! দরজায় টোকা দিলে " কে" বলে চ্যাঁচানো, মার্বেল ছুড়ে মারা কিংবা লুকোচুরি খেলার মতো কাজগুলো পাখিটা যখন করতো তখন একটা মানুষের সাথে তার পার্থক্য খুব একটা থাকতো না।

ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় একটা তিলে ঘুঘুর বাচ্চা উপহার দিয়েছিল মিনু আপা। বড় হবার পড়ে সে ভীষন ভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি স্কুল থেকে ফিরি, আরসে আমাকে দেখেই ঘুঘু ঘুঘু ডাক দিয়ে উড়াল দিয়ে ঘাড়ে বসে। বছর খানেক পর একদিন পাখিটা রাগ করে হারিয়ে গেল। ভালোবাসা, মমতা, আদরএই অনুভূতিগুলো শুধু যে মানুষের একার নয়, সেটা তখন টের পাইনি। এখন যখন ভাবি, বড় বিস্ময় লাগে!

আমি খেলাপাগল ছিলাম না মোটেই। আরদশটা ছেলেমেয়ের কাছে " স্পোর্টস ডে" মানে খুব মজার একটা দিন হলেও, ওই একটা দিন মুখ মলিন করে বসে থাকতাম। সবাই যখন প্রাইজ নিয়ে বাসায় ফেরে আমি তখন হিটে বাদ পড়ার লজ্জায় মুখ লুকাই।

বই পড়ার নেশায় ধরেছিল কৈশোরে। কিন্তু শৈশবেও বই বন্ধু ছিল। তবে ছবির বই। বাসায় এনসাইক্লোপিডিয়া অ্যামেরিকানার সেকেন্ড হ্যান্ড সেটা ছিল। সেটার একত্রিশ খন্ড ঘেঁটে ঘেঁটে ছবি দেখতে মন্দ লাগতো না। ভাইয়ার ছিল কমিক্স আরসেবা প্রকাশনীর বইয়ের বিশাল ভান্ডার। তালাবন্ধ থাকায় তাতে ভাগ বসানো যেত না।

নানা রকম বন্ধু ছিল ছেলেবেলায়। পাড়ার বন্ধুরা হারিয়ে গেল পাড়া বদলের সাথে সাথে। নতুন পাড়ায় যা ছিল তাও হারালাম ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে একটাকে বাড়ি দিয়ে। স্কুলের বন্ধুরা রইল অনেকদিন। এখনও দেশে বন্ধু বলতে ওরাই।

তবে ছোটবেলার সবচে' ভালো বন্ধুটাকে চিনেছি বড় হবার পর। সেটা হল বাবা। দোকানে যাবার আগে প্রতিজ্ঞা করতে হতো কোন বায়না করবো না। যখন বাড়ি ফিরতাম তখন হাতে একটা না একটা কিছু থাকতোই।

ছেলেবেলার গল্প আসলে শেষ হবার নয়। ছোট করে লিখতে গিয়ে ভয় হয় কি যেন বাদ পড়ে গেল। শেষ করতে গিয়ে আমার পছন্দের একটা টিভি সিরিজের (যতোবারই দেখি মনে হয় আমার শৈশবেরই ডেপিকশন) লাইন বরং কোট করিঃ

“Growing up happens in a heartbeat. One day you're in diapers, the next you're gone, but the memories of childhood stay with you for the long haul. I remember a house like a lot of houses, a yard like a lot of yards, on a street like a lot of other streets. And the thing is, after all these years I still look back in wonder.”

- The Wonder Years (Final Episode)

## একটি স্ব-সাক্ষাতকার

**অলৌকিক হাসান**

---

অলৌকিক হাসান।
*পেশায় ভিডিও এডিটর। এছাড়াও তিনি একজন নাট্যকার ও পরিচালক। বাংলাদেশের জনপ্রিয় টেরিস্টেরিয়াল চ্যানেল এবং পরেরদিকে একটি স্যাটেলাইট টেলিভিশনে কাজ করেছেন। ১৯৯৯ সালে ভারতের দিল্লী থেকে ভিডিও এডিটিং এবং সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের উপর ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করে টেলিভিশন মিডিয়ায় এখন পর্যন্ত অকান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে লন্ডনে বাংলা কমিউনিটি ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেলে সিনিয়র ভিডিও এডিটর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি এ পর্যন্ত মোট ৮টি নাটক/ টেলিফিল্ম পরিচালনা করেছেন। এছাড়াও তার লেখা ২টি নাটক অন্যের পরিচালনায় টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে। ১৯৯৪ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন গ্র“প থিয়েটারের সঙ্গে। টেলিভিশন মিডিয়ায় ব্যস্ত হবার পূর্বে ১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত তিনি একটি এনজিওতে কাজ করেছেন। অলৌকিক হাসানের ভবিষ্যত ইচ্ছা হলো সুস্থ ও নাচ-গান-মারামারিতে ভরপুর বিনোদনমূলক চলচ্চিত্র নির্মাণের। আমরা বিশ্বাস করি তিনি নিশ্চয়ই সফল হবেন, দেশের একজনজনপ্রিয় চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে তিনি বিখ্যাত হবেন। আরতাই সচলায়তনের প থেকে আগেভাগেই অলৌকিক হাসানের সঙ্গে মুখোমুখি সা◌াৎকারের আয়োজন করা হয়েছে। আজকের আমরা তার ছোটবেলার কথা জানতে চাইব।*

- **কেমন আছেন?**
- ভালো। আপনি?

- **ভালো আছি। আজকে আপনার ছেলেবেলার কথা জানতে এসেছি।**
- বলেন কি! আমার তো এখনো ছেলেবেলা চলছে। বড় হই, তখন না হয় ছেলেবেলার গল্প করব।

- **আপনি বড়ই, তবে এসব বলে ছাড়া পাচ্ছেন না।**
- হুম। যেভাবে চেপে ধরেছেন, বলতেই হবে মনে হচ্ছে।

- **সেই ভালো। আপনি শুরু করুন।**
- সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ দুপুরবেলায় আমার জন্ম। যথারীতি আব্বা অফিসে। জন্মের সময় আমি দেখতে খুব কালো হওয়ায় আম্মার মন খারাপ হয়েছিল। কারণ আমার দেড় বছরের বড়ভাই ছিলেন খুবই ফর্সা। আব্বা খবর পেয়ে অফিস থেকে ফিরলেন এবং একটা মজার কান্ড ঘটালেন। ১ তারিখ ছিল বলে আব্বার বেতন হয়েছিল। নবজাতকের মুখদর্শন করেই আব্বা পকেট থেকে বেতনের সবগুলো টাকা বের করে আমার শরীরের উপর বিছিয়ে দেন। ময়-মুরুব্বিরা হায় হায় করে উঠেছিল টাকার ময়লা আমার গায়ে লেগে যাবে বলে। আপনিই বলুন, টাকার আবার ময়লা! হা হা।

- **ইন্টারেস্টিং। তারপর ?**

- এবার আমার জন্মের আগের দুটি ঘটনা বলি, আম্মার মুখে শোনা। যখন পেটে ছিলাম, আম্মা কোনো একদিন সন্ধ্যার সময় ছাদে হাঁটছিলেন। হঠাৎ ই জোর বাতাস শুরু হয়ে যায়। নিচে নামতে যাবেন এমন সময় আম্মার মনে হলো কেউ যেন তার গালে জোরে থাপ্পড় মারল। আম্মা ভয়ে একদৌড়ে নিচে নেমে আসেন। কিছুদিন পর আম্মা স্বপ্নে দেখলেন, শাদাশুভ্র-জোব্বা পরা-শ্র“শ্রমন্ডিত-লম্বা একজন হুজুর বুকে কোরাণশরীফ নিয়ে খাটের কোণায় দাঁড়িয়ে আম্মাকে ধমক দিয়ে বলছেন, এই মেয়ে, তোর ঘরে কোনো কোরাণশরীফ নেই কেন? ধমক খেয়ে আম্মা ধড়ফড় করে জেগে উঠেন। এখন পর্যন্ত আম্মার দৃঢ়বিশ্বাস তিনি মোহাম্মদ (সঃ) কে দেখেছিলেন। আমি বড় হয়ে এ বিষয়ে বার বার জিজ্ঞেস করে জানতে চেয়েছিলাম উনি দেখতে কিরকম ছিলেন। কিন্তু আম্মা উনার চেহারা মনে করতে পারেন না।

- **আপনার জন্মের সঙ্গে কি এ ঘটনার কোনো যোগসূত্র আছে?**

- আম্মার ধারণা, আছে। আমার জন্মের ২/৩ দিন পর দুপুরবেলায় আমি খাটে ঘুমিয়ে ছিলাম। আম্মা ছিলেন পাশে, টুকটাক আদর করছেন। হঠাৎ ই আমি চিৎকার করে জেগে উঠি। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ দুটো উল্টে ঠেলে বেরিয়ে যাবার যোগাড় হয়। মুখ থেকে গ্যাঁজলা বের হতে থাকে। কালো শরীর আরো কালচে নীল হয়ে যায়। হাত-পা কুঁকড়ে যায়। আম্মা প্রচন্ড ভয়ে চিৎকার করে আশেপাশের লোকজন যোগাড় করে আনেন। কেউ ডাক্তার ডাকতে গেল, কেউ হাত-পা মালিশ করতে লাগল। আম্মা তখন কেঁদেকেঁটে বারবার প্রলাপ বকছেন, তোমরা কেউ একজন হুজুর নিয়া আস আমি জানি আমার ছেলের কি হইছে। যথারীতি ডাক্তার, বৈদ্য, কবিরাজ, হুজুর, পাড়াপড়শী সবাই বাসায় চলে আসে। খবর পেয়ে বাবাও চলে আসেন। হুজুর পানিপড়া দেয়, ডাক্তার ঔষধ দেয়। বিকেলের দিকে আমার অবস্থা স্বাভাবিক হয়। আম্মা সেদিন সন্ধ্যায়ই বায়তুল মোকাররম থেকে একটা সবুজ মলাটের কোরাণশরীফ কিনে আনান। স্বপ্নের রঙ শাদাকালো হলেও আম্মা ওই হুজুরের কোরাণশরীফের মলাটের রঙ সবুজ দেখেছিলেন। এরপর আম্মা কোরাণশরীফ পড়া শিখতে শুরু করেন। বড় হয়ে জিজ্ঞেস করলে আম্মা আরো বলেছিলেন, ওইদিন সন্ধ্যায় ছাদে যখন তিনি হাঁটছিলেন, তখন হয়তো ঘরে ফেরা কোনো খারাপ জ্বিন তাকে থাপ্পড় মারে। স্বপ্নে আলাহ রাসূল স্বয়ং এসে সাবধান করে গেলেও তিনি বুঝেননি। আম্মার ধারণা, আমার জন্মের আগেই যদি তিনি কোরাণশরীফ কিনে রাখতেন তাহলে নিশ্চয়ই এমনটি ঘটত না। আম্মা বলেন, সেই ঘটনার পর থেকেই নাকি আমি সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকি। আমার গায়ের রঙ ফর্সা হতে থাকে।

- **ভয়াবহ ঘটনা তো?**

- মোটেই না, বরং ফানি। যদিও আমি এ বিষয়গুলো নিয়ে কখনোই আম্মার সঙ্গে তর্ক করিনি। তার বিশ্বাস তার কাছেই থাকুক। তবে একটা বিষয় মোটেও ফানি ছিল না।

- **কি সেটা?**

- হাফ মুসলমানি। মায়ের পেটে থাকতেই নাকি আমার অর্ধেক মুসলমানি হয়ে গিয়েছিল। মর্ত্যের হাজম শুধু ফিনিশিংটা দিয়েছেন। বিষয়টা মুসলমানি হওয়ার আগে আমি নিজেও খেয়াল করেছি। হা হা হা।

- **আপনি তো দেখি সাচ্চা মুসলমান।**

- একদম৷ একবার সারা ঢাকা শহরে রব উঠল যে, বাচ্চাদের মাথায় শাদা চুল পাওয়া গেলে সে নাকি আলাহতায়ালার পেয়ারের বান্দা। আম্মা তখন অনেক খুঁজে পেতে কেমন করে জানি আমার মাথার চুল থেকে একটা শাদা চুল পেয়ে গেলেন। তারপর সেটা ময়ুরের পাখনার সঙ্গে কোরাণশরীফে স্থান পেয়ে গেল। আম্মা আমাকে বরাবরই স্পেশাল ভাবেন।

- **আপনার বাবা, বড়ভাই এদের সম্পর্কে কিছু বললেন না।**

- আব্বা ছিলেন সরকারি চাকুরিজীবী। আরআম্মা তো পুরোদস্তর গৃহিনী। আমরা তখন সাবলেট থাকতাম মধুমিতা সিনেমা হলের পেছনে বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনিতে। তখনকার স্মৃতি আমার হালকা হালকা মনে পড়ে। আর ওই যে বললাম, আমি স্পেশাল, পয়মন্ত। আমার জন্মের পর আব্বার প্রমোশন হয়। আমরা তখন সাবলেট ছেড়ে গোপীবাগ ৫ম লেনের দুইরুম বিশিষ্ট একটা টিনের চৌচালা ঘর ভাড়া নেই, যার মেঝে ছিল মাটির।

- **স্কুলজীবনের কথা বলুন।**

- গোপীবাগে আসার পর আমার বড়ভাই রাশেদুল হাসান রিপনকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। স্কুলের নাম রামকৃষ্ণ মিশন মহাবিদ্যালয়। আমি তখনও খুব ছোট কিন্তু ভাইয়ার খাতাপত্রে, ঘরের মেঝেতে আঁকিবুঁকি করতে করতে

সাড়ে তিনবছর বয়সেই আমি অ আক খ শিখে ফেললাম। ভাইয়া যখন স্কুলে যেত, আমিও যাবার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করতাম। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর আমার স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হলো। হঠাৎ একদিন বাড়িতে কিছু মহিলা এলেন। তারা নতুন একটা স্কুল করেছেন কিন্তু ছাত্রছাত্রী নেই। তাই দলবেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করছেন। আমাকে দেখে আম্মাকে খুব করে অনুরোধ করলেন যেন আমাকে ওই স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। খরচ তেমন একটা না। আম্মা সুযোগটা মিস করলেন না। আমি ভর্তি হয়ে গেলাম লিটল ডায়মন্ড কিন্ডারগার্টেন স্কুলে বেবি শ্রেণীতে। আমাকে আনা নেওয়া করতে করতে আমার স্বল্পশিতি আম্মা সে স্কুলের শিক্ষিকা হয়ে গেলেন। তখন বছর প্রায় শেষ হতে চলছিল। রামকৃষ্ণ মিশনে ভাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলে আমাকেও প্রথম শ্রেণীতে ওই স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়। আমার বয়স তখন চার। সেই থেকে আমরা দুইভাই একসঙ্গেই পড়াশোনা করে এসেছি।

- **স্কুলে যেতে আপনার কেমন লাগত? খুব দুষ্টুমি করতেন বুঝি?**

- একদমই না। স্কুলে যেতে আমার ভালোই লাগত। দুইভাইকে একসঙ্গে স্কুলে নিয়ে যেতেন আম্মা। ছুটির আগপর্যন্ত বসে থাকতেন তিনি। মিশন স্কুলকে আমি কখনোই ভুলব না। আমার জীবনে মিশন স্কুলের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। কিন্ডারগার্টেনে আমি বড়জোর ২/৩ মাস ছিলাম। রামকৃষ্ণে আসার পর আমি খুবই খুশি হই। দুইটা বড় বড় মাঠ, পুকুর, প্রচুর কৃষ্ণচূড়া, বকুল গাছ ছিল। নিয়মিত ক্রীড়ানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। আমি স্কুলে বেশি কথা বলতাম না, শান্ত স্বভাবের ছিলাম, তবে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম, পুরষ্কারও পেয়েছি। মিশন স্কুলে ছিল বিশাল লাইব্রেরি। আমার মনে হয় না বাংলাদেশের আর কোনো মাধ্যমিক স্কুলে এতোবড় লাইব্রেরি আছে। লাইব্রেরিটা আমার মনে দাগ কেটে গেল কেন সে ঘটনাটা বলি। কাস টুতে পড়ি মনে হয় তখন। আমি মাঠে খেলছিলাম। হঠাৎই আমার মনে হলো আচ্ছা সবাই ওই ঘরে (লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার টাইপের শব্দ তখনও আত্মস্থ হয়নি) টেবিলে বসে কি লিখে? আমি উৎসুক হয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকলাম। ভাবলাম এদের মনে হয় বাসায় বই নেই। এখানে তারা লিখে, বাসায় নিয়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত নেই, আমিও তাই করব। শেলফ খুঁজে একটা রূপকথার বই নিয়ে টেবিলে বসে

(তখনও টেবিলে থুতনি প্রায় লেগে যায় অবস্থা) খাতায় লিখতে শুরু করি। কিছুণ পর আমার খেয়াল হয়, আরে, আমি যা যা লিখছি তা তো পড়ে ফেলছি। তাহলে বাসায় নিয়ে কি পড়ব। আমি লেখা বন্ধ করে শুধু পড়তে শুরু করি। ব্যস, এরপর স্কুলের প্রায়দিনগুলোতে আমি সারা লাইব্রেরি খুঁজে গিলতে শুরু করি শিশুতোষ রামায়ণ, মহাভারত, দেবদেবতার বীরগাঁথা। রঙিন ছবিসহ বইগুলো আমার পড়ার তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয়। আমার (আউটবই) পড়ার নেশা সেই থেকে।

- **দুর্গাপূজার জন্য তো রামকৃষ্ণ মিশন বিখ্যাত। আপনি পূজোর সময় কি করতেন?**

- আসলে পূজোর সময় স্কুল ছুটি থাকত। আমি ওই স্কুলে পড়া অবস্থায় কখনো পূজো দেখিনি। তবে হিন্দু ছাত্রদের জন্য হস্টেল ছিল। ওইখানে মাঝে মাঝে যেতাম, আমাদের প্রসাদ খেতে দিত। মিশন স্কুলে মা কালীর প্রতিমা ছিল। ওটাকে ভয় পেতাম প্রথম প্রথম, পরে অবশ্য তা কেটে গেছে। নামে হিন্দু হলেও স্কুলে ধর্মসংক্রান্ত কোনো বাড়াবাড়ি আমি কখনো দেখিনি। বরং ফ্রি হাসপাতাল ছিল, সেখানে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে গরীবদের ফ্রি চিকিৎসা হতো। আমরা কৃষ্ণচূড়ার মুকুল দিয়ে কাটাকাটি খেলতাম, বকুল ফুল দিয়ে মালা গাঁথতাম। মাঝে মাঝে স্কুলের বড় মাঠ ছেড়ে ব্রাদার্স ইউনিয়নের মাঠে খেলতে যেতাম।

- **স্কুলজীবনের দুইএকটি ঘটনার কথা বলুন।**

- ভাইয়া একবার অঙ্কে একশতে একশমার্ক পেয়েছিল। তো ছুটির পর ভাইয়া আম্মার কাছে দৌড়ে আসছে আর চিৎকার করছে, আম্মু আমি একশতে দুইশ পেয়েছি। খাতার উপর ১০০/১০০ দেখে ভাইয়া ভেবেছিল ১০০ মার্কের পরীোয় টিচাররা তাকে ২০০ মার্ক দিয়েছে। বার্ষিক পরীোর পর আমাদের মৌখিক পরীো হতো। তখন আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো, বটগাছ কোথায় দেখা যায়? আমি ঝটপট উত্তর দিলাম, শিশুপার্কে। অথচ সঠিক উত্তর ছিল নদীর তীরে বটগাছ দেখা যায়। আমি ভুলে গিয়েছিলাম কারণ বার্ষিক পরীোর পর আব্বা আমাদের শিশুপার্ক দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ওইখানে বটগাছ দেখেছিলাম। টিচাররা অবশ্য আমার উত্তর সঠিক ধরে নিয়েছিল। আরেকবার, তখন বোধহয় কাশ ৩/৪ এ পড়ি। হঠাৎ করে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। আমরা তো ব্যাপক খুশি। খবর নিয়ে জানা গেল, কোথায় জানি ইন্দিরা গান্ধী নামে কে একজন মারা গেছে। আমাদের আরপায় কে। স্কুলছুটি, সেটাই বড় ব্যাপার। মিশন স্কুলে সপ্তাহে একদিন গানের কাশ হতো। আমাকেও যেতে হয়েছিল সেখানে। কচিকণ্ঠে আমরা গাইতাম, মায়াবনবিহারিণী হরিণী অথবা আলো আমার আলো ওগো। আমার চরম বিরক্ত লাগত। দল বেঁধে এই গান গাওয়ার বিষয়টা এনজয় করতাম না। তবে কিভাবে কিভাবে জানি আমি ওই গানের কাশ থেকে মুক্তি পেয়েছি তা মনে করতে পারি না। এখন খুব আফসোস হয়। আমার গলায় সুর একদমই নেই। যেসব মেয়েরা আমার সঙ্গে ফোনে কিংবা মুখোমুখি ঝগড়া করে চলে গেছে, ঠিক সেইসব মুহূর্তগুলোতে আমি যদি দুয়েকটা গান গেয়ে ফেলতে পারতাম, তাহলে তারা চলে যেত না। এমনও হয়েছে, মধ্যরাতে কথা বলছি, ওপাশ থেকে গান গাওয়ার অনুরোধ এলো, আমি ইনিয়ে বিনিয়ে আরেকদিকে চলে যাই। হয়তো আরো ঘন্টা দুয়েক কথা বলার প্যান ছিল, আধঘণ্টার পরেই ওপাশ থেকে বিদায়ের ঘন্টা বাজে। আচ্ছা, যে লোক গাইতে পারে না, মেয়েরা তার কাছ থেকে গান শুনতে চাইবে কেন? ভেবে দেখুন তো কি জ্বালা।

- **নারীমন বোঝা ঈশ্বরেরও সাধ্যির বাইরে। যাহোক, আপনার ছোটবেলার বন্ধুদের কথা বলুন।**

- রামকৃষ্ণ মিশনে কাস ফোর পর্যন্ত পড়েছি। তো বন্ধু বলতে তখন কাসের ছেলেরাই। তাদের অনেকের নাম, চেহারা এখন মনে করতে পারি না, একমাত্র মেহেদী ছাড়া। মেহেদী বোধহয় কাস টুতে রামকৃষ্ণে এসেছিল। মাঝখানে একবছর আলাদা ছিলাম। তারপর কলেজ পর্যন্ত একসঙ্গেই পড়েছি। একেবারে ছোটবেলার বন্ধু বলতে এই মেহেদীর সঙ্গেই আমার এখন পর্যন্ত যোগাযোগ রয়েছে। ব্যাটা আমার আগে বিয়ে করেছে, এখন লন্ডনে থাকে। গোপীবাগে থাকার সময় এলাকার কারো সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তেমন হয়নি। আম্মা ঘর থেকে বের হতে দিতেন না। এলাকায় নিত্য মারামারি লেগে থাকত। এছাড়া আমাদের বাসার আশেপাশে বস্তি ছিল। আম্মার ভয় ছিল আমি বস্তির ছেলেদের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যাব। তারপরও মাঝে মাঝে বের হলে ওই বস্তির ছেলেগুলোর সঙ্গেই খেলতাম। গোপীবাগ বাজারে বেশ কয়েকটা কাবঘরে সারাদিন ক্যারাম খেলা হতো পয়সার বিনিময়ে। আমি মাঝে মাঝে সেখানে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতাম। পরে অনেক বায়না করে বাসায় একটা ক্যারামবোর্ড কিনেছিলাম। আরস্ট্যাম্প জমাতাম। স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে স্ট্যাম্প অদলবদল করতাম।

- **তার মানে ছেলেবেলায় আপনার বন্ধুসঙ্গ তেমন যুৎসই ছিল না?**

- না ছিল। কিন্তু গোপীবাগ এলাকায় থাকতে নয়। ওই যে বললাম, বস্তির ছেলেগুলো। ঘর থেকে বের হতে পারলে ওদের সঙ্গেই ঘুরতাম। একবার হলো কি, ওদের মধ্যে অনেকেই কাগজ কুড়াতো। তারপর বিক্রি করে ২/৩ টাকা পেত। তো আমারও শখ হলো কাগজ কুড়ানোর। আমিও একদিন বেরোলাম ওদের সঙ্গে। প্রায় দুইতিন ঘন্টা কাগজ কুড়ালাম। কিন্তু আমার থলে প্রায় পুরোটাই খালি। ওরা যে দতায় ডাস্টবিন থেকে কাগজ কুড়িয়ে ফেলত, আমি সেটা পারতাম না। নোংরার ভয়ে আমি সেখানে যেতাম না। জীবনে প্রথমবার কাগজ কুড়িয়ে ৫০ পয়সা পেয়েছিলাম। এরপর থেকে বাসার পুরোনো কাগজ, পুরোনো খাতা এগুলো ফেলতাম না। সেগুলো জমিয়ে এবং কাগজ কুড়িয়ে আরেকদিন ২ টাকা পেয়েছিলাম। ওরা খায় বলে আমিও আরেকদিন ওদের সঙ্গে মুগদা ঝিলপাড় থেকে জংলী শাক তুলতে গেলাম। তবে আম্মার ভয়ে বাসায় নিয়ে যাইনি। আমাদের ওইখানে একটা মেথরপট্টি গড়ে উঠেছিল। সেখানে রেললাইনের ব্রিজের তলে নোংরা ড্রেন ছিল। আমার বস্তির বন্ধুরা ব্রিজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোসল করত। আমার সাহস হতো না আম্মার ভয়ে। তবে মাঝে মাঝে মেথরপট্টিতে গিয়ে শূকর দেখে আসতাম। আমার বস্তির বন্ধুরা খুব গালাগাল দিত। আমি ভয়ে সেগুলো উচ্চারণ করতাম না। আম্মা শুনলে স্রেফ জবাই করে ফেলবে। কিন্তু একদিন আমার বড়ভাই মনের ভুলে বাসায় ' বাল' শব্দটি উচ্চারণ করে ফেলে। সেদিন আম্মার রুদ্রমূর্তি কে দেখে! সুই নিয়ে এলো ঠোঁট সেলাই করে দেবে বলে। এবং সত্যি সত্যিই ভাইয়ার ঠোঁটের উপর সুইঁয়ের হালকা খোঁচা দিয়ে রক্ত বের করে ফেলল। আম্মা কাজটা করেছিল যেন আমরা ভয়ে আরকখনো খারাপ কথা না বলি।

- **তাহলে আপনি খেলাধুলা করার সুযোগ পাননি তেমন একটা।**

- খুব পেয়েছি কিন্তু তখন পর্যন্ত না। প্রথমত বাসায় খেলার জিনিসপত্র খুব একটা ছিল না। কারণ কোনো খেলনাই বেশিদিন রাখতে পারি না। নাটবল্টু খুলে ভেঙে ফেলি। তাই আব্বা-আম্মা খেলনা কিনে দেবার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করত। আমরা ততোদিনে টিনের ঘর ছেড়ে ওই এলাকারই একটা দোতলা বাড়ির একরুম ভাড়া নেই। আমরা খুশি হয়েছিলাম কারণ ওই বাড়ির ছাদ ছিল। তখন প্রচুর ঘুড়ি ওড়ানো হতো। যদিও আমরা সেটা করতে পারিনি। সেইসময় ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ৩টা ছেলে ছাদ থেকে পড়ে মারা গিয়েছিল। তাই ঘুড়ি সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে আম্মার প্রবল আপত্তি ছিল। খেলাধুলা বলতে রামকৃষ্ণ স্কুলে টিলো-এক্সপ্রেস, ছোয়াঁছুয়ি, বোমবাস্টিং খেলতাম। আমারা বন্ধুর পুরো নাম ছিল মুন্সী মেহেদী জামান। কি মুন্সী মিলাদ পড়াইবা - বলে মেহেদীকে খেপিয়ে সারামাঠ দৌড়াতাম। সেটাও একপ্রকার খেলা ছিল। এছাড়া ঘরে ভাইয়ার সঙ্গে খেলতাম। আরআম্মা মাঝে মাঝে বেরোতে দিলে বাসার সামনে মাঠে টুকটাক ফুটবল খেলতাম। আবাহনী তখন বোধহয় কোনো কাপ জিতেছিল। ' সালাহউদ্দিন,

আবাহনী' চিৎকারে বিশাল মিছিল হলো। আমি সেই থেকে আবাহনীর সাপোর্টার হয়ে গেলাম। যেমনটা ব্রাজিলের সাপোর্টার পেলের জীবনকাহিনী পড়ে। আরএকটা বিষয় ভালো লাগত যখন খালার বাসায় বেড়াতে যেতাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে ৫ টাকা রিক্সা ভাড়ায় আমরা গোপীবাগ থেকে অতীশ দিপংকর সড়ক (তখন এতো প্রশস্ত ছিল না, রাস্তার দুই পাশের খাদে অনেক ছাপড়া ঘর ছিল) হয়ে গোড়ান টেম্পুস্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতাম। খুব এনজয় করতাম জার্নিটা। খালার বাসায় গেলে খালাতো ভাই কল্যাণের সঙ্গে খেলতাম, দেয়াল চড়তাম। পাশের বাসার বাথরুমে ঢিল মারা, পেয়ারা চুরি করা, খেলা বলতে এগুলোই। তবে গোপীবাগে থাকতে আমার মধ্যে একটা খারাপ বিষয় জন্ম নিল। আমি মারামারি করতে শিখে গেলাম। বন্ধুদের সঙ্গে মতান্তর হলে আমি হুটহাট মারামারি লেগে যেতাম।

- **একদম খারাপ কথা। মারামারি করা মোটেই ভালো না। কি বলেন?**

- অবশ্যই। কিন্তু ওইসময় এরকম মনে হতো না। গোপীবাগ থাকতে কড়া শাসনের মধ্যে থাকতাম। নিয়মিত স্কুল যেতাম। পাশের বাড়ির মহিলা হুজুরের কাছে আমপারা, সিপারা, কোরাণ পড়তে যেতাম। আমি কাস থ্রিতে থাকতে প্রথম কোরাণ খতম করি। খুব ভারি ছিল বলে মাঝে মাঝে রাস্তায় কোরাণশরীফ আমার হাত থেকে পড়ে যেত। আম্মা তখন মসজিদে চাল দিত যেন আমার গুণাহ না হয়। আমাদের বাসায় টিভি ছিল না। আমরা পাশের বাসায় টিভি দেখতে যেতাম। ফোরে একগাদা পিচ্চি পোলাপানদের সঙ্গে বসে বসে টিভি দেখতাম। একদিন ওই বাড়ির মহিলা খারাপ ব্যবহার করায় আম্মা জিদ করলেন টিভি কিনবেন। কিছুদিন পরেই আমাদের বাসায় শাদাকালো ফিলিপস ২০ ইঞ্চি টিভি কিনি। ছয়নয় চ্যানেল মিলিয়ে ছায়াছন্দ দেখার কি যে মজা তখন। গোপীবাগ থাকতে আমার সবচেয়ে ভালো লাগার স্মৃতি আমার মুসলামানির অনুষ্ঠান। প্রচুর গিফট পেয়েছিলাম। তারমধ্যে বিভিন্ন খেলনা, টেবিলল্যাম্প, হাতঘড়ি এসব ছিল। এরমধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল কলমঘড়ি উপহার পাওয়াতে। বাড়ির ছাদের পুরোটাই প্যান্ডেল করে ৪০০ লোককে খাওয়ানো হয়েছিল। দেশের বাড়ি থেকে সমস্ত আত্মীয় স্বজন এসেছিল। সে এক এলাহী আয়োজন। কাস ফোর পাস করে যখন ফাইভে উঠব তখন আমরা গোপীবাগ এলাকা ছেড়ে সবুজবাগে এসে উঠি। রামকৃষ্ণ ছেড়ে দিব, বস্তির বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে না। আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

- **সবুজবাগে নিশ্চয়ই প্রচুর বন্ধু হলো।**

- হুম। আমার প্রচুর বন্ধুবান্ধব হতে লাগল। বন্ধুদের তালিকায় মেয়েরাও যোগ হতে লাগল। তবে নিয়তির বিধান কে বোঝে। সবুজবাগেও বস্তি ছিল। সেখানকার দুয়েকটা ছেলের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সবুজবাগে আমাদের বাসাটা বড় ছিল। দোতলায় দুইটা রুম, বড় রান্নাঘর ছাড়াও একটা ব্যালকনি ছিল আরতার পাশ বেয়ে একটা নারকেল গাছও ছিল। আমরা দোতালায় থাকতাম। আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত কাঁকন আরমন্টি। এছাড়াও ছিল ভোলন, সবুজ, শিপলু, বাদল, হেলেন ভাই, নান্টু ভাই, প্রবাল ভাই, লিটন ভাই। সবুজবাগে আমার খেলাধুলার নেশায় পেয়ে বসল। আমি প্রচুর ব্যাডমিন্টন, দাঁড়িচা, সাতচারা, ফুলটোক্কা, কানামাছি, লাটিম (ঘরকোপ আরবেল্লাপাড়) ফুটবল খেলতে শুরু করলাম। খেলার ফাঁকে সময় হলে দৌড়ে থান্ডার ক্যাটস দেখতে ছুটে যেতাম। পাড়ার প্রায় সবারই টিভি থাকলেও আমরা নান্টু ভাইদের বাসায় দলবেঁধে দেখতাম। আমাদের পাড়াটা ছিল কানাগলি। তাই পাড়ার সব পরিবারের মধ্যে কেমন একটা আত্মীয়ের মতো বন্ধন ছিল। আমরা ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে খেলতাম। কেউ কিছু মনে করত না। আমগাছ, নারকেল গাছ ছিল। শবেবরাতের রাতে পাড়ার বড়ভাইরা নারকেল চুরি করত। আমরা সঙ্গ দিতাম। রিকশা নিয়ে সবুজবাগের বস্তির ছেলেদের সঙ্গে রাতে জরি মেখে ঢাকা শহর ঘুরলাম। বিশেষ বিশেষ দিনে তখন রাত ৭/৮টা পর্যন্ত বাইরে থাকার অনুমতি পেতাম। কিন্তু দুপুরবেলায়

ঘুমানোর জন্য আম্মা দরজায় তালা মেরে রাখত। তখন বের হতে পারতাম না। সবচেয়ে মজা লাগত যখন কারেন্ট চলে যেত। আমরা ছেলেমেয়েরা বের হতাম পাড়ায়। হাঁটাহাঁটি করতাম, গান গাইতাম, অন্ধকারেই ছোঁয়াছুঁয়ি খেলতাম। হটপ্যাটিসওয়ালা আসত্আমরা কিনে খেতাম। ততোদিনে আহমদবাগের আদর্শ হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেছি। ঝিলের পাড়ে স্কুল। বড়শি দিয়ে মাছ ধরা শিখলাম। আমার চেহারা দেখতে নাকি অনেকটা চাকমাদের মতো। আর সবুজবাগে ছিল বৌদ্ধমন্দির। ওখানে অনেক বন্ধু জুটে গেল। বৌদ্ধমন্দিরের পুকুরের ঝাপাঝাপি চলত। সকাল

দশটায় পুকুরে নামতাম। এক ঘন্টা দাপাদাপি করে পরের আধাঘন্টায় রোদে দাঁড়িয়ে প্যান্ট শুকিয়ে বাসায় গিয়ে স্কুলড্রেস পরে সোজা স্কুলে। কাস শুরুর আগে দাঁড়িচা খেলে তবেই স্কুলে ঢুকতাম। এছাড়াও কাস ফাইভে পড়ার সময় আমরা দুইভাই পল্টনে কচিকাঁচার আসরে ছবি আঁকা শিখতে যেতাম। প্রথমে মোমের রঙে, পরে তুলি দিয়ে। প্রথম প্রথম আম্মা নিয়ে যেতেন, পরে গৃহশিক নিয়ে যেতেন। একবার হলো কি, কচিকাঁচা বিল্ডিংয়ের দোতালায় লাইব্রেরি ছিল। আমি ওইদিন ছবি তাড়াতাড়ি এঁকে কাউকে কিছু না বলে দোতালায় গিয়ে গল্পের বই পড়া শুরু করলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক পর আমার টিচার আমাকে খুঁজে পেল। প্রচন্ড প্তি হয়ে তিনি আমাকে বিল্ডিংয়ের আড়ালে নিয়ে গিয়ে মারধোর করতে থাকল। আমিও মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে টিচারের গালে থাপ্পড় বসিয়ে দিই।

- **আপনি তো ভালোই দস্যিপনা করতেন।**

- না, আমি মোটেই সেরকম ছিলাম না। দেখতে খুবই শান্তশিষ্ট ছিলাম, শুধু মারামারি একটু করে ফেলতাম। আমার মুখে অসংখ্য খামচির দাগ এখনো রয়ে গেছে মারামারির কল্যাণে। তবে ইন্টারপাস করার পর এই মারামারি করার ব্যাপারটা একদমইচলে গেছে। হয়তো মাঝে মাঝে দু'একবার করেছি। সবুজবাগে আমার আরেকটা ভাই জন্ম নেয়। কিন্তু আমার মন খারাপ হয়ে যায় ভাই জন্ম নিয়েছে শুনে। আমি খুব করে চাইছিলাম আমার যেন একটা বোন হয়।

- **আপনার লেখালেখির শুরুটা কবে থেকে?**

- সেটা আরো পরে। আমি তখন খুব করে পড়ছি। এলাকার হাবিব বুকস দোকানে সেবাপ্রকাশনীর বই ছাড়াও অন্যান্য গল্পের বই ১ টাকায় ভাড়া পাওয়া যেত। আমি যেন সোনার খনি হাতে পেলাম। যেনতেন প্রকারে ১ টাকা যোগাড় করা চাই। বাসায় কেউ বেড়াতে এলে আম্মার অনুপস্থিতিতে আমি লুকিয়ে আস্তে করে চাইতাম, আমাকে ১টা টাকা দিবেন? আমি গল্পের বই পড়ব। আচ্ছা বলেন, কেউ তখন টাকা না দিয়ে থাকতে পারে? টাকা পেয়েই আমি দৌড় দেই হাবিব বুকসে। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করি কুয়াশা, বনহুর, থ্রিলার, কাসিক। পুরো হাবিব বুকস পড়ে শেষ করে ফেললাম। ততোদিনে মতিঝিল মডেল হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছি কাস সিক্সে। মেহেদীও রামকৃষ্ণ ছেড়ে ওখানে ভর্তি হয়েছে। ব্যাটাও বই পড়ে প্রচুর। আমার আরেকটা সোর্স পাওয়া গেল। এছাড়াও পাড়ার নান্টু ভাইও অনেক বই পড়তেন। নান্টু ভাইয়ের বড় আপা বেবি আপা আমাকে প্রথম বড়দের (?) বই পড়তে শেখায়। অতি নির্জলা কিন্তু সেইসব প্রেমকাহিনী পড়ে আমি তখন শিহরিত হতাম। লিমা প্রকাশনীর সুইটহার্ট, মাইলাভ বইগুলো বাসায় লুকিয়ে পড়তে হয়েছিল।

- **হুমম বেবী আপা। কিন্তু আপা ছাড়া আরকেউ, এই ধরেন পাড়ার ছোটবোন অথবা বন্ধু ছাড়াও আরো বেশি কিছু হতে চায়, মানে বুঝতেই পারছেন ...**

- খুব বুঝতে পারছি। কিন্তু ওই সময় পর্যন্ত তেমন কিছুই ঘটেনি। কাস সেভেন পর্যন্ত মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করেছি। আমার শুধুমাত্র কাঁকনের কথাই মনে আছে। আমাদের পাশের দোতালায় থাকত। তবে কোনো কোনো দিন খেলতে আসতনা। এখন বুঝি কেন? ভালোবাসাবাসির কথা যদি ধরেন তাহলে ছোটবয়সের প্রথম ভালোলাগা ছিল বাঁধন নামে আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়কে। প্রেমের নির্দশন স্বরূপ আমি খাতাপত্রে, বইয়ের কোণায় খুব ছোট করে লিখে রাখতাম বাঁধন ছিড়ে পালাল পাখি। আজপর্যন্ত মুখ ফুটে বলা হয়নি। দুই সন্তানের মা বাঁধন নিশ্চয়ই এখন খুব ভালো আছে। ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রেম, বিয়ে, যৌনতা, জন্মরহস্য এসব বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রথম জ্ঞানলাভ করি মাদ্রাসা পড়–য়া বন্ধু বাদলের কাছ থেকে। এর পূর্বে আমার ধারণা ছিল বাবা-মা আমাদের আল্লাহর কাছে চেয়েছেন এবং আল্লাহ রাতের বেলায় টুপ করে বিছানায় রেখে এসেছেন। বাদলই প্রথম আমার এ ভ্রান্ত ধারণা ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করে। আমি যখন কিছুতেই বিশ্বাস করছি না, তখন সে মহানবীর উদাহরণ টানে। আমার আরমানতে বাধা থাকে না। মাদ্রাসা পড়–য়া বাদল কি আরতার (মহানবী) সম্পর্কে মিথ্যা বলবে? যাহোক, সবুজবাগে আমার মারামারির অভ্যাস আরো বেড়ে যায়। আম্মাকে এ নিয়ে প্রায় শালিশ করতে হতো। আম্মা আগে আমাদের মারতেন তারপর শালিশ করতেন। আর একটা বাজে অভ্যাস ছিল স্যান্ডেল হারিয়ে ফেলার। মাগরিবের আযান পড়ল, খেলাও শেষ। আমি স্যান্ডেল ফেলে খালি পায়ে বাসায় ফিরলাম। এইসব করতে করতে আর পড়তে পড়তে আমি প্রথম কবিতাটা লিখে ফেলি কাস সিক্সে থাকতে - স্বাধীনতা নিয়ে।

- **এতো বিষয় থাকতে স্বাধীনতার মতো এতো কঠিন বিষয় বেছে নিলেন কেন?**

- প্রভাবটা নানার ছিল। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের গল্প শুনতাম তার কাছ থেকে। এছাড়া আম্মা-মামারা আমাদের দুইভাইকে নানার বিভিন্ন বীরত্বগাঁথা শোনাতেন। তার মোড়লগিরি, যুদ্ধের কথা এসব শুনতে শুনতে আমি স্বাধীনতার বিভিন্ন বিষয়ের উপর আগ্রহী হই। আমার সেই বয়সের আদর্শ ছিলেন আমার নানা। ডিসেম্বরের ছুটিতে আমরা গ্রামে বেড়াতে গেলে নানার দাড়ি টেনে টেনে গল্প শুনতাম। তবে মজার কথা হলো, ওই কবিতাটাই আমার প্রথম এবং শেষ কবিতা। দ্বিতীয় আরেকটি কবিতা লিখতে চেয়েছিলাম কাসে বসে বসে। তখন পাশের ছেলেটা দাঁড়িয়ে বলল, আপা, ও না কবিতা লেখছে। আপা বললেন, কবিতা লেখতে হয় গাছতলায় গিয়ে লেখো, কাসে নয়। সেই থেকে কবিতা লেখা ছেড়ে দিলাম। তার বদলে পড়ার ঝোঁকটা আরো বেড়ে গেল।

- **আপনি আরলেখালেখিই করলেন না?**

- ছেলেবেলায় আরনা। এরপরের যাবতীয় লেখালেখি আমি ইন্টারপাস করার পরে শুরু করি। ততোদিনে আমার ঘর পালানো রোগ হয়েছে। নজরুল ইসলামের জীবনী পড়ে আমি প্রচুর প্রভাবিত হই। ধরেন আম্মা মারল, আমি চিন্তা করলাম, কি লাভ এ সংসারে থেকে। ঘর পালিয়ে কই নজরুল তো মারা পড়লেন না। আমিও বেশ কয়েকবার ঘর পালালাম। সকালে রাগ করে ঘর ছেড়ে পালিয়ে দূরে দূরে চলে যেতাম। খুব ে িধ পেত। একবার হাঁটতে হাঁটতে মাদারটেক ছাড়িয়ে রাজারবাগ ছাড়িয়ে কাঁচপুর ব্রিজের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। ে িধর জ্বালায় বড়ই গাছে ঢিল মেরে কাঁচা বড়ই খেয়েছিলাম। প্রতিবারই আমি ঘর পালালে আম্মা আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী জড়ো করে কান্নাকাটি করতেন। আরআমি সন্ধ্যা হলে ে িধর জ্বালায় পাড়ার আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম যেন কেউ আমাকে জোর করে ধরে বাসায় নিয়ে যায়। প্রেস্টিজ বলে একটা কথা আছে না। নিজ থেকে বাসায় ফিরি কি করে। ততোদিনে সিগারেট ফুঁকতে শিখেছি, মানে মুখে ধোঁয়া নিয়ে হুশ করে ছেড়ে দেয়া, ভেতরে নিতে পারতাম না। ক্যাপস্টান বলে একটা সিগারেট ছিল। ওইটা খেয়েছি। তারপর বস নামেও একটা ছিল। সিজার খেয়েছি, ক্যানন খেয়েছি। আমার খুব একটা ভালো লাগত না। পান মুখে নিয়ে খেলে নাকি সিগারেট হেভি লাগে। ট্রাই করলাম, মজা পেলাম না। আব্বা সিগারেট খান, একদিন সেখান থেকে চুরি করে দিনের বেলায় টয়লেটে বসে সিগারেট খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দরজায় নক। খোলার সঙ্গে সঙ্গেই কানের নিচে আম্মার বিশাল চটকনা বসিয়ে দিলেন, টয়লেটে বসে সিগারেট খাও? আমি খুব আশ্চর্য হলাম, বুঝল কিভাবে? পরে আবিষ্কার করলাম টয়লেটের জানালা দিয়ে রোদ এসে দরজার

ফাঁক দিয়ে তীর্যকভাবে ঘরের মেঝেতে পড়ত৷ আমার সিগারেটের ধোঁয়া সেই তীর্যক রোদে একটা ধোঁয়াটে আবহতৈরি করেছে। আম্মা টয়লেটের বাইরে থেকে ছেলের কীর্তি ধরে ফেলেছেন। অবশ্য সিগারেট আমার খুব একটা ভালোও লাগত না, তাই ছেড়ে দিলাম। শরীর রায় মনোনিবেশ করলাম। দুই ভাই মিলে প্রতিদিন সকালে কমলাপুরের ইঞ্জিন ওয়ার্কশপে জগিং, ব্যায়াম এবং বিকেলে কুংফু শেখা শুরু করলাম। যে কোনো প্রকার ডিগবাজি, রেললাইনের ফাঁকে দুই পা সমান্তরালে ছড়িয়ে দেয়া, গাছ, দেয়াল বেয়ে উঠে যাওয়া এসব কোনো ব্যাপারই থাকল না। ডিগবাজির অনেকগুলো আমি এখনও দিতে পারি।

- **হা হা, কুংফুম্যান। এবার আপনার গ্রামের বাড়ির কথা তো কিছু বলেন।**

- আমার গ্রামের বাড়ি ফেনী জেলার বিজয়সিংহ গ্রামে। এইটা আমার দাদাবাড়ি। নানাবাড়ি হলো লেমুয়া।

আমরা প্রতিবছর খালাতো ভাইবোনসহ গ্রামে যেতাম। দাদাবাড়িতে থাকা হতো কম। দুয়েকদিন থেকেই নানাবাড়ি ছুটতাম। সবাই মিলে ডাব, সুপারি, খেজুর রস সাবাড় করতাম। নানাবাড়ি ছিল বিশাল। বিয়ের আগে মা খুব দস্যি ছিলেন। নানাবাড়ির প্রতিটা আমগাছের মা আলাদা আলাদা নাম দিয়েছিলেন। আমের ভারে গাছের ডাল ভেঙে পড়তে দেখেছি আমি নিজের চোখে। মামারা তখনো কেউ বিয়ে করেননি। তাদের সঙ্গে বাজারে যেতাম, বিভিন্ন জিনিস খেতাম। চৌধুরীর নাতি হিসেবে কিছু টাকাপয়সাও উপহার পেতাম। একবার হলো কি, দাদাবাড়িতে কোনো এক কারণে বড় ভাইয়ের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে বড় ভাইয়ের হাত ভেঙে গেল। ফেনী শহরে নিয়ে চিকিৎসা করানো হলো। কিন্তু আম্মার মন তো মানে না। পরদিনই তিনি আমাদের নিয়ে ঢাকায় চলে এলেন। ডাক্তার দেখানো হলো এবং দেখা গেল ভুল প্লাস্টার করানোর কারণে ভাইয়ার ভাঙা হাতে পানি জমে গেছে। আম্মার তৎণাৎ সিদ্ধান্তে ভাইয়ার হাতটা বেঁচে গেল। এছাড়া নানাবাড়ির সবচেয়ে মজা ছিল কলাগাছের ভেলা বানিয়ে সেটায় চড়ে পুকুরে ভেসে বেড়ানো। নানা কলাগাছ কাটতে দিতেন না বলে হিন্দুবাড়ির কলাগাছ রাতের অন্ধকারে মামারা সহ কেটে ফেলতাম। তারপর ওইটা দিয়ে ভেলা বানাতাম। নানাবাড়ির চারপাশে সব হিন্দুদের বাড়ি ছিল। আরকোনো মুসলমান বাড়ি ছিল না। ফলে গ্রামে গেলে তাদের সঙ্গেই খেলতাম। সারাবছর অপো করতাম ডিসেম্বর মাস এলে খালাতো ভাইবোনরা মিলে গ্রামে যাব। হরেক রকমের পিঠা, পুলি ... উপস৷

- **তারপর?**

- এবার মতিঝিল মডেল হাইস্কুল নিয়ে কিছু বলি। কাস সিক্সে আমি ও বড়ভাই এখানে ভর্তি হই। অনেক বড় স্কুল, অনেক ছাত্র। কাস সিক্সে আমার শাখাটা ছিল মসজিদ ঘরের পাশে। আমার একটু নামাজ-কালামের দিকে ঝোঁক গেল। পড়াশোনাটাও সিরিয়াসলি করতে থাকলাম। আউট বই পড়ার অভ্যাস আগের মতোই রয়ে গেল, খেলাধুলাটাও। সবুজবাগ থেকে স্কুলে যাওয়াআস করতাম কমলাপুর রেলওয়ের স্টেশনের মধ্যে দিয়ে। স্কুলছুটির পর স্টেশনের মাঠে (রেললাইনগুলোর মাঝের ফাঁকা জায়গায়) ফুটবল খেলতাম। কাস সিক্সে পড়াশোনায় বেশ সিরিয়াস হলেও আবাহনী-মোহামেডান ফুটবল ম্যাচের জন্য স্কুল পালিয়ে পরেরদিন প্রচুর মার খেয়েছিলাম। আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন ইয়াকুব আলী। এরকম স্মার্ট কোনো হেডমাস্টার বাংলাদেশের আরকোনো স্কুলে কখনোই ছিল না এ ব্যাপারে আমি ড্যাম শিওর। পাতলা হোয়াইট শার্ট, ঘিয়ে রঙের প্যান্ট পরে, কালো জুতো পরে আরমাথার শাদা চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করে যখন করিডোর ধরে হেঁটে যেতেন, আমরা ভয়ে ভয়ে নাক উঁচিয়ে পারফিউমের গন্ধ শুঁকতাম। তো ওই সিক্সে পড়া অবস্থায় আমার আরো একটা প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গেল।

- **সেটা কিরকম?**

- বাংলা কাসে একবার স্যারের কি মনে হলো আমাদের সবাইকে দিয়ে ‘ দইওয়ালা’ রিডিং পড়ানো শুরু করলেন। কিন্তু সেটা অভিনয় করে পড়তে হবে। আমি অমল চরিত্রটা টেনে টেনে, সুর করে, ঢং করে, অভিনয় করে পড়লাম। স্যার খুশিতে আমার ডায়েরিতে ১০/১০ দিলেন। সেই থেকে অভিনয়ের প্রতি একটা সুপ্ত বাসনা আমার মনে চাড়া দিল।

- **তাহলে আপনি অভিনেতা হলেন না কেন?**

- সেটা অনেক কষ্টের কাজ। তাই ওপথে না গিয়ে এখন অভিনয় করাই সবাইকে।

- **তারপর?**

- কাস সিক্সে ভালো রেজাল্ট করে আমি সপ্তম শ্রেণীতে ক শাখায় চান্স পেলাম। টিফিনে নামাজ পড়ি, ফ্রিসবি খেলি আরস্কুলছুটির পর কমলাপুরে ফুটবল খেলে বাসায় ফিরি। তখন স্কুলে বাইরে থেকে বড় বড় কিছু ছেলে আসত তারা আমাদের বিভিন্ন নবীর জীবনী পড়তে দিত। আমি পড়তাম। এখন বুঝি তারা ছিল শিবিরের হারামি। আমার মগজ ধোলাই হয়ে গেল। আমি পারলে তাহাজ্জুদের নামাজও পড়ি। বাসায় কোরাণ আবার পড়া শুরু করলাম। পাড়ার মসজিদেও জামাতে নামাজ পড়তাম। ছেলেদের দেয়া বিভিন্ন ফর্মে সই করা শুরু করলাম। তবে এতোসব কিছুর পরও আউটবই পড়া কিন্তু ছাড়িনি। সেবা ছাড়িয়ে হুমায়ুন আহমেদ এবং পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের বই হাতে নিতে শুরু করেছি। মাসুদ রানা, ওয়েস্টার্ণ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার পড়াশোনার তি হতে লাগল। বলা যায় আমার আরস্কুলের পড়াশোনা ভালো লাগছিল না। বাসায় ইত্তেফাক রাখা হতো। আমি খেলার খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তাম। সুনীলসহ বিভিন্ন লেখকের মোটা মোটা বইগুলো পড়ে মাথা ঘুরতে লাগল। আল্লাহ, খোদা, সৃষ্টিরহস্য, ধর্ম এগুলো নিয়ে ভাবতাম। আস্তে আস্তে নামাজ পড়া কমতে থাকল। কোরাণ পড়া অর্ধেক এসে থেমে গেল। আমি পরীোয় খারাপ করে অষ্টম শ্রেণীতে গ শাখায় উত্তীর্ণ হলাম।

- **আপনি যেভাবে বললেন আমি ভাবলাম আপনি পরীোয় বুঝি ফেল করলেন।**

- ছাত্র হিসেবে ফেলনা ছিলাম না। আমি শুধু পাসের চেয়ে একটু বেশি নম্বর পেলেই খুশি। টিচাররা বলতেন, লন্ডন, আমেরিকা যাইতে পার, নোয়াখালি গিয়া থাইমা যাও কেন? অষ্টম শ্রেণীতে উঠার পর আমার আরেকটা বাতিক শুরু হলো। বন্ধু রুহুলের পাল্লায় পড়ে বাংলা ছবি দেখা শুরু করলাম। ২০/২৫ টাকা দিয়ে টিকেট কেটে ছবি দেখা খুব কষ্টের ছিল। রুহুল আমাকে সে কষ্ট থেকে মুক্তি দিল। ৮/১০ টাকা দিয়ে স্টলের টিকেট কাটতাম। পরে সুযোগ বুঝে টিকেটচেকারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পিছনের সিটে চলে আসতাম। ভাইজান, দায়ি কে, ছেলে কার, মাড়কশা, বজ্রমুষ্ঠী, গর্জন ... উফফকিসব ছবি। হা হা হা। মুগ্ধ হয়ে দেখতাম। এর আগে আব্বা-আম্মার সঙ্গে ছবি দেখতে যেতাম। মনে আছে সবুজসাথী ছবি দেখে কান্না পেয়েছিল। ছোটবেলায় আংশিক রঙিন ছায়াছবিগুলোর প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। অপো করতাম স্ক্রিণে কখন মারামারি শুরু হবে। বাসায় ফিরে ভাইয়ার সঙ্গে সেগুলো প্র্যাকটিস করতাম। তো রুহুলকে সঙ্গে পাওয়ায় ছবির প্রতি প্রেম আবার জাগল। সঙ্গী হিসেবে পেলাম মুকুল আরদিদারকে। একবার অভিসারে ছবি দেখতে গিয়ে টাকা কম পড়ে গেল। একটা ছেলে এগিয়ে এসে ধার দিল। আরেকবার রাজমনিতে ছবি দেখব, কিন্তু সেই সমস্যা, টাকা কম। ছবি শুরু হওয়ার আগে আগে মুকুল বলল, কি আরকরা। নোটবই কিনব ভেবেছিলাম। থাক, ছবিটা আগে দেখে নিই। বলেই চোরা পকেট থেকে ২০ টাকা বের করে। আমার এই বাংলা ছবি দেখার অভ্যেস লন্ডনে আসার আগপর্যন্তও ছিল। সমালোচকরা যতোই ছবির মান খারাপ বলুক না কেন প্রতি শুক্রবার আমরা বাংলা ছবি দেখতাম। লিমা, সাবিহা, কবিতা, সোনিয়াদের ছবিও মিস হতো না। ফলাফল পরীোয় আরো খারাপ। নবম শ্রেণীতে ঙ শাখায় এই মহারাজার স্থান হলো।

- **এরপর নিশ্চয় বলবেন না যে আপনি এসএসসিতে ফেল করেছেন।**

- তা বলব না। তবে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় একটা খারাপ কাজ করে ফেলি। তখন আমরা কদমতলায় চলে গেছি। ফুটবল খেলি খুব ভালো। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ২/১ জায়গায় ম্যাচ খেলতেও গেছি। সেখানে রিজভী নামে একটা ছেলে থাকত যে কিনা আমাদের স্কুলেই পড়ত৷ আমরা একসঙ্গে স্কুলে আসা যাওয়া করতাম। পাড়ার ফুটবলটা পালা করে সবার বাসাতে থাকত। এই ফুটবল রাখা নিয়েই রিজভীর সঙ্গে আমার ঝগড়া লেগে গেল। আমি ঠিক করলাম রিজভীকে আমি মারব। সেদিন ওর সঙ্গে স্কুলে যাব না বলে দিলাম। কিন্তু বাসায় ফিরে স্কুলড্রেস পরে তক্কে তক্কে থাকলাম। রিজভী স্কুলে যাওয়ার জন্য রাস্তায় নামতেই আমিও তার পিছু নিলাম। কমলাপুর আসতেই আমি রিজভীকে ডেকে এককথা দুইকথায় পকেট থেকে ছুরি বের করে কানের পাশে মেরে দিই। মুহূর্তেই রিজভীর কান বেয়ে রক্ত বের হয়ে শাদা শার্ট লাল হলো। আমি ভয়ে ছুরি ফেলে স্কুলে চলে যাই। পরে রিজভী বিচার দেয়ায় ইয়াকুব স্যার আমাকে জোড়া বেত দিয়ে খুব করে মেরেছিলেন। ওই ঘটনার পর থেকে আমি বোধহয় আরকখনো মারামারি করিনি।

- **মাইগড। খুব ডেয়ারিং কাজ করেছেন তো দেখি।**

- হুম। একদমই ঠিক হয়নি। ওইদিন মাথার ঠিক ছিল না। সেই রিজভী এখন লন্ডনে থাকে। মাঝে মাঝে দেখা হয়। আমরা কেউই অস্বস্তিতে ওই প্রসঙ্গটা তুলি না। রিজভী - তুই যদি এ লেখা পড়িস তবে মাপ করে দে আমাকে।

- **তারপর?**

- নবম শ্রেণীতে সায়েন্স একটু কঠিন লাগায় পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়া শুরু করি। তবে ফুটবলে আরো বেশি মনোযোগ চলে যেত। আমরা বাসা বদল করে মায়াকানন চলে গেলাম। সেখানে জুনিয়র কিছু ছেলেদের সঙ্গে মিলে মৈত্রী সংঘ নামে একটা কাব করলাম। একটা ভাঙা দোকানঘরে লাইব্রেরির কাজ শুরু করলাম। লজেন্স কিনে বিক্রি করতাম। সাইকেল ভাড়া করে চালাতাম। মুগদা ঝিলে গোসল করতাম। এলাকাটা ছিল ডেভেলপিং। নতুন রাস্তা হচ্ছে। আমরা সেখানে মার্বেল খেলতাম। তখন দেখতাম ৭/৮ জন হুজুরটাইপের লোকজন জামাতে ইসলামীর ব্যানার নিয়ে হেঁটে যেতেন। ওই হুজুরগুলোর মধ্যে একজনের বাড়িতে পেয়ারাগাছ ছিল। আমরা পেয়ারা পাড়তে গেলে খুব হইচই করত৷ আমরা তিতিবিরক্ত হয়ে ভাবতাম শালা শান্তিতে একটু চুরিও করতে দেবে না। তাই বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নিলাম ওই হুজুর ব্যাটাকে শায়েস্তা করতে হবে।

- **শায়েস্তা করতে পেরেছিলেন?**

- পেরেছিলাম। নতুন রাস্তা করতে গেলে প্রথমেই একগাদা বালি ফেলা হয়। মায়াকাননের এরকম একটি রাস্তায় মার্বেল খেলতাম। বন্ধুরা মিলে সেই বালির রাস্তা খুঁড়ে ময়লা এনে ভরিয়ে, উপর দিয়ে পাতলা প্লাস্টিক বিছিয়ে, তার উপর হালকা বালি দিয়ে, গর্তটার চারপাশ ঘিরে আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। হুজুর ব্যাটা শাদা জোব্বা পরে যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল আমাদের দেখে সোজা রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকল। এবং কিছুণ পরেই তার একপা ডেবে গেল সেই ময়লা পানির গর্তে৷ আমরা খুশিতে চিৎকার করে দৌড়ে পালিয়ে গেলাম। আপনি এটাকে জামায়াতের প্রতি আমার প্রথম আক্রমণ হিসেবে ভাবতে পারেন। যদিও ওসব কিছু না ভেবেই আমরা কাজটা করেছিলাম।

- **তা না হয় ভেবে নিলাম। কিন্তু আমি খুব বোর হয়ে যাচ্ছি। এতোবড় একটা ছেলেবেলায় আপনার কোনো মেয়েবন্ধুর কথা পেলাম না।**

- কবি এখানেই নিরব। আমি কলেজে উঠার আগপর্যন্ত মেয়েদের সাথে মিশতে লজ্জা পেতাম। আমার মনোযোগ ফুটবল আরগল্পের বইয়ের প্রতি বেশি ছিল। তারপরও মায়াকাননে শম্পা নামে একটা মেয়েকে ভালো

লাগত। সত্যি বলতে কি আমার খুব ঘন ঘন বিভিন্ন মেয়েদের পছন্দ হতো। আমি তাদের নিয়ে নিজের মনেই ভাবতাম। একটাতে স্থির থাকতাম না। নারী-পুরুষের কেমিস্ট্রিটা বোঝার পর আমি আসলে তাদের সামনে যেতে লজ্জাই পেতাম। নারীসংক্রান্ত আমার সমস্ত বাঁদরামি কো-এডুকেশনের কলেজে পড়ার সময় শুরু হয়। যদিও শৃঙ্গার নামে লাল মলাটের একটি মোটা বই আমি নবম শ্রেণীতে থাকা অবস্থায়ই পড়ে ফেলেছিলাম।

- **বুঝেছি। কলেজে পড়ার আগপর্যন্ত আপনি নিজের মনেই ডুবে ডুবে জলখেতেন।**
- কি জানি। যেসব মেয়েদের আমার পছন্দ হতো তাদের তো সরাসরি বলার সাহস রাখতাম না। বন্ধুদের অনেকেই তখন দুয়েকটা প্রেমট্রেম করে। তাদের নিয়ে গল্পও করে। স্কুলের বন্ধুরা তো আরো অনেক ভয়ানক গল্প করত। আরমেয়েদের কাছে গেলে যে আমি পাত্তা পাব সেই আত্মবিশ্বাসও ছিল না। স্কুলজীবনে আমার চেহারা একদমই বাচ্চা বাচ্চা টাইপের ছিল। তাই ডুবে ডুবে জল খেতাম অর্থাৎ আমার ভাবনাতেই আমি মেয়েদের সঙ্গে প্রেমট্রেম যা কিছু করার করতাম। ও হ্যা, ডুবে ডুবে জলখাবার কথা যখন বললেন তখন একটা ঘটনা বলি।

- **এইতো মুখ খুলতে শুরু করলেন। বলুন বলুন ...**
- আরে না, এটা মেয়েসংক্রান্ত কিছু না। আমি একবার পুকুরে ডুবে গিয়েছিলাম, সেই ঘটনা।

- **তাই নাকি। বলুন তো।**
- মায়াকাননে একটা পুকুরে আমরা দুইভাই গোসল করতাম প্রায়ই। সাঁতার পুরোপুরি পারতাম না। সেজন্য খালি গ্যালন পেটের নিচে নিয়ে দুইহাত বৈঠার মতোন বেয়ে বেয়ে মাঝপুকুরে চলে যেতাম। মাঝে মাঝে গ্যালন ছেড়ে দিয়ে সাঁতারের চেষ্টা করতাম। না পেরে হাচড়ে পাচড়ে আবার গ্যালন ধরে ভেসে থাকতাম। ওইদিন দুপুরবেলায় মাঝপুকুরে এমন করছি হঠাৎই হাতের ধাক্কায় গ্যালন দূরে সরে গেল। আমি যতোই আঁকড়ে ধরতে চাই, গ্যালন ততোই দূরে সরে যায়। একপর্যায়ে হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল। পুকুরে তখন আমি একা ছিলাম। আমি চিৎকার করে ভাইয়াকে ডাকি। ভাইয়া অল্পবিস্তর সাঁতার পারত। তারপরও আরেকটা গ্যালনটা নিয়ে সাঁতরে আমার কাছাকাছি আসে। আমাকে জাপটে ধরতে গেলে আমিও ভাইয়াকে জাপটে ধরি। ঢেউয়ের ধাক্কায় ওই গ্যালনটাও দূরে সরে যায়। ভাইয়া কোনোমতেই আমাকে ধরে রাখতে পারে না। জাপটাজাপটিতে দুইজনই ডুবতে থাকি। ভাইয়া আমাকে ছেড়ে দিয়ে জাফরকে চিৎকার করে ডাকতে থাকে। ও-ও আমাদের সঙ্গে পুকুরে ছিল। কিছুণ আগে উঠে সে একটু দূরে রোদে দাঁড়িয়েছিল। জাফর সম্পর্কে একটু বলে নিই। কিছুদিন হয় বাবা-মার সঙ্গে গ্রাম থেকে শহরে এসে স্যাটেল হয়েছে। আমাদের চেয়ে দ্রুত গাছ বাইতে পারে, একঢিলে আমপাড়তে পারে এবং মারাত্মক ডুবসাঁতার দিতে পারে। এগুলো আমাদের জন্য কোনো ব্যাপার না, কিন্তু ওকে হিংসার করার প্রধান কারণ হলো, ওর একটা টিউব ছিল। ও প্রায়ই মাঝপুকুরে সেই টিউব ফুলিয়ে তাতে চড়ে ভাসত। যাহোক, এদিকে আমি ডুবে যেতে থাকি, পানি খেতে থাকি, এবং ততোণে লাল-নীল-সবুজ অনেক রঙ দেখে ফেলেছি। এর পরের ঘটনা আমার ভাইয়ার মুখে শোনা। ভাইয়ার চিৎকার শুনে জাফর মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝে ফেলে। প্রথমেই সে টিউবটা ছুড়ে মারে পুকুরে। তারপর নিজে ডাইভ দিয়ে ডুব সাঁতার দিয়ে পুরা মাছের মতো সাঁতরে ১ মিনিটেই আমার কাছে চলে আসে। পানির নিচে আমার জ্ঞান তখনো আছে। আমি অনুভব করতে পারি আমার চুল ধরে কেউ একজনটেনে তুলছে। জাফর আমাকে পানির উপর টেনে টিউবের উপর তুলে দিল। বলতে পারেন এখন আমি দ্বিতীয় জীবন কাটাচ্ছি।

- **আপনার মা জানতেন বিষয়টা?**
- মাথা খারাপ। আমরা দুইভাই কেউই বিষয়টা বলিনি। বললে পানির তলে না, আম্মার হাতের তলেই বোধহয় মারা যেতাম। তবে আব্বা একবার আমার দস্যিপনা দেখেছিলেন।

- **কি করেছিলেন আপনি ?**

- নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থান চলছে তখন। আমি কাস টেনে পড়ি। আমার কাছে সেটা মুক্তিযুদ্ধ। সবুজবাগ বৌদ্ধমন্দিরের সামনের অতীশ দীপংকর সড়কে তখন আমরা ব্যারিকেড ব্যারিকেড খেলি। আর্মির জিপ এলেই ইঁদুরের মতো চিঁ চিঁ দৌড়ে গলিঘুপচিতে আত্মগোপন করি। থাকি কিন্তু তখনো মায়াকাননে। রেললাইনের কাঠের স্লিপার তুলে এনে পাড়ার বড়ভাইদের নির্দেশমতো রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে দিই। আগুনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করি। কনস্ট্রাকশনওয়ালা বিল্ডিং থেকে ঢালাইয়ের তক্তা খুলে সেটার পেরেকগুলো সোজা করি রাস্তায় শুইয়ে রাখি। ওপরে মাটি বা কিছু একটা বিছিয়ে দিই। উদ্দেশ্য হলো আর্মির গাড়ি এলে যেন টায়ার পাংচার হয়ে যায়। টায়ার জ্বালিয়ে দিই। সে এক ধুন্ধুমার কান্ড। একদিন মায়াকাননের সামনের রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছিলাম হঠাৎ আর্মির একটা জিপ দ্রুত চলে আসে কাছাকাছি। আমি দৌড়ে রাস্তার পাশে মেসবাড়িতে ঢুকে পড়ি। কারো একজনের রুমে ঢুকে আত্মগোপন করতে যাচ্ছি এমন সময় সবাই আমাকে ঠেলে বের করে দিতে চাইছে। আমি অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞেস করি। যেটা জানা গেল তা হলো, আমরা সারাদিন ধরে যেসব ব্যারিকেড দিই, ভোররাতে এসে আর্মিরা এই মেসবাড়ির লোকদের তুলে সেগুলো পরিষ্কার করায়। তাই তারা আন্দোলনকারীদের প্রতি তিতিবিরক্ত। আমাকে ঠেলে মেসবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হলো। বেরিয়েই একটা জলপাইয়ের সামনে পড়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেই উল্টোপথে দৌড় দিই। আড়চোখে দেখি জলপাই বন্দুক তাক করেছে আমার দিকে। আমি আরো জোরে দৌড়ে ঝিলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। তখন মনে হচ্ছিল এই বুঝি গুলি এসে আমার পিঠে লাগল। অল্পজানা সাঁতার আরহাঁচড়ে পাঁচড়ে কোনোমতে কবরস্থান দিয়ে বাসার দিকে যাচ্ছি দেখি আব্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি এমনভাব করলাম যেন হাঁটতে গিয়ে পা পিছলে ঝিলে পড়ে গেছিলাম।

- **কিন্তু গুলি তো খেলেন না।**
- খেলে কি আর এই ইন্টারভিউ দিতে পারতাম? অভ্যুত্থানের প্রায় শেষের দিকের দিন ছিল তখন। জলপাইরাও মানুষ মেরে কান্ত হয়ে গেছিল। ওই জলপাইটা বন্দুক তুলেছিল অথচ গুলি কেন তুলেছিল জানি না। তবে আমার বড়ভাই ছিড়া গুলি না কিসব বলে ওগুলো খেয়েছিল। তার পিঠ মোটামুটি ঝাঝড়া হয়ে গেছিল। আরো একটা ঘটনা ঘটেছিল নব্বইয়ের অভ্যুত্থানের সময়।

- **কি সেটা?**
- তখন পাড়ার ভিডিও দোকানগুলোতে ভিডিও গেমস খেলার চল ছিল। এরকম কারফিউর সময় আমি এক বন্ধুর সঙ্গে দোকানে গেম খেলছিলাম। রব উঠল, আর্মি আইতাছে। সাথে সাথে শাটার ফেলা দেয়া হলো দোকানের। কিন্তু আর্মি ঠিকই বুঝে ফেলল দোকানটা খোলা ছিল। বাইরে থেকে শাটার তোলার আওয়াজ আসতেই আমি ডেস্কের তলে লুকিয়ে পড়ি। আর্মি সবাইকে বের করে নিল। আমার ভাগ্য ভালো ডেস্কের তলে চেক করেনি। আমার বন্ধুকেও বের করে নিল। তারপর তারা দোকানের তালা মেরে দিল। আমরা ভিতরে বসে শুনতে পাচ্ছি আর্মিদের হুংকার আর বাকি সবার আর্তচিৎকার। আমার কলিজা হিম হয়ে গেল। শালা ছুটির ঘন্টা আমার জীবনে ঘটে গেল? এভাবে ঘন্টা তিনেক কাটল। তারপর হঠাৎ বাইরে থেকে আমার বন্ধুর গলার আওয়াজ শুনি। আর্মিরা তাকে বের করতেই সে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পরে এই বন্ধুই ভিডিও দোকানের মালিকের কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে এসে আমাকে মুক্ত করেছিল।

- **তারপর?**
- এইতো। প্রিটেস্টে এক সাবজেক্টে ফেল করলাম। ভাবলাম পড়াশোনা সিরিয়াসলি করতে হবে। সেইসময়ে বাবা সরকারি কোয়ার্টার পেলেন আজিমপুরে। ই টাইপ-অনেক বড় বাসা। ৩/৪ টা রুম, বারান্দা। আম্মা খুব খুশি হলেও আমরা হলাম না। আজিমপুর যেতে ইচ্ছে হলো না। বাবার সরলতার কারণে ও সরকারি দীর্ঘসূত্রিতার কারণে একসময় খবর পেলাম ওই বাসা আব্বারই আরেক কলিগ নিজের নামে এলোকেশন করে নিয়েছেন। আব্বার

যেন একটু আত্মসম্মানে লাগল। আমার অতিশান্ত আব্বাজান একটু খেপে গেলেন। বিভিন্ন সরকারি পর্যায়ে লেখালেখি করে কোয়ার্টার আদায় করলেন। কিন্তু আজিমপুরে নয়, মতিঝিলে। বড় বাসা নয়, এফ টাইপের ২ রুমের বাসা। আমরা সেই বাসায় উঠে গেলাম। আম্মার জন্যও সুবিধা হলো। কেননা আম্মা তখন রাজনীতি শুরু করেছেন। মতিঝিল থেকে সবুজবাগ যেতে তার কষ্ট তেমন হবে না।

- **আপনার আম্মা রাজনীতি করতেন?**

- আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতেন সবুজবাগ এলাকায়। বর্তমানে মতিঝিল থানা মহিলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি। সেইসময় আম্মার রাজনৈতিক বক্তব্যগুলো আমি লিখে দিতাম। এতোণ তো আমার ছেলেবেলার অনেক কথাই শুনলেন। প্রায়ই আম্মার প্রসঙ্গ এসেছে। আমি আম্মা সম্পর্কে আরো একটু বলতে চাই।

- **অবশ্যই। আপনি বলুন।**

- আমার আম্মা ছিলেন নানার ছোটমেয়ে। খুবই দস্যি ছিলেন তিনি। হিন্দুবাড়ির মন্দির থেকে আম্ কলা চুরি করা থেকে শুরু করে গাছগাছালির নামকরণ সবই করতেন তিনি। আমার বড়খালা বিয়ের পর থেকে ঢাকায় থাকতেন। সেই খালার কাছে আম্মা বিয়ের পূর্বে মাঝে মাঝে এসে থাকতেন। তখন থেকেই তার স্বপ্ন ছিল তিনিও বিয়ের পর ঢাকায় এসে সেটল হবেন। আম্মার যখন বিয়ে হলো তখন বেশ কিছুদিন দাদাবাড়িতে ছিলেন। আব্বা ঢাকায় চাকরি করতেন, ছুটিছাটায় গ্রামে যেতেন। তখন আম্মা বারবার আব্বাকে তাগাদা দিতেন ঢাকায় নিয়ে যাবার জন্য। অবশেষে বিয়ের কিছুদিন পরেই আব্বা আম্মাকে ঢাকায় নিয়ে এলেন। তখন দাদাবাড়ির অনেকেই ফোড়ন কেটেছিল, হিতি ঢাহায় কিল্লাই যাইত, আন্ডা বেক বুঝি। বাইস্কোপ চাইত আরঘুরি বেড়াইত আরি। আন্ডা হোলাহাইন কি গ্রামে থাই মানুষ অয় ন? সবকিছুকে তুচ্ছজ্ঞান আম্মা ঢাকায় এলেন। আমার মনে আছে, ছোট দুই শিশুকে কোলে নিয়ে তিনি স্কুলে যেতেন। আমি একেবারেই হাঁটতে চাইতাম না। বারবার বলতাম, আম্মা রিক্সায় চড়ব। তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। আম্মা বলতেন, রিক্সা কেন? বাবা তুমি গাড়িতে চড়। এরচেয়ে দামি গাড়ি আরনেই। বলেই মা আমাকে কোলে নিয়ে নিতেন। বড়ভাই মাঝে মাঝে ঘ্যান ঘ্যান করত। মা তখন দুইজনকে কোলে নিতেন। রাস্তা দিয়ে একজন মহিলা দুইশিশুকে কোলে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, হয়তো পথচারীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। গোপীবাগ এলাকায় প্রায়ই মারামারি হতো। স্কুল ছুটি হয়েছে, পথিমধ্যে মারামারি শুরু হয়ে গেল, আম্মা আমাদের কোলে নিয়ে দৌড়ে বাসায় ফিরতেন। হয়তো তখন শাড়িতে পা জড়িয়ে গেছে, হোঁচটও খেয়েছেন অনেক, কিন্তু আমরা টের পেতাম না। আব্বা ছিলেন উন্নাসিক, সম্পূর্ণ অবৈষয়িক একজনমানুষ। মাঝে একবার আমাদের তিনমাসের জন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আম্মা সেখানে থেকে আবার ঢাকায় ফিরে আসেন। তার প্রচন্ড ইচ্ছা ছিল আমাদের ঢাকায় মানুষ করবে, ভালো স্কুলে পড়াবে। আম্মা তিলতিল করে পয়সা জমিয়ে আমাদের সংসারে সুখ এনেছেন। আমাদের প্রয়োজনে যেরকম শাসন করেছেন, মেরেছেন তেমনি আদরসোহাগও করেছেন। আমার আম্মা হলেন পৃথিবীর সেরা রাঁধুনি। তিনি পারেন না এমন কিছুই নেই। কি সেটা মিষ্টি, দই অথবা ঝাল অন্য কিছু। আতিথেয়তায় কখনো তার কার্পণ্য দেখিনি। আজগাড়ি-বাড়ির মালিক হয়েছি, বড়াই করার মতো অনেক উপাদান হাতের কাছে আছে, সবকিছুই আমার আম্মার কারণে। আমি ছোটবেলায় যতোই দুষ্টুমি করি না কেন কখনোই আম্মাকে জানাতে চাইনি। আমার স্বর্ণালী ছোটবেলা

পুরোটাই তার হাতে তৈরি। লজ্জা পেতাম বলে আম্মাকে বলতাম, তুমি আমাদের সঙ্গে আরস্কুলে যাবা না। আমরা তো বড় হয়ে গেছি। সেই মা এসএসসি পরীোর সময় আমাদের নিজে পরীোকেন্দ্রে দিয়ে এসেছেন। আমরা তখন না করতে পারিনি। দাদাবাড়িতে গেলে সবাই বলত মাস্টরের ছেলে। আর নানাবাড়িতে গেলে আমরা হয়ে যেতাম নাসিমের ছেলে। ওইটাই তখন বড় পরিচয় হয়ে যেত আমাদের। একরুমের সাবলেট থেকে তিনি তার সংসার শুরু করেছেন। মনে আছে, আইসক্রিম খাবার বায়না করতাম ঘনঘন। আম্মা কিস্তিতে ফ্রিজ কিনে ফেললেন। আমাদের আইসক্রিম বানিয়ে খাওয়াতেন। ফেনী অঞ্চলের লোকজন মধ্যপ্রাচ্যে জীবিকার উদ্দেশ্যে যাওয়া আসা বেশি করেন। আম্মা নাক সিঁটকে বলতেন, ধুর। আমার ছেলেরা লন্ডন আমেরিকা যাইব। এই লন্ডনে বসেই যখন আমার ছেলেবেলা লিখছি তখন শুধু আম্মার কথাই মনে পড়ছে। আম্মা আমাকে ভালো বুঝতেন। আমার যাবতীয় সৃষ্টিশীল কাজে তিনিই প্রথম উৎসাহ দিয়েছেন। কঠিন শাসন আরকোমল সোহাগে তিনি গড়ে দিয়েছেন আমার স্বর্ণালী ছেলেবেলা ... স্যরি, আমি বেশি আবেগী হয়ে গেলাম হঠাৎ করে।

- **না না ঠিক আছে। আপনি বলতে থাকুন।**
- আর কিছু বলার নেই। আমার মনে হয় আমার ছেলেবেলার কথা বলা শেষ। এসএসসি পাশ করার পরপরই ছেলেবেলা শেষ হয়ে বলেই আমার ধারণা। আমি স্টারমার্ক আরভাইয়া প্রথম শ্রেণীতে এসএসসি পাস করি। আমরা দুইভাইয়ের একসঙ্গে পড়াশোনাও সেখানে শেষ হয়ে যায়। দুইজনে ভিন্নভিন্ন কলেজে ভর্তি হই। ঘর ছেড়ে বাহিরপানে টান বেড়ে যায় বেশি। ছোটবেলার চেয়ে আমি আরো দুরন্ত হয়ে উঠি এসএসসি পাশ করার পর।

- **কি বলছেন। এতোন ছেলেবেলা শুনে তো মনে হলো আপনি তখনও কম দুরন্ত ছিলেন না।**
- সেটা মনে হতে পারে। কিন্তু আমি দুষ্টুমি করলেও কাস টেন পর্যন্ত অতো বেয়াড়া ছিলাম না। আমি বাসায় আম্মাকে সাহায্য করতাম। আপনি অবাক হবেন আম্মার কাছ থেকে দেখে দেখে আমি বাটিক কিংবা টাইডাইয়ের কাজ পারতাম। আম্মা কেটে রাখলে সেলাই মেশিনে আমি ব্লাউজও সেলাই করতে পারতাম। বাসায় মেহমান এলে আমি চা বানিয়ে খাওয়াতাম। সেই আমি লন্ডনে আড়াই বছর ধরে আছি, অথচ এখনো রাঁধতে পারি না। আমি ছোটবেলায় গোছানোই ছিলাম বেশ। তবে দুষ্টুমি যা যা করতাম সেটা কেউ বুঝতে পারত না। বলতে পারেন মিচকা শয়তান ছিলাম। খালাতো ভাই কল্যাণ মিলে খুব দুষ্টুমি করতাম। গোড়ানে জাকের পার্টির মাহফিল থেকে স্যান্ডেল চুরি করা অথবা ঈদের দিন শিশুপার্কে ছেড়া টিকেট দিয়ে রাইড চড়া এসব ফাজলামো করতাম। এইতো ...

- **না না। এতো তাড়াতাড়ি শেষ করলে তো হবে না।**
- শেষ তো করতেই হবে। আচ্ছা তবে দুটো ঘটনা বলে নিই। ঘটনাগুলো করুণ কিংবা মজার কিংবা ভয়াবহ কিংবা গুরুতর। প্রথমটা হলো, আমি একবার ম্যানহোলে পড়ে গিয়েছিলাম।

- **হা হা হা। তাই নাকি? খুলে বলুন।**
- আমার খেয়াল নেই। হয়তো এসএসসির আগে আগেই ঘটনাটা ঘটেছিল। আমি ও বন্ধু পারেক হেঁটে যাচ্ছি। তখন প্রায় ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি হয়ে যেত। হাঁটতে হাঁটতে আমি সেটা খেয়াল করেছিলাম। ম্যানহোলের কাছাকাছি আসতেই আমি সেটা টপকে যেতে একটা ছোট লাফ দেই। কিন্তু মাপে ভুল হয়ে যাওয়ায় আমার এক পা ম্যানহোলে ঢুকে যেতেই আমি ব্যালেন্স করার চেষ্টা করি। কিন্তু সামলাতে না পেরে আমার দুইপা ম্যানহোলের ভিতর চলে যায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে দুইহাত দুইদিকে ছড়িয়ে নিজেকে ঠেকাই। পরে বন্ধু পারেক আমাকে উঠায়। হোসপাইপ দিয়ে পানি ছিটিয়ে আমার শরীর থেকে সমস্ত বিষ্ঠা সরানো হয়। আমি সেদিন দুইটা লাক্স সাবান গায়ে ঘষে শেষ করেছিলাম।

- **স্যরি, আমি ঘটনা শুনে বেশ মজাই পেলাম। তার মানে, পরের ঘটনাটা নিশ্চয়ই ভয়াবহ।**
- বলা যেতে পারে।

- **কি সেটা?**
- আমি একবার গণপিটুনী খেয়েছিলাম।

- **মাইগড। বলেন কি? কারো পকেট মেরেছিলেন নাকি?**
- না, সেই মারামারি।

- **খুলে বলুন তাড়াতাড়ি।**
- তখন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। কলোনিতে থাকি। সেসময় সিনিয়রিটি জুনিয়রিটি নিয়ে গ্র“পে গ্র“পে মারামারি হতো। বন্ধুবান্ধবের কেউ কেউ তখন সো-কলড রংবাজ কিংবা মাস্তান। আমি এসবের ধারেকাছেও ছিলাম না। তারপরও পাকে জড়িয়ে যাই। সবুজবাগের একটা জুনিয়র ছেলে বেয়াদবি করেছে, জাস্ট মুখে একটু সাবধান করে দেয়া হবে। যেহেতু ওই ছেলের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক, তাই তার বাসা থেকে আমাকে ডেকে দিতে হবে। আমি সেই কাজটা করে দিই। কিন্তু সেদিন বোঝানোর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে একটু রগড়ে দেয়াও হয়। ঘটনার কয়েকদিন পর আমি সবুজবাগে গেলে ওই ছেলের কয়েকজন বন্ধু আমাকে ঘেরাও করে। ওই ছেলেকে মারার কারণ জানতে চাই। ছেলেগুলো জুনিয়র হয়ে আমাকে চার্জ করছে বলে আমার মেজাজ খিচড়ে যায়। আমি প্রচন্ড গালিগালাজ করি। একাই চিৎকার চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় তুলি। এই সবুজবাগে আমি এতোদিন থেকে গেছি, কে কি করবে আমার। ছেলেগুলো আমার তিড়িংবিড়িং দেখে চলে যায়, আমি বৌদ্ধমন্দিরে আমার বন্ধুদের কাছে যাই। ঘন্টাখানেক পরে বেরোতেই দেখি সামনে অপরিচিত পাঁচজন ছেলে। বলা নেই কওয়া নেই, ঠাস করে একটা চটকনা মেরে বলল, রংবাজি চোদাও। অই তুই থাকস কই? যে ছেলেটা প্রথম হিট করল আমাকে তার চেহারাটা চিনে রাখি। পাঁচজনের সঙ্গে আমার হাতাহাতি লেগে যায়। ওইদিন কমলাপুর স্কুলের এসএসসি পরী◌োর্থীদের ফেয়ারওয়েল ছিল। আমি তাকিয়ে দেখি প্রায় ৫০/৬০ জনের একটা গ্র“প ঢেউয়ের মতো বড় রাস্তার ঢাল বেয়ে বৌদ্ধমন্দিরের দিকে আসছে। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে ইট। আমি সাবধান হয়ে যাই। হাতাহাতি বন্ধ করে শরীর ঢিলা করে দেই। এবার আরআঘাত নয়, আত্মরা। আমি অন্যদের হাত-পায়ের মাইর ঠেকানোর চেষ্টা করি না। সমানে কিল-ঘুষি-লাথি-চড় খেয়ে চলছি। কিন্তু খেয়াল রাখছি কেউ আমাকে লাঠি কিংবা চেইন কিংবা ইট কিংবা অন্যকিছু দিয়ে মারে কিনা। আমি শুধু ওইগুলোই ঠেকিয়ে যাচ্ছি। শরীরের মাইর শরীর সইবে। কিন্তু অন্যকিছুর বেকায়দা আঘাত আমার জীবন শেষ করে দিতে পারে। আমার কুংফুজ্ঞান (আত্মরার কৌশল) এদিন কাজে লেগেছিল। প্রায় ১৫ মিনিট চলল এই অবস্থা। এরমধ্যে পরিচিতি সিনিয়র ভাইয়েরা এসে আমাকে ওই অবস্থা থেকে উদ্ধার করে কমলাপুর স্টেশন পর্যন্ত দিয়ে আসে। কিন্তু আমি আর সেই পাচজন ছেলেকে দেখিনি।

- **ঘটনা তো বেশ সিরিয়াস। মুরুব্বিদের দোয়ায় আপনি তো বেঁচে ফিরেছেন।**
- তা বলা যায়। পরে এই ঘটনা নিয়ে মারামারি-পাল্টা মারামারি হয়েছিল। যে ছেলেটা আমাকে প্রথম মেরেছিল তাকে আমি রেলওয়ে হাসপাতালে একদিন পেয়ে যাই। সেদিন তাকে মেরেছিলাম। ওই ছেলেদের ছোটভাইয়েরা এসএসসি পরী◌া দেবে। কেন্দ্র ছিল টিএন্ডটি কলেজ। ঘোষণা দেই একটারেও পরী◌া দিতে দিব না। পরে পাড়◌ার কমিশনারকে নিয়ে এসে আমাদের কাছে মাপ চেয়ে যায়।

- **যাক, ভবিষ্যতে এরকম ঘটনার সম্মুখীন হবেন না আশা করি।**
- তা আরবলতে। এখন আমি অনেকটাই কুল ম্যান ... হা হা হা ...

- **অনেক ধন্যাবাদ অলৌকিক হাসান। আপনার মজাদার ও স্বর্ণালী ছেলেবেলা আমাদের বলার জন্য।**

- আপনাকেও ধন্যবাদ। সেইসঙ্গে সচলায়তনকে ধন্যাবাদ। নিজের ছেলেবেলা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। সম্পাদক আরিফ জেবতিককে ধন্যবাদ উদ্যোগের জন্য। আর সকল ব্লগার কিংবা পাঠকদেরও শুভেচ্ছা। ভালো থাকবেন সবাই।

*(এটি একটি কল্পিত সাক্ষাতকার। এবং সম্পূর্ণ লেখাটি আমার প্রিয় মা কে উৎসর্গ করা হলো)*

# আমার ছেলেবেলার জ্বিনগুলি

**আনোয়ার সাদাত শিমুল**

---

শৈশব মানে গল্প শোনার দিন। আমার গল্প শোনা শুরু হয়েছিল - জ্বিন পরী ও ভূত প্রেতের কাহিনী ঘিরে। সকালে দলবেধে মক্তবে যেতাম আরবী পড়তে। মাটির দালানে ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে ভীষণ আগ্রহে আরবী পড়া। প্রথমে কায়দা, তারপর সিরফা, সবশেষে কোরআন শরীফ। বইগুলো বাড়ী আনতাম না। মক্তব ঘরের বইয়ের তাকে রেখে আসতাম। আমাদের প্রবল বিশ্বাস - রাতের বেলা 'উনারা' (নাম মুখে নেয়া বারণ!) ইবাদতে আসেন মক্তব ঘরে, আমাদের রেখে যাওয়া বইগুলো পড়েন। কোনোদিন আমার কায়দা 'উনাদের' নজরে পড়তো না বলে ভীষণ মন খারাপ করতাম। ওদিকে বাবু-আরিফ-শহীদরা খুশি। কারণ, তাদের কায়দার পাতার ভাঁজে রাখা ময়ুরের পালক ঠিক জায়গায় নেই। দশ নম্বর পাতা থেকে আঠারো নম্বর পাতায় চলে গেছে। সকালের আলো ফোটার সাথে সাথে নিশ্চয় 'উনারা' তাড়াহুড়া করে ময়ুরের পালক ভুল পাতায় রেখে চলে গেছেন!

আমাদের বন্ধুদের মাঝে চলতো গল্প বিনিময়। মোটামুটি সবাই জ্বিন দেখে ফেলেছে, আমি বাকি। অনেক চেষ্টা করেও জ্বিন দেখি না। একদিন শুক্রবারে গেলাম মক্তব ঘরের কাছে, সাহস করে জানালায় তাকাতেই দেখি কালো বিশাল কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে। চারকোণা মাথা, কালো স্বচ্ছ শরীর। এপাশ থেকে ওপাশে দেখা যাচ্ছে। আমি ভয়ে দিলাম দৌড়। আমার দৌড় দেখে মক্তবের সামনে ঘাস খাওয়া ছাগলটা তেড়ে আসলো আমার দিকে। এবার আমি জান-প্রাণ নিয়ে দৌড়। পরদিন গল্পের আসরে জ্বিনের দাঁতগুলো অনেক বড় বড় হয়ে গিয়েছিলো, আরআমি রাস্তা পার হয়েছিলাম ঐ ছাগলের পিঠে ভর করে!

স্কুলে যাওয়ার পথে ছিল বড়সড় বাঁশ ঝাড়। তার পাশে বিশাল একতাল গাছ। ছোট্ট শরীরের উপর ভর করে মাথা তুলে উপরে তাকিয়ে নিমিষেই গুনে দেখেছি - একশ হাতের চেয়েও লম্বা ঐ তাল গাছ। বাতাস বইলেই বাঁশ ঝাড়ে একঅদ্ভুত শোঁ শোঁ শব্দ হতো। মনে হতো বাতাস ভেদ করে কেউ যেন ধেয়ে আসছে। অসংখ্য দিন মোড়ে এসে দাড়িয়ে ছিলাম কারো সংগী হবো বলে, একা একা ঐ রাস্তা পার হতাম না ভয়ে। একদিন স্কুলে যাওয়ার সংগী কেউ নেই। ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বসে আছি। একটাই ভয়, পথের ঐ তাল গাছ। হঠাৎ ছোটো কাকা পরামর্শ দিলো - যাওয়ার পথে তালগাছের দিকে তাকিয়ে 'স্লামালাইকুম জ্বিন মামা' বলে গেলে কোনো সমস্যা হবে না। দুরুদুরু বুক নিয়ে রওনা দিলাম। তালগাছের কাছে আসতেই সেই বাঁশ ঝাড়ের বাতাস, সাথে আচমকা উপর থেকে কোন গাছের ডাল যেন ভেঙে পড়লো। আমি চিৎকার করে সালাম দিয়েই দৌড়। তবুও বিশ্বাস জন্মে - সালাম দেওয়ায় সেদিন জ্বিনটা আমাকে মাফ করে দিয়েছে, নইলে তো ঘাঁড় ধরে একটানে এক্কেবারে তাল গাছের উপরে নিয়ে যেতো! এরপর বন্ধুরা একসাথে আসা যাওয়ার পথে আস্তে করে বিনয় নিয়ে তালগাছকে সালাম দিই। ঐ তাল গাছ এবং তালগাছের বাসিন্দা জ্বিন মামারা প্রায়ই আমাদের কোমলমতি স্বপ্নে এসে দেখা দিতো। যারা সালাম দিতে ভুলে যেতো, ওরা রাতে স্বপ্ন দেখতো সাদা পাঞ্জাবী পড়া, লম্বা দাঁড়ির কেউ একজনভয় দেখাচ্ছে! একবার বাংলা পরীক্ষার দিন আমি জ্বিন মামাদের সালাম দিতে ভুলে গেলাম, সেজন্যই বানান ভুল করে নম্বর কম পেলাম!

পাশের বাড়ীর ইরান কাকা আসতেন আমাদের অংক শেখাতে। বিশাল বিশাল গুন অংক, তিরিশ হাজার তিনশ তিরিশকে তিন হাজার তিনশ তিরিশ দিয়ে গুন করলে কতো হয়! এরকম অংক, ভুল হলে আরো বড় অংক দেয়া হতো। একবার ইরান কাকা একটানা তিনদিন আসলেন না।

পরে আমরা জিজ্ঞেস করলাম - কোথায় গিয়েছিলেন?
ইরান কাকা বললেন - 'রোকাম শহরে'।
রোকাম শহর? এটা আবার কোথায়?
উত্তরে যা শুনলাম! শুনে আমাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠে।
রোকাম শহর হলো জ্বিনেদের শহর। ওখানে কেবল জ্বিন-পরীরা থাকে।
শুনলাম, ইরান কাকাকে নাকি একবার জ্বিনেরা তুলে নিয়েছিল। তখন তিনি কলেজে পড়তেন। একদিন রাত জেগে পড়ছেন। হঠাৎ দরজায় টোকা। ভাবলেন - বন্ধু বান্ধব কেউ হবে। দরজা খুলতেই দেখেন, দুইজন হুজুর দাড়িয়ে। হাতে মিষ্টির বাটি। ইরান কাকার মাথায় ফুঁ দিয়ে এক হুজুর বললো - 'অনেক রাত জেগে পড়ালেখা করিস, নে মিষ্টি খা। ' মিষ্টির ঘ্রাণ নাকি এতোই মোহনীয় ছিল, ইরান কাকা নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। একটি মিষ্টি মুখে দেয়ার পর আরকি হলো মনে নেই। ঘুম ভেঙে দেখেন বিশাল একখাটে উনি শুয়ে আছেন। চারপাশে জ্বিনেরা দাড়িয়ে আছে। কেউ বিশাল পাখা দিয়ে বাতাস করছে। উনি তখন রোকাম শহরে। তারপর জ্বিনের রাজা দেখা করতে এলো। বললো - ইরান কাকাকে রোকাম শহরে থেকে যেতে হবে। বাচ্চা জ্বিনদের জন্য নতুন স্কুল খোলা হয়েছে। সেখানে অংক মাস্টারের অভাব। তাই পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে অংকের মাস্টার জোগাড় করা হচ্ছে। ইরান কাকার নাম ওদের লিস্টে গেছে। ইরান কাকা রাজী হলেন না, কান্নাকাটি শুরু করলেন। জ্বিনরা অনেক সুন্দর সুন্দর শার্ট উপহার দিলো, দারুণ দারুণ মজাদার সব খাবার। এরপরও ইরান কাকা বললেন - 'আমি রোকাম শহরে থাকবো না, আমাকে বাড়ী দিয়ে আসো। ' শেষে জ্বিনেরা রাগ করে তাকে একঘরে বন্দী করে রাখলো। খাওয়া দাওরা বন্ধ। এদিকে ইরান কাকার বাবা-মা কান্নাকাটি করে অস্থির। সাত-পাহাড়ের পীর আনা হলো। তিন দিনের মাথায় পীর খুঁজে পেলো - ইরান কাকা রোকাম শহরে বন্দী। চেষ্টা তদবীর করে জ্বিন রাজার সাথে বৈঠক বসানো হলো। অনেক বুঝিয়ে দেন-দরবার করে ইরান কাকাকে ফিরিয়ে আনা হলো। এরপরও জ্বিনেরা ইরান কাকার পিঁছু ছাড়লো না। মাঝে মাঝে রোকাম শহরের ঐ স্কুলে যেতে হয় বার্ষিক পরীক্ষার সময়!

তখন ক্লাস থ্রি-তে পড়ি। একদিন হঠাৎ করে আমাদের ক্লাসের শাহাবুদ্দিনকে জ্বিনে ধরলো। ক্লাসের মাঝে হো হো হাসি দিয়ে সবাইকে ভয় পাইয়ে দিলো। একে ভয় দেখায়, ওকে ভয় দেখায়। আমরা কেউ ওর পাশে বসি না। শাহাবুদ্দিন একা একা কথা বলে, গান গায়, হাসে। হুজুর স্যার এসে শাহাবুদ্দিনের মাথায় দোয়া-দুরুদ পড়ে ফু দিলেন। শাহাবুদ্দিন স্যারের দিকে বড় বড় চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকলো। হুজুর স্যার অফিসে গিয়ে বললেন, খুব খারাপ জিনিস ভর করেছে। এটা আবার আমাদের তাজুল ইসলাম শুনে ফেললো। আমাদের সবার কানে কানে খবর হলো - খুব খারাপ জিনিস ভর করেছে। শাহাবুদ্দিনের বাড়ীতে খবর পাঠানো হলে তার বাবা-মা এসে নিয়ে গেলো। এরপর আমাদের মাঝে শাহাবুদ্দিনকে নিয়ে নানান গল্প হয়। কেউ কেউ বললো - জ্বিন নয়, শাহাবুদ্দিনকে পরী ধরেছে। আরেকজন ধমক দেয় - পরী ধরে সুন্দর সুন্দর ছেলেদের। শাহাবুদ্দিনের মতো ভুটকাকে পরী ধরবে কোন দু:খে? দশ পনের দিন পরে শাহাবুদ্দিন স্কুলে ফিরলো। হাতে তাবিজ, গলায় মাদুলি। মাথায় সুগন্ধি তেল। সাহসী কয়েকজন শাহাবুদ্দিনের পাশে গিয়ে বসে। শাহাবুদ্দিন কোনো কথা বলে না। খাতার মধ্যে কী কী সব আঁকিবুকি করে। টিফিন আওয়ারে দেখা গেলো শাহাবুদ্দিন পিপড়া খাচ্ছে , দেয়ালে সারি বেঁধে চলা পিপড়াদের ধরে একটা একটা করে মুখে পুরে দিচ্ছে। কে একজনগিয়ে হুজুর স্যারকে খবর দিলো - 'স্যার শাহাবুদ্দিন পিপড়া খায়। ' স্যার ধমক দিলেন - 'শাহাবুদ্দিন খায় না, জ্বিনে খায়। '

খারাপ জ্বিনটা আরশাহাবুদ্দিনকে ছাড়লো না। জ্বিন শাহাবুদ্দিনের স্কুলে আসা ওখানেই শেষ। শুনেছি, পরে শাহাবুদ্দিন মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিল।

**পরিশিষ্ট:**

সময়ের সাথে অনেক কিছু পাল্টে গেছে। মাটির দালানের মক্তব ভেঙে গেছে একানব্বইয়ের ঘুর্নিঝড়ে। ইরান কাকা অনেক বছর হলো মিডল ইস্টে। কে জানে হয়তো ওখান থেকেও রোকাম শহরের স্কুল-কলেজ পরিদর্শনে যায়! শাহাবুদ্দিনের কোনো খবর পেলাম না। তবে পুরনো বন্ধুরা তাকে জ্বিন শাহাবুদ্দিন বলেই স্মরণ করে। গতবার গ্রামে গিয়ে দেখি তালগাছটি নেই, বাঁশ ঝাড়ও হাল্কা হয়ে এসেছে। ছেলেমেয়েরা দল বেধে স্কুলে যাচ্ছে। ওদের মনে তালগাছ কিংবা জ্বিন বিষয়ক কোনো ভীতি আছে কিনা জানি না। তবে মাঝে মাঝে অলস দুপুরে আমার স্মৃতিতে ভর করে ছেলেবেলার জ্বিনগুলি!

# পাঁক

**আরণ্যক সৌরভ**

---

মা কে মনে পড়ে আমার, মা কে মনে পড়ে। আমি মাঝেমাঝে একা জলকবিতা বুনি। আমি একটা আধা-পাগল স্মৃতিকাতর মানুষ।

১.
ছোটবেলায় আমি পাঁকে পড়ে গিয়েছিলাম। পদ্মায়।
সেইবার, যেবার অনেক পানি হয়েছিল নদীটায়, টি-বাঁধ বন্ধ করে দিয়ে দিনে রাতে বিডিআর এর গাড়ি টহল দিতো বাঁধের উপরে। ঠিক সেইবার, বৃষ্টির মৌসুম শেষে পানি নেমে যাওয়ার পর বেড়াতে গিয়ে। যতই উঠতে চাই কাদা ছেড়ে, ততই টেনে ধরে কে যেনো। অনেক কষ্টে চিৎকার দিই, অভিকর্ষ বলকে পরাহত করতে পারি না, পায়ের সাথে স্যান্ডেলের স্পর্শ খুঁজে পাই না।

মায়ের নরম মুখটা মনে পড়ে, আবার জোরে চিৎকার দিই, আল্লাকে ডাকি, স্কুলের ধর্ম শিক্ষা বই থেকে শেখা যতো দোআ মনে পড়ে, সব বলতে থাকি। দূরে লুঙ্গি মালকোচা মারা মানুষের বিন্দু বড় হতে থাকে, একটা অচেনা মানুষ এসে আমায় তোলে। ধমক-টমকও দিয়েছিল বোধহয়।

তারপরও আমি নদীটাকে ভালবাসতাম। সেই বছরেই পানি বেড়ে যাওয়ায়, টি আকৃতি বাঁধের মাথার অংশটুকু সেই যে বন্ধ করে দিলো, আর খুললোইনা কখনো।

২.
আমার মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষে প্রথম ট্রেন ভ্রমণের আবছা যে স্মৃতিটুকু সংরক্ষিত, তাকে আমি পুরনো ডায়রির পাতার মতো মাঝেমাঝে খুলে দেখি।
একটা অদ্ভূত দৃশ্য। একটা বাচ্চা,একজননারী,একজনপুরুষ। আমি,আমার মা ও বাবা।
আমার মা প্রচণ্ড ব্যথায় কাতর। বাচ্চার দিকে খেয়াল দেওয়ার সময় নেই তার। বছর চারেকের বাচ্চা মানুষটা বিহ্বল ও অবাক দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মায়ের এই চেহারা সে কখনো দেখেনি।
(বাচ্চাটি বড় হয়ে শুনেছিল, তার মায়ের অসুখ করেছিল ভীষণ, আরতাদের ভ্রমণ ছিল উত্তরের অজপাড়াগাঁ থেকে রংপুর নামের শহরে, চিকিৎসার জন্যে। )

তার পরের বছর সেই বাচ্চাটি হঠাৎ একদিন দেখে, তাদের বাড়ির সব জিনিষপত্র ট্রাকে তোলা হচ্ছে। গ্রামের মেয়েরা মায়ের হাত ধরে কান্নাকাটি করছে, শান্ত-শীতল মা সবাইকে বলছেন - তিনি আবার আসবেন। বাবা বাড়ি দেখাশোনার জন্যে মামাদের সাথে কথাবার্তায় ব্যস্ত। তারপর ধূলো উড়িয়ে সেই ট্রাকটায় চড়ে সবাই মিলে হাজির হই একটা মফস্বল শহরে।

পঞ্চগড়, না শহর না গ্রাম - একবারে ধূলো ওড়ানো মফস্বলে চেহারা। করতোয়া নদী চিরে গেছে যার বুক। অনেকবড় একটা বাড়ি, অনেক গাছপালা, আমকিংবা অন্যকিছু। একদঙ্গল ভাই-বোন, সবাইকে আগলে রাখে সেই মমতাভরা

মুখ। ছয়জনের মাঝে একেবারে ছয়নম্বর - সেইজন্যেই বুঝি আমাদের গল্পের বাচ্চাটা বড্ড বেশি মা-ন্যাওটা। তারপরও বাবা জোর করে শীতমাখানো সকালে করতোয়া নদীর উপরে ব্রীজের উপরে নিয়ে যেতেন, হিমালয় দেখবার জন্যে। রাশভারী বাবার আঙুল জড়িয়ে ছোট বাচ্চাটি হিমালয় দেখার চেষ্টা করে - আর ভোরে বাইরে গেলে, ভাঁপা পিঠা কিংবা খেজুর রস নিয়ে বাড়ি ফেরা তো আছেই।
কিন্তু, সবচেয়ে বেশি ভাল লাগতো বাবার খসখসে আঙুল জড়িয়ে নদীর পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে।

নদীর জন্যে ভালবাসা সেই থেকে শুরু।
পঞ্চগড়ের মফস্বলে থাকা হয়নি বেশিদিন। তারপর রংপুরে অল্প সময়। সবশেষে এসে পড়ি পদ্মা পাশ দিয়ে নেচে নেচে চলে যাওয়া এই শহরটায়। রাজশাহীতে। ততদিনে হাফপ্যান্ট আরটি-শার্ট পড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ার বয়স হয়ে গেছে সেই পিচ্চি ছেলেটার।

৩.
পদ্মার ধার ধরে আমি হাঁটতাম।
বুড়োদের মতো। উদ্যমী সকাল অথবা বিষন্ন সন্ধ্যা আমার কাটে আমার ভালবাসার নদীকে ঘিরে। আমার সব দুঃখ মুছে যায় চিকচিকে চাঁদের আলো পড়া জলধারার দিকে তাকিয়ে থাকলে।
তিন-চারঘন্টা টানা বৃষ্টি হলে শহর ডুবে যেতো, আমি থপথপ করে শব্দ তুলে স্কুলের পথে হাঁটা ধরতাম, কাদা মেখে ভিজে ফিরতাম। মা বকতো না। সে শহর বদলে যায়, অনেক ড্রেন তৈরি হয় শহর জুড়ে। আরকাদা হয়না, পানিতে ডোবেনা। শহরে আরো অনেক কিছুই পাল্টায়।
কেবল আমার নদী পাল্টায় না, আমার ভালবাসাও নয়।

আমার মা ও নয়। মায়েরা বদলায় না কেন যেনো।
আমার মা আমাকে কখনো বকে না। আমার মায়ের নরম মুখচ্ছবি আমি কঠিন হতে দেখিনা। ১৮ বছর বয়েসে যখন আমি স্বার্থপরের মতো দেশকে ঠেলে বিমানবন্দরের কাঁচের দরজার মুখে মেটাল ডিটেক্টরের বাধাটা পেরিয়ে আসি, তখনও দেখি কাঁচের ওপারে নরম মুখ, জলঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা তাঁর মাঝে। নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হতে থাকে।

৪.
এই গ্রীস্মের কোন একসন্ধ্যার কথা। আমি ক্লান্ত শরীর ও মন নিয়ে আমার বিদ্যাপীঠ থেকে বাসায় ফিরি ও ফোন তুলে নিয়ে প্রায় চারদিন পর নিজের আত্মজনের খোঁজ নেবার আপাত-ব্যর্থ চেষ্টা করি। নরম মুখচ্ছবির সেই কণ্ঠ শুনতে পাই ওপারে। আমার ক্লান্তি কেটে যায় অনেকটা, কিন্তু মনটা খচখচ করতে থাকে।

১৯ বছর আগের ট্রেনে সেই বাচ্চা মানুষের স্মৃতিকোষগুলোতে যে মুখচ্ছবি রাখা, ফোনের ওপার থেকে ভেসে আসা কণ্ঠে শব্দের যে ছবি তার সাথে মেলেনা।
অনেকক্ষণ পরে বুঝতে পারি, আমার জনকভালো নেই। আরএবারের আঘাতটা মস্তিষ্কে। শরীরে জেঁকে বসা হৃদরোগ আরব্লাড সুগারের বিভ্রাট জনিত সমস্যাগুলো তো আগে থেকে আছেই । অপরাধবোধের অনুভূতি আমাকে ঘিরে ধরে। যে সময়ে আমার যেখানে থাকা উচিত, আমি সেই সময়ে সেখানে থাকতে পারিনা।

শান্ত জলধারার নদীর কান্না আমি শুনি। শুধু শুনেই যাই।
আমি এই পরবাসে সুখী মানুষ ও সুখের অভিনয় করে যাওয়া মানুষদের দেখে মুগ্ধ হই, নিজেও সুখের রেসিপি খুঁজি। তাই আমার সময় হয়না নদীর ডাকে সাড়া দেবার, জননীর পাশে বসে থাকার। এই পাথুরে নগরে আমি খুব স্বাভাবিক নাগরিকের মতো একেকটা দিন পার করতে থাকি।

আমি অনুভব করি, সেই যে পাঁক - ছেলেবেলায় আমায় মুক্তি দিয়েছিল, ধীরেধীরে আমি নিজেই সে পাঁকে তলিয়ে গেছি, স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করেছি সেই পরিণতি।

শুকিয়ে গেছে আমার, ছেলেবেলার ভালবাসার নদী।

## ছেলেকাল : *আমার তো কোন ছেলেবেলা নেই...*

**আবু সায়ীদ জিয়া উদ্দিন**

---

সবার ছেলেবেলা থাকে - কিন্তু আমার কোন ছেলেবেলা নেই। অনেকে হয়তো অবাক হবেন - এটা কেমন কথা! কথা সত্যি! যদিও আমি সেই বয়সটা অতিক্রম করেছি যাকে ছেলেবেলা বলা যেত - কিন্তু " বেলা" অর্থে যা বুঝানো হয় তা তেমন ছিলনা বলেই - আমি বলি আমার ছেলেবেলা নেই। বেলা হলো একটা ছোট্র সময়কাল - যেমন সন্ধ্যাবেলা বা সকালবেলা। আরকাল হলো দীর্ঘ সময় - যেমন অতীতকাল। অনেকের ছোটবেলার স্মৃতি এতো মধুর হয়ে যে সেই দীর্ঘ সময়কেও খুবই ছোট মনে হয় - তাদের জন্যে হয়তো সেই সময়কালটা ছেলেবেলা হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু যাদের সেই সময়কার স্মৃতি রূঢ় বাস্তবতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে - তাদের জন্যে সেই সাদাকালো সময়টাকে ছেলেকাল বলেই বিবেচনা করা যৌক্তিক মনে করি।

শিরোনামতো একটা হলো - কি লিখবো। সম্পাদকতো শিরোনামেই খুশী হবেন বলে মনে হয়না। সমস্যা হলো আমার ছেলেকালের এমন কোন স্মৃতি মনে নেই - যা সাহিত্যের রসে সিঞ্চিত করে আসরের সাহিত্য রসিকদের আপ্যায়িত করতে পারি। কিন্তু লেখতে যখন হবেই তবে সাম্প্রতিক কালের একটা ঘটনা বলি - যাতে ছেলেকালের কিছু ঘটনা চলে আসবে আরপাঠকগন হয়তো কিছুটা সাহিত্য রস পেলেও পেতে পারেন।

ঘটনা ঘটেছে গত মাসে। একদিন কাজ শেষে রাত্রীকালিন খাবার শেষ করে ল্যাপটপ খুলে বসেছি। দেশ-বিদেশের খবর দেখবো - ভাববো কি করা যায় - কি করা হয়নি - কি করলে কি হতো..মানে যা করি আর কি! কিন্তু হঠাত অন্দরমহল থেকে গিন্নীর গলা - " আজআরকম্পিউটারে বসো না - ছেলেটাকে একটু হেল্প করো। ওর হোম ওয়ার্কে তোমার কি যেন একটা ইন্টারভিউ লাগবে। "

বললাম - সমস্যা কি - এখানে বসেই হবে।

ছেলে এসে বললো - " না বাবা, আমার মনে হয় তোমার একটু সিরিয়াস হতে হবে। "

কথা ঠিকই - যখন ল্যাপটপ নিয়ে বসি - তখন সকলপ্রশ্নের উত্তর হু আরহা তেই সীমাবদ্ধ থাকে। ছেলের কথায় যথেষ্ঠ শক্তি থাকায় সিদ্ধান্ত নিলাম ছেলের রুমেই যাবে।

রুমে গিয়ে দুইজন মুখোমুখি বসলাম - শুরু হলো ইন্টারভিউ পর্ব।

ছেলে একটা সূচনা বক্তব্য দিলো। বক্তব্যটা ছিল যথেষ্ঠ প্রফেশনাল এবং টু দি পয়েন্ট। ভাললাম ছেলে আমার পারফেক্ট কানাডিয়ান ছেলে হয়ে গেছে। যা বলে সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারে। আমাদের সময়ে বাবার সামনে একটা কথা বলার সময় দশবার ইয়ে ইয়ে করে আসলকথাই বলা হয়ে উঠতো না।

ইন্টারভিউর বিষয়বস্তু হলো - আমার ছেলেবেলার সবচেয়ে ভাল ঘটনা আরসবচেয়ে খারাপ ঘটনা বর্ননা করতে হবে। ওর স্কুলের এসাইনম্যান্ট। পরের সপ্তাহেই জমা দিতে হবে।

পড়লাম কিছুটা বিভ্রান্তিতে - মনে হলো আমার বাবার মৃত্যুটাই আমার জন্যে সবচেয়ে কষ্টের ঘটনা। আবার মনে হলো - বাবার মৃত্যুর যে কারন - যা আমাদের পারিবারিক জীবনকে করেছে বিক্ষিপ্ত - আমাদের পুরো পরিবারকে

দারিদ্রতার নীচে নামিয়েছে - আমাদের বোনদের জীবনে করেছে সংকটাপন্ন - সেই ঘটনাই হলো আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ ঘটনা।

বললাম - " মুক্তিযুদ্ধের সময়টা হলো আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়কাল"।

ছেলে বললো - " ওটাতো তোমাদের জন্যে ভাল সময় - একটা স্বাধীনদেশ দিয়েছে"।

এরই মধ্যে গিন্নী এসে যোগ দিয়েছে। গিন্নি জানতে চাইলো - কেন, মুক্তিযুদ্ধ তো ভাল সময়।

বললাম - যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, আমি ৬ বছরের বালক। সেই সময়ে একটা ছেলের যে জীবন থাকে - তা আমাদের ছিল না। আমরা ফুটবল খেলার চেয়ে বেশী সময় ব্যয় করেছি বড়দের আতন্ক ভাগাভাগি করে। একটা বাচ্চা ছেলে যখন তার জীবনটাকে ফুটবল ম্যাচে হারা জেতার মধ্যেই তার আনন্দ বেদনা সীমাবদ্ধ রাখে - তখন আমি জীবন-মৃত্যু নিয়ে ভেবেছি। যখন একটা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি - আরসেই গ্রামে পাকিস্থানী সৈন্য আসার কথা শুনা গেছে তখন একটা ছোট্ট ছেলে আল্লার কাছে জীবন ভিক্ষা চেয়েছে - আমার বয়সটা তখন ছিল একটা পাঁচ নাম্বার ফুটবল পাওয়ার জন্যে আল্লাহকে ডাকার - সেই বয়সেই আমি আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সত্যের মুখমুখি হয়ে আল্লার কাছে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি।

একটা ছয় বছরের বাচ্চা যখন প্রজাপতি আরফড়িং ধরার আনন্দে আত্নহারা হয় আরতাদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় - আমি সেই সময় খোয়াই নদীর তীরে বসে ভেসে যাওয়া লাশের চেহারা দেখে বাবার মৃতদেহ খুঁজেছি। যখন একটা বালক সারাদিনের খেলা শেষে ক্লান্ত হয়ে মায়ের বকুনী খেতে খেতে মায়ের আচলদিয়ে চুপিসারে তার মুখের ঘাম মুছে - সেই বয়সে আমি আমার মায়ের ভয়ার্ত চোখের পানি মুছিয়ে মাকে সান্তনা দিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়ে আমি ৬ বছরের বালক একজনযুবক হয়ে উঠেছিলাম। সেই যুবক আবার একজনবৃদ্ধ যেভাবে মৃত্যুকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে - আমি সেইভাবে মৃত্যুকে দেখেছি। যুদ্ধ একটা ছোট্ট ছেলেকে যুবক থেকে বৃদ্ধে রূপান্তরিত করেছে - বালক হারিয়েছে তার ছেলে বেলা - হারিয়েছে তার সকলসুন্দর সময়গুলোকে। এই কঠিন সময় আরো প্রলম্বিত হয়েছে - সংসার একটু গুছাতে না গুছাতেই আসলো ৭৪ এর দুর্ভিক্ষ। সেই ছেলেটার বয়স তখন ৯ - সে দেখলো বাচ্চাদের খাবার যোগার করতে ব্যর্থ বাবা চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাপিয়ে পড়েছে। দেখলো - একবাটি ভাতের মাড়ের জন্যে একদলমানব সন্তানের কাড়াকাড়ি।

একসময়লক্ষ্য করলাম - আমি চলে গেছি হবিগঞ্জের লস্করপুরের বালুচর গ্রামের খোয়াই নদীর তীরে আরআমার ১১ বছরের ছেলে বসে আছে কানাডার টরন্টো শহরে। ও অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছে তার বাবার বাল্যকালের কাহিনী। আমি অনুভব করলাম - আমি কোন একজনরক্তমাংসের মানুষ না - আমি একটা সময়। যে সময়টা অতীতের - কথা বলছে ভবিষ্যতের একটা সময়ের সাথে - একটা প্রজন্ম আরেকটা প্রজন্মকে তার সকলতথ্য হস্তান্তর করছে।

এরই মধ্যে গিন্নী এককাপ চা এনে সামনে রাখলো। চায়ে চুমুক দিয়ে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম - বাবা, এটা কি বেশী বড় হয়ে যাচ্ছে।

ছেলে বললো - ইটস ওকে, আমি এসাইনম্যানটা ছোট করেই লিখবো, তুমি বলে যাও।

আবার শুরু করলাম। বললাম শায়েস্তাগঞ্জের ফিরে আসার কথা। সেখানে গনহত্যা আরগনকবরের স্বাক্ষী হওয়া কথা। বললাম কিভাবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গ্রামের বাড়ী মুন্সীগঞ্জে গেলাম তার গল্প। বললাম মুন্সীগঞ্জে গিয়ে কিভাবে

নিরাপদ আবাসের জন্যে রাতের পর রাত পালিয়ে বেড়ানোর কথা। বললাম - পাকিস্থানী আর্মি কিভাবে আমাদের জিম্মি করে মুক্তিবাহিনীর আবাসস্থলে হামলার উদ্দেশ্যে মর্টার হামলা চালিয়ে ছিল তার গল্প।

এভাবে অনেকক্ষন বলার পর একটু থেমে বললাম - বাবা তোমার পরের প্রশ্নটা কি?

ছেলে - " তোমার কথা শেষ না হলে আরো বলো, আমি জানতে চাই"।

আমি - " ঠিক আছে। আরেক দিন হবে। এখন পরের প্রশ্নটা বলো"।

ছেলে - " তোমার ছেলেবেলার সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা বলো"।

এবার আরকোন দ্বিধা নেই ।

বললাম - " আমাদের স্বাধীনতার স্মৃতি হলো সবচেয়ে আনন্দের স্মৃতি"।

ছেলে বললো - " বাবা, একটু বিস্তারিত বলো"।

আমি শুরু করলাম - সেই দিন ছিল ১৪ ই ডিসেম্বর। ১৩ তারিখ রাতে আমরা নানার বাড়ীতে অবস্থান করছিলাম। সন্ধ্যার দিকে মুক্তিযুদ্ধের থেকে খবর এলো - রাতে কলেজ এ্যাটাক হবে। (একটা ৬ বছরের বালকের জন্যে এটাক শব্দটা কতটা আনন্দের ছিল সেটা হয়তো ওকে ঠিকমতো বুঝাতে পারিনি। ) বলা হলো সেটা হবে - ভোর রাত্রে। আমরা যেন নিরাপদ স্থানে সরে যাই। নানা এসে বললেন - সবাই একটা নিদিষ্ট ঘরে চলে যেতে - কারন সেই ঘরটা ছিল নীচু। সৃতরাং গুলি আসলেও শুয়ে থাকার ফলে নিরাপদে থাকবো। যদি মর্টারের গোলা আসে - সেটা হবে আমাদের জন্যে দূর্ভাগ্যের । নানা হয়তো জানতেন যে যুদ্ধটা হয়তো এবার একপক্ষীয়। বলা দরকার যে - আমাদের নানার বাড়ী থেকে আর্মি ক্যাম্প হিসাবে ব্যবহৃত হরগঙ্গা কলেজের দূরত্ব হবে ৩ কিলোমিটারে মতো।

আমাদের সন্ধ্যার সময়ই খাইয়ে শুতে পাঠানো হলো। কিন্তু সারারাতেও একটু ঘুমাতে পারিনি। একই লেপের নীচে চার/পাঁচ জন করে মাটির উপর এটা পাতলা কাথাঁ বিছানো বিছায়ায় প্রচন্ড শীত আরমনে মধ্যে এ্যাটাকের খবর। রাত তখন হয়তো একটা বা দুইটা হবে। ঘড়ি দেখার কোন সুবিধা নেই। সুতরাং অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই। শুরু হলো আওয়াজ...ট্যা ট্যা ট্যা। আমার এক মামাতো ভাই আমার পাশে শুয়ে ছিলো। বলে উঠলো - এটা এলএমজি। একজনবালকের জন্যে এটা বিশেষ জ্ঞান বটে। অন্যপাশে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা খালাতো ভাই বললো - না এটা স্টেনগান।

আমাদের ফিস ফিস নানার কানে গেলে উনি থমক দিয়ে বলে উঠলেন - " সবাই চুপ"।

বেশ কিছুক্ষন পর বড়দের একজনবলে উঠলো - মনে হয় শুধু একদলইগুলি করছে।

এভাবে ফিসফিস আরগুলির আওয়াজের মধ্যে সকাল হয়ে গেল। তখনও থেমে থেমে গুলির শব্দ হচ্ছে। সবাই বাইরে আসা শুরু করলো। সবার মুখ একইপ্রশ্ন - ঘটনা কি? বড় অস্ত্রের শব্দ শুনা গেলনা কেন। বলা ভাল যে - পাকিস্থানীরাই ছিল ভারী অস্ত্রের মালিক আরমুক্তিযুদ্ধাদের কর্মকান্ড ছোট অস্ত্র ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল।

কিছুক্ষন পরে খবর এলো - পাকি বাহিনী রাতে মুন্সিগঞ্জ থেকে পালিয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধারা শহর দখল করে ফেলেছে।

মুন্সীগঞ্জ স্বাধীন।

দ্রুতগতিতে খবরটা ছড়িয়ে গেল - দাবানলের মতো - " আমরা স্বাধীন" ।

মুখে মুখে একইধ্বনি - আমরা স্বাধীন! আমারা স্বাধীন!

সবাই ঘর থেকে বেড়িয়ে এসেছে। সবাই বিরাট উতসবে মেতে উঠেছে - মুখে একটা আওয়াজ - " জয় বাংলা" ।

আমি আমার সমবয়সীদের সাথে দৌড় শুরু করেছি। মনে হচ্ছিল সবচেয়ে বেশী আনন্দ বোধ হয় হচ্ছে শহরের কেন্দ্রে। দৌড়াতে দৌড়াতে যখন সাধনার মোড়ে পৌছলাম - দেখলাম বিরাট উতসব। সবাই পাগললের মতো চিতকার করছে - " জয় বাংলা"। একজনআরেকজনকে জড়িয়ে ধরছে - আনন্দে!

একসময়অনুভব করলাম - আমার কানে কে যেন টেনে ধরেছে। চেয়ে দেখি আমার একসম্পর্কিয় মামা। তাকিয়ে দেখি উনার আরেক হাত আমার মামাতো ভাইএর কানে। উনি বললে - এই বান্দর, এই ঠান্ডায় খালি পায়ে দৌড়াইতাছস কেন. ঠান্ডা লাগবো না।

একটা হেচকা টানে কান মুক্ত করে আবার দৌড়.....জয় বাংলা...জয় বাংলা.....

যখন বাড়ীতে ফিরলাম তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল...শীতের বিকাল।

আমি একজনস্বাধীন দেশের মানুষ। আমরা বাংলাদেশ নামের একটা দেশের মালিক। আরকেহ আমাদে মারতে অস্ত্র নিয়ে তাড়া করবে না। আরআমাদের জীবন বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে বেড়াতে হবে না। প্রতিরাতে ঘুমাতে যাবার আগে সৃষ্টিকর্তার কাছে জীবন ভিক্ষা চাইতে হবে না। আমরা আবার মনের আনন্দে ফুটবল খেলতে .....

একজনবালকের জন্যে এর চেয়ে আনন্দের ঘটনা আরকি হতে পারে।

কথা যখন শেষ করি - ঘড়িতে তখন রাত এগারটো। ছেলে তখনও অবাক হয়ে শুনছে আমার কথা। বললাম - " বাবা, আজএই পর্যন্তই"।

ছেলে বললো - " বাবা, তুমি সত্যই ভাগ্যবান, রিয়েলি, এটা অবশ্যই আনন্দের"।

পরদিন আবার জীবনের টানে ভোরে কাজে যেতে হবে। ছেলেকে যেতে হবে স্কুলে। সুতরাং ঘুমাতে যেতে হবে। একটা অদ্ভুদ অনুভূতি নিয়ে ঘুমাতে গেলাম। অনুভব করলাম - আমার যতটুকু স্মৃতি ছিল - যা আমার জন্যে একইসাথে কষ্টের আরআনন্দের তীব্রতা নিয়ে জমেছিলো আমার মগজের গভীরে - তা আরনেই। আমি পেরেছি আমার ছেলেকালটাকে আমার পরের প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করতে।

এখনও জানি না সেটা কতটুকু সফলভাবে হয়েছে!

# অসমাপ্ত স্মৃতিতে আমার ছেলেবেলা

**আহমেদ রাহিদ অমিত**

---

আজ প্রায় তিন চার মাস আগে যখন শেষ পর্যন্ত ঠিক করতে পারলাম যে ডিসেম্বরে দেশে যাব, সেদিন থেকেই দিন গোনার শুরু আরঘড়ির কাঁটার থেমে যাওয়া। ৬ মাস ১৩ দিন, ৬ মাস ১২ দিন...ধুর ছাই।

বড়ই অদ্ভুত এই সময়ের চরিত্র।
যখন আটকে রাখতে চাই, তখন ধরার আগেই দূরে সরে যায়। আবার যখন তাকে বেশ সুকান্তর মত "সময় তোমায় দিলেম আজকে ছুটি" বলে ঘোষণা দেই, টবে রাখা ছোট্ট ক্যাকটাস গাছটার মত হয়ে যায়, না বাড়ে , না কমে।
আসলে মনে হয় সময় জিনিসটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করাই বোকামী। সময় নষ্ট। একমুঠ বালি হাতে আটকে রাখতে গেলে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বেশির ভাগই পড়ে যায়। ঐ পড়ে যাওয়া বালি হচ্ছে সময়, আরহাতে যেগুলা বাকি থাকে, স্মৃতি।
স্মৃতি ব্যাপারটা কি বদলায়? আমরা কি আমাদের পছন্দের অভিজ্ঞতাগুলোকেই স্মৃতি হিসাবে সম্মান দেই ? স্মৃতির সংগে সময়ের ব্যাপ্তিরই বা কি সম্পর্ক ? গতকালকের ঘটনা তো স্মৃতি হয় না। আবার যে সময়গুলাকে মনে হয় স্মৃতি বলা যেতে পারে, মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা।
আমার তো মনে হয় এইতো সেদিনই ভাইয়া হাসতে হাসতে এসে বলল যে অমিত, আজ থেকে আমার রুমটা তোমার। ২০ বছর আগের ঘটনা, মনে হয় গতকাল।

আজিমপুর কলোনীতে থাকতাম আমরা। জ্ঞাণ হওয়ার পর থেকেই ভাইয়ার রুমটার উপর আমার ভীষণ লোভ। কবে এটা আমার হবে, নিজের একটা পৃথিবী। ক্লাস থ্রির শেষ দিকে ভাইয়া যখন আমেরিকায় এডমিশন নিয়ে চলে আসার আগে ঐ ঘোষণাটা দেয়, তখন আনন্দে আমার লাফালাফি দেখে বাবা মা অনেক মজা পায়। কিন্তু তারা তখন বুঝতে পারে নি যে তাদের দুই ছেলেকে নিয়ে একসংগে তাদের আর থাকা হবে না।
আমার ছোটবেলার সময়টায়, আশির দশকটা ছিল সবার মধ্যে আমেরিকার প্রতি একটা মুগ্ধতার সময়। কলেজ শেষ হলেই স্টেটস এ যেতে হবে। টিভিতে দেখানো হত সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান, হাওয়াই ফাইভ-ও। স্টেরিও তে অ্যাবা, বনিএম, বিলি জোয়েল, বিটলস। বিদেশ থেকে আসা মামা, মামাতো ভাই বোনেরা ছিল রহস্যময় স্বপ্নের দেশ থেকে আসা মানুষজন। এয়ারপোর্টে যাওয়া ছিল একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। মনে পড়ে অপেক্ষায় থাকতাম কখন গাড়ি দিয়ে সরাসরি দোতালায় উঠতে পারব, সিড়ি লাগবে না। প্লেনের সিড়ি দিয়ে সবাই হাত নাড়তে নাড়তে ভিতরে ঢুকে যেত। একটু পরে প্লেনটা টুক করে উঠে হারিয়ে যেত দিগন্ত রেখায়, ভিতরের মানুষগুলাকে নিয়ে। কি ম্যাজিকাল ছিল ব্যাপারটা !

সেই মুগ্ধতা আজআরনেই। খালি ম্যাজিক দেখার আনন্দের স্মৃতিটুকু আছে। সেটাই বা কম কি।

আসলে ছোটবেলা সময়টা মনে হয় এই সময়ে এসে ম্যাজিক্যালই মনে হয়। কারণ সেই সাত সকালে অর্ধেক চোখ বন্ধ আর বাকি অর্ধেকে ঘুম নিয়ে স্কুলে যাওয়াটা এই সময়ে সুখস্মৃতির মধ্যে পড়লেও, সেটা মোটেও তখন ভাল লাগে নি। কলোনী থেকে নিউমার্কেটের মোড়, নীলক্ষেতের মোড় পার হয়ে যখনই ইউনিভার্সিটি এলাকায় ঢুকতাম, মনে হত অন্য একটা পৃথিবীতে চলে আসলাম। সেই সময় নীলক্ষেতের পুলিশ ফাঁড়িটা ছিল টিনের চালের ছাপড়া ঘর। এখন যেখানে একটা টিচার্স কলোনী, তখন মনে হয় সেখানে মাঠ টাইপের কিছু একটা ছিল। সেই অংশের পূর্ব দিকে ভিসির বাসার দিকে যেতে নিলে পরপর দুটা ব্রিটিশ আমলের পরিত্যক্ত বাসা চোখে পড়ত স্কুল থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝে সেই বাসাগুলার বাইরে এসে দাঁড়াতাম। মনে হত যেন কোন

রহস্যগল্পের মধ্যে এসে পরলাম। সেই বাসা দুটার উল্টোদিকেই ছিল এ এফ রহমান হল। তখনও বিল্ডিং হয় নি। মহসিন হলের মাঠের পাশে সারিসারি টিনের ঘর নিয়েই তখন এই হল। এরপর ভিসির বাসার সামনে ডান দিকে মোড় নিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের উল্টোদিকে আমার স্কুল। পুরো রাস্তাটা ছিল সবুজে ভরা, বিশাল সব গাছের ছায়ায় ঢাকা।
এখন উদয়ন বিদ্যালয়ের (কলেজ হওয়া সেইদিনের ঘটনা, আমরা যখন স্কুল ছাড়ি আজ থেকে বছর বার আগে তখনও তা স্কুলই ছিল)যে মাঠহীন বিশাল অট্টালিকা দেখা যায়, আমি যে সময়ের কথা বলছি তখনও সেটা নির্মাণের পর্যায়ে। আমাদের সময় সেটা ছিল একটা মেইন বিল্ডিং এবং তার সংগে সংযুক্ত আরও কিছু ছোট ছোট বিল্ডিং, যার মধ্যে কিছু আবার টিনের চালের। সামনে ছোট একটা মাঠ, সেখানেই হত আমাদের সকাল বেলার গণসঙ্গীতের ক্লাস।

আজ এত বছর পর স্কুলের কথা মনে করতে যেয়ে কেন যেন ঐ সকাল বেলার জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার কথাটাই বারবার মনে হচ্ছে। সকালের সেই হালকা ঠান্ডা বাতাস, ক্লাস অনূযায়ী সবাই লাইনে দাড়ানো, সামনের বন্ধুর ইন করা শার্ট টেনে খুলে দেওয়ার সংগে সংগে নিজের শার্ট সামলানো এবং একই সংগে সুরে বেসুরে "আমার সোনার বাংলা। "দশটা বছর কেটেছে একইভাবে। দেশকে ভালবাসার চেতনাটা এভাবেই মনে হয় মনের মধ্যে গেঁথে যায়। এরপর যথারীতি ক্লাস।

আমাদের সবার জীবনেই স্কুলের শিক্ষকরা একেকজন রঙীন চরিত্র। আনোয়ার সার, আসগর সার, টেক্সট সার, খালেদা আপা, রাকিবা আপা, এরকম কত নাম। কার ক্লাসে হোম ওয়ার্ক না নিলে কঠিন শাস্তি, কার ক্লাসে কথা বলে উঠলে কানে ধরে দাঁড়ানো, কার ক্লাসে চুপচাপ গল্পের বই পড়া যায় এরকম কত গল্প। সব কীর্তিকাহিনী নিয়ে বলতে শুরু করলে একটা বই লিখতে হবে। তাই এ ব্যাপারে এখানেই ক্ষান্ত দিলাম। আমরা বন্ধুরা এখনও একসংগে হলে স্যারদের প্রসংগ চলে আসে মাঝেমধ্যেই। এখনও কেউ কেউ টেক্সট স্যারের সেই বিখ্যাত ডায়লগ কোট করে,"কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরাসনে বাবারা। "

ক্লাসের পর টিফিন ব্রেকে চলত পুরা স্কুল এক্সপ্লোর করে বেড়ানো। রহস্যময় মনে হত সিনিয়রদের ক্লাসগুলা এবং ল্যাবরেটরি (যেখানে একটা নরকন্কাল ঝোলানো থাকত। কতবার যে রহস্য গল্পগুলা পড়তে যেয়ে ঐ অন্ধকার ল্যাবরেটরিটা চোখের সামনে ভসে উঠত!)। মনে হত কবে বসতে পারব ঐ ক্লাসগুলাতে, কবে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে কেমন লাগে সেটা জানতে পারব। খেলাধূলাতো ছিলই। মাঠ ছোট থাকায় ফুটবল বা ক্রিকেটের মত খেলাগুলা জমা থাকত বিকালে কলোনীর জন্য। তখন যেটা খেলতাম স্কুলে সেটার নাম ছিল রেসকিউ। নিয়মটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না। তবে দৌড়াদৌড়ি ছিল প্রচুর পরিমাণে।

উদয়নে নার্সারি থেকে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত ক্লাসগুলা শুরু হত সাত সকালে আর শেষ হত মনে হয় সাড়ে দশটার দিকে। এরপর শুরু হত সিনিয়রদের সময়। তাই ক্লাস থ্রি এর গন্ডি পার হওয়ার পর কলেজে ওঠার আগে পর্যন্ত আমার আর সকালের ঘুমে কোন সমস্যা হয় নি। রাত জাগার অভ্যাসটাও মনে হয় আস্তে আস্তে ঐভাবেই গড়ে ওঠে। এই অভ্যাসটা ছাড়াও যে আরেকটা ব্যাপার ঘটে সেটা হল বাসায় তাড়াতাড়ি ফিরে আসার একটা আশ্চর্য্যজনক তাড়া অনুভব করি এ সময়টায় এসে। সকালে যখন ছুটি হত তখন আমি আর বাসা ছিলাম চুম্বকের সমমেরু, যত দেরীতে আসা যায়। কিন্তু ক্লাসের সময় পাল্টানোর সংগে চুম্বকের মেরু গেল ঘুরে। তখন মনে হত কখন ফিরব। কারণ আর কিছুই না, বিকালের খেলা।

এই বিকালের খেলার স্মৃতিগুলা আমার ছোটবেলার আনন্দময় স্মৃতিগুলার একটা বড় অংশ জুড়েই আছে। খালি খেলা বলি কেন, কলোনীর আড্ডা, কত মজার মজার সব ঘটনা। এখানে চার পাঁচ বছর বয়সের পার্থক্য কোন ব্যাপারই ছিল না। বিকাল হলে যে যেখানেই থাকুক, চলে আসতখেলার মাঠে। তারপর সেকি দূর্দান্ত সব খেলা। গরমের সময় ফুটবল আর শীতকালে ক্রিকেট ,ব্যাডমিন্টন। আর ওয়ার্ল্ড কাপ হলে তো কথাই নাই। ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা হয়ে যেত দুই দল। ব্রাজিল সবসময়ই একটু দলে ভারি থাকত। তাই আজেন্টিনার সংগে যুক্ত হত রেস্ট অফ দা ওয়ার্ল্ড, ইংল্যান্ড,ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি। কি সব খেলা হত, ভাবলে এখনও উত্তেজিত হয়ে যাই।

গরমকাল শেষ হলে যখন অক্টোবর, নভেম্বর এর দিকে হিম হিম বাতাসগুলা বওয়া শুরু হত, তখনই শুরু হত ক্রিকেটের সিজ্ন। বিশেষ করে মনে পড়ে স্কুল ফাইনাল শেষ হওয়ার পর সারাদিন ধরে যে খেলাগুলা হত সেগুলার কথা। সকলা থেকে শুরু হত ক্রিকেট। দূপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত একটু ব্রেক আর সন্ধ্যার পর ব্যাডমিন্টন। সন্ধ্যার পর বাসার বাইরে বের হওয়াটা ছিল নিষিদ্ধ আনন্দের পর্যায়ে। প্রথমে এই নিষিদ্ধ আনন্দটা ছিল কলোনির খেলার মাঠে সীমাবদ্ধ। পরে সেই সীমানা বেড়ে হয় নিউমার্কেটের বইয়ের দোকান এবং আরও পরে এলিফেন্ট রোডের রেইনবো। রেইনবো পর্যায়ে গভীর রাতে অন্ধকারে বাসার বারান্দায় বিলি জোয়েল, জন ডেনভার শুনতে শুনতে হারিয়ে যেতাম কলারেডো আর ক্যানসাসের খোলা প্রান্তরে। মনে হত দরজাটা খুলে রাস্তায় নেমেই পাব রড স্টিউয়ার্টের ডাউনটাউন ট্রেইন। রাতে ছাদে উঠে আলোকোজ্জল রাস্তা আর নিউমার্কেটের উতসবমুখরতায় মনে হত এটাই বুঝি ব্রডওয়ে। আজ যদি সেই মুগ্ধতার রেশটুকুও থাকত। আমার ছোটবেলার সংগে সেই স্বপ্নগুলোও হারিয়ে গেছে।

আমি একদিক দিয়ে ভাগ্যবান যে স্বপ্নগুলা হারিয়ে যাওয়ার সময় আমার বন্ধুগুলাকে রেখে গেছে। আমার এখনকার বন্ধুরা সবাই সেই স্কুল জীবনেরই বন্ধু। কেউ কেউ আছে আবার স্কুলের প্রথম দিনের। এইসব বন্ধুদের অনেকের মাথায় আজকাল শুভ্রকেশের আনাগোণা দেখা যায়। কেউ কেউ সন্তানের গর্বিত পিতা মাতা (আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে সেইসব ক্ষুদ্র সন্তানেরা তাদের পিতৃদেবদের কিছু কীর্তিকলাপ জানতে পারলে যথেষ্ট গর্বিত হত কিনা !)। কারও কারও গম্ভীর অফিসার ভাবমূর্তি দেখলে এইটা কল্পনা করা খুবই দুঃসাধ্য যে সে স্কুলের প্রাচীর টপকাতে যেয়ে প্যান্ট ছিড়ে ফেলেছিল, সে আবার এখন এমপ্লয়ি অফ দা ইয়ার ও হয় !!তবে আমরা যখন এখনও সবাই একসংগে হই, তখন বুঝতে পারি যে সেই দূরন্ত কৈশোর এখনও কোন না কোন ভাবে আমাদের সংগে আছে (এই সামান্য ব্যাপারটা যে কেন আমার কৈশোরের বান্ধবী, যৌবনের প্রেমিকা আর আজকের বেটার হাফ মেনে নেয় না, সেটা কোনভাবেই আমি বুঝি না )। ছোটবেলার বন্ধুদের বয়স কখনোও বাড়ে না। যেমন বাড়ে নি সেই রুশ দেশের উপকথার সিভকা বুর্কার। বয়স বাড়েনি পেনসিল আর সর্বকর্মার। বয়স বাড়েনি এদেরকে আমার সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়া প্রগতি প্রকাশনী মস্কোর ননী ভৌমিকের। বয়স বাড়েনি ফেলুদা, শঙ্কু আর কাকাবাবুর। চাটুজ্যদের রোয়াকে টেনিদার আড্ডা এখনও হয়। শীর্ষেন্দুর ভূত আর জাফর ইকবালের দুষ্ট ছেলের দল এখনও গভীর রাতে নিশিডাক দেয়। সাতকাহনের বিপ্লব শেষ হয়নি এখনও। অরণ্যের রাতে আবার আমাকে ফিরে যেতেই হবে।

ঢাকায় যাওয়ার দিন খুব ধীরে হলেও এগিয়ে আসছে। ডিসেম্বরের এক গভীর রাতে দীর্ঘ আড়াই বছর পর দেশে ফিরব। কেমন লাগবে কে জানে। যে জায়গায় আমি না চাইতেও আমার ছোটবেলাকে ফেলে এসেছি, সেইখানে দাড়িয়ে স্মৃতির মুখোমুখি হয়ে হয়ত এটাই বুঝতে পারব কতখানি দূরে সরে এসেছি। অথবা সরে আসিনি, সরে আসার নাম করে থেমে গিয়েছি। এই বোঝা না বোঝার, দুরে কাছের, লাভ ক্ষতির হিসাব শেষে গভীর রাতে চোখ বন্ধ করলে আমি কিন্তু আমার ছোট্ট বেলার সবুজ খেলার মাঠকেই দেখতে পাই, মাঠের উপর বিল্ডিং বানানোর জন্য জমিয়ে রাখা পাথর আর মরচে পরা শিকগুলোকে না...।

# সুন্দর, হে সুন্দর

**ইশতিয়াক রউফ**

---

১.

বাবা-মা চেষ্টার অন্ত করেনি। ছেলে যাতে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে, তা নিশ্চিত করতে গৃহদাহের ঝুঁকি নিয়েও আমার মায়ের বাচন ঠিক করতো আমার বাবা। করসি নয়, করেছি। রাধসি নয়, রেঁধেছি। গেসিলাম নয়, গিয়েছিলাম। এরকম আরো অনেক কিছু। ছেলে একজন শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ মানুষ হবে, সেই ইচ্ছা থেকেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপারেও অসীম মনোযোগ ছিল তার। বিশেষ যত্ন ছিল ভাষার দিকে। জন্মদিনের উপহার ছিল আনন্দবাজার থেকে প্রকাশিত বাংলা বানান ও প্রুফরিডিং নিয়ে বই, নয়তো সংসদ বাংলা অভিধান। কোনদিন খেলনা বন্দুক হাতে নিতে দেওয়া হয়নি আমাদের দুই ভাইকে। আব্বু কোনদিন আধোআধো ভাষায় কথা বলতো না আমাদের সাথে। হাতে ধরে লেখা শেখানো হয়েছিল আমাদের। খাতা পয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে রেখে লিখলে দ্রুততম এবং সুন্দরতম হয়, শেখানো হয়েছিল। স্কুলের আগে সিঁথি সোজা করে চুল আচড়ে দেওয়া, জুতার ফিতা বেঁধে দেওয়া, জুম্মাবার আসলে সময় মত গোসল ও নামায নিশ্চিত করা, ঈদের আগে পায়জামা-পাঞ্জাবী ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখা, ছুটির দিনে জুতা কালি করে রোদে শুকানো, আরো অনেক কিছু। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার আগপর্যন্ত বাসায় কেবল টিভি আসেনি, পড়া নষ্ট হবে দেখে। আব্বু সিগারেট ছেড়ে দেয় আমি সপ্তম শ্রেণীতে ওঠার পরপর। কারণ একটাই, নিজে মশাল ফুকলে ছেলেকে মানা করতে পারবে না। এতত্যাগে লাভ কী হল বুঝলাম না। আয়নায় নিজের দিকে তাকালে খুব লজ্জা লাগে। কী হতে পারতাম, আর কী হলাম। বন্ধুর ভাষায় ‘ বিবর্তন থেকে দূরে’ ও রুক্ষ একজন মানুষ ছাড়াও বিশাল কিছু ফাঁক চোখে পড়ে। ছেলেবেলার স্মরণ তাই অনেক লজ্জার আমার কাছে। এতযত্ন, এতভালবাসা, এতমনোযোগ যেন পথেই হারিয়ে গেল। ছেলেবেলা তাই আমাকে নস্টালজিয়া বা দুষ্ট আনন্দের চেয়ে হতাশা দেয় বেশি। অন্তরের ত্রুটি অন্দরেই থাক, আমি বেঘোরে মরলেও সনাক্ত করার মত একটা বাহ্যিক ত্রুটির কাহানি লিখি এই বেলা।

২.

ভদ্রভাষায় যাকে সৌন্দর্যের উপাসনা বলে, সেই আদিম রোগটি আমার বেশ পুরনো। ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়তাম ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলে। কো-এডুকেশন স্কুল। ছাত্র ভাল ছিলাম, কিন্তু মানুষ হিসেবে খুব দুরন্ত ছিলাম। বয়স তখন হিরোইজমের। হিরোর মত ঘন্টাখানেক ছোটঘরে ক্রিকেট খেলি, নিয়ম করে ফুলবাবু সাজি, হাঁটার পথ লাফিয়ে পার হই। এই উঠতি হিরোইজমের দায় মিটালাম উপরের পাটির সামনের দুটো দাঁত খুইয়ে। ডাক্তারি ভাষায় সম্ভবত আপার ইনসিজর বলে ওগুলোকে।

ঘটনা ১৯৯২-এর মে মাসের দিকের। টিফিন পিরিয়ডে চোর-পুলিশ খেলছিলাম সব ছেলেরা। পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্লাইড/স্লিপারের উপর উঠে বসলাম আমরা কয়জন। আমি একদম উপরে, পেছনে আরেক সহপাঠী। আচমকা পুলিশি আক্রমণে পড়লো আমাদের সেফ-হাউস। পেছন থেকে পুলিশ এগিয়ে আসতে দেখে আমরা পিছলে নেমে পড়তে গেলাম। আগেই তো বলেছি মনে হয়, আমরা তখন নিজের মনে উঠতি হিরো সবাই। আমজনতার থেকে নিজেদের পৃথক করার অদম্য বাসনা আমাদের। পুচ্ছে পিছলে তো মেয়ে থেকে মানুষ পর্যন্ত সবাই-ই নামে, ঐ কাজ কি হিরোর করা সাজে? আমি উলটো হয়ে নামতে থাকলাম। আজকে যাকে ডগি স্টাইল বলে বর্ণনা দিয়ে নিজেই হাসি, সেদিন সেটাই খুব নায়কোচিত ছিল আমার কাছে। আমি নেমে যেতেই উঠে এল আমার পরের জন, তার পেছন পেছন পুলিশ। আমি যদি হিরো হয়ে থাকি তো আমার বন্ধুটি ছিল সুপার-হিরো। আমি তবু উলটো হয়ে পিছলে নামছিলাম, ঐ বান্দা নিঃসঙ্কোচে লাফ দিলেন চূঁড়া থেকে। রিফ্লেক্স থেকেই মাথা সরিয়ে নিলাম ডান দিকে, বন্ধু আমার পড়লো

আমার ঘাড়ের উপর, আমার মুখ গিয়ে বাড়ি খেল স্টিলের রডে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেলাম পাশ দিয়ে। শিউরে ওঠার কিছু নেই। গল্প এটুকু হলে আমিও দুঃখ পেতাম। আজওসেই দিনের কথা মনে করে হাসার কারণ ভিন্ন। সেই পর্বে আসি।

৩.

পড়ে যাবার পর মাথা কেমন যেন ঝাঁ ঝাঁ করছিল। কোন অনুভূতি ছিল না। ব্যাথা নেই, বেদনা নেই, শুধু মুখের ভেতর কেমন যেন আরামদায়ক একউষ্ণতা। খেয়াল করে দেখলাম নীল শার্ট ভিজে লাল হয়ে আছে। মুখে হাত দিয়ে টের পেলাম দাঁত দুটো একটু নড়বড়ে। কোন অনুভূতি ছাড়াই একে একে খুলে এল দুটোই। দৃশ্যমান অংশের আড়ালে দাঁতের বাকি দুই-তৃতীয়াংশ প্রথম দেখলাম। না, গল্প এখানেও শেষ না।

ফার্স্ট বয় হওয়ার সুবাদে ক্লাসসেরা সুন্দরীর পাশে বসবার সুযোগ হয়েছিল আমার। শিক্ষকেরা নিজেরা জোড়া বেঁধে বসাতেন ছেলে-মেয়েদের। ছাত্র হিসেবে যেমনই হই না কেন, আমার খোমাখানা বর্তমানের চেয়ে খুব একটা উন্নত ছিল না। সুন্দরীর সাথ পেলেও সঙ্গ অধরাই থেকে গিয়েছিল। দাঁত পড়বার পর কোন অজানা থেকে আচমকা সেই সুন্দরীর উদয় হল। হাত ধরে বললো, ‘ তোমার দাঁত পড়ে গেছে?’ আমার স্তম্ভিত চোখ থেকে হ্যাঁ-সূচক জবাব ধরে নিলো। এরপর চললো অমৃতবর্ষণ। দাঁত নাকি কাকের চোখে পড়ে গেলে আরউঠে না। আমার দাঁত অতি-সত্বর ইঁদুরের গর্তে গলিয়ে দিতে হবে। চাইবার আগেই দিয়ে দিলাম দাঁতগুলো। হাওয়া থেকে উদয় হওয়া কন্যা হাওয়ায়ই যেন মিলিয়ে গেল। পাশ থেকে একবন্ধু এসে বললো, ‘ এই, তোর তো দুধ-দাঁত আগেই পড়ে গেছে, এখন কী করবি?’ আমি তখন সপ্তম স্বর্গে, এসব প্যাঁচালে কান দিলাম না।

ক্লাস শেষ হতে হতে ব্যাথা উঠে গেল। ছুটির পর নানার গাড়ির ড্রাইভার ভেতরে এসে দেখলো রক্তভেজা শার্টে বসে কাঁদছি। দ্রুত তুলে নিয়ে গেল বাসায়। মায়ের হইচই -পর্ব পার করে ডাক্তারের কাছে যাওয়া হল। ডাক্তার বলে দিলেন, ঘন্টা তিনেক পর্যন্ত রক্ত গরম থাকে। এর মাঝেই দাঁত দুটো আনতে হবে।

দৌড়-ঝাঁপ দিয়ে সবাই মিলে স্কুলে ফিরলাম। পুরো মাঠ চষে মাত্র একটা দাঁত পাওয়া গেল। অতঃপর নকল ডেনচার পরে আমার দিনাতিপাত শুরু। সেই দিনের পর আরসেই স্কুলে যাওয়া হয়নি। যেটুকু সময় ছিলাম, তাতেও সুন্দরীর সাথে আর সাক্ষাৎ হয়নি। হয়তো কোনদিন পথে এক সুন্দরীর সাথে দেখা হবে। হয়তো তার আবর্জনার বাক্সে কোণাভাঙা ছোট্ট একটা দাঁত পাওয়া যাবে। আমি হয়তো তখন তাকে ভড়কে দিয়ে সবজান্তার মত তার গোপন কথা বলে দেবো। সবশেষে চিচিং ফাঁক বলে আমি আমার নকল দাঁত দেখাবো। নাহ, বয়সটা অনেক হয়ে গেছে। ছেলেমানুষীর দায় একবার মিটিয়েই খায়েশ মিটে গেছে।

# আমার বাবা

**এস এম মাহবুব মুর্শেদ**

---

সম্পাদকের বক্তব্য হচ্ছে সাধারন মানুষের ছোটবেলা নিয়ে একটা বই করবেন। সেসুত্রে আমার প্রতি সমন এসেছে আমার ছোটবেলা থেকে ঘটনা লিখতে খানিক।

একজন আমার-আপনার মত সাধারন মানুষ যার শৈশব আমার-আপনার মতই খানিকটা রঙ্গীন আলোয়, খানিকটা ক্লেশে, খানিকটা আনন্দে, খানিকটা বিরহে কেটেছে - সেটা পড়ে আপনি কি পাবেন? কেন বইটা মানুষ পড়বে? ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই উত্তর পেলাম। পাঠক লেখকের দর্পনে দেখবেন নিজেকে। কোন কোন ঘটনা পড়তে পড়তে হেসে উঠবেন - আরে এতো আমারই ছোটবেলা। কোন কোন ঘটনা পড়তে পড়তে অবাক হয়ে বলবেন - আরে এরকম ছোটবেলাও হয় মানুষের!

বইটা কেন তৈরী হচ্ছে সেটার উত্তর পাবার পর একটু আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম বাবাকে নিয়ে লেখা যায়। লোকটা বড়ই অবহেলিত। আমার আপনার জীবনে এই লোকটার অবদান কি কম? অথচ আমাদের সবার থেকে যোজন যোজন দুরত্বে বাস করেন লোকটা।

আমার কাছে বাবা ছিলেন শাসন আরনিয়ম কানুনের একপ্রতিমূর্তি। ছোটবেলা থেকে হাজারো টু-ডু ঝুলিয়ে রাখতেন, প্রতিটা কাজে বিধিনিষেধের বেড়াজালে জড়িয়ে রাখতেন আমার বাবা। তাই সবসময় একটা দুরত্ব, একটা শ্রদ্ধা মেশানো ভয় ছিল তার প্রতি।

আমেরিকা এসে ইচ্ছেমতো ঘুরছি। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করবার পর থেকেই বাবার শাসন ব্যাপারটা ছিল না ঠিকই, কিন্তু বিভিন্ন রকম আপত্তি করত। সেটা ছিল না এখানে তাই স্বাধীনভাবে ঘুরতাম। এরকমই একবার ঘুরতে গেলাম স্যান ফ্রান্সিসকো। ফেরার পথে টানা ১২ ঘন্টার ড্রাইভ। আমি আরগাইজার ভাই পাল্টা-পাল্টি করে গাড়ি চালাচ্ছি আর গল্প-স্বল্প করছি। কথা প্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করলেন পরিবারের কথা, বাবার কথা। কথায় কথায় বাবার প্রতি যে একটা ক্ষোভ ছিল সেটা বেরিয়ে এল। স্বাধীনতা দেননি, প্রতিটা কাজে খবরদারী করেছেন এরকম একেরপর এক অভিযোগ করছি - হঠাৎ গাইজার ভাই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন - তার জন্যই তুমি এতদূর এসেছ। আমি একটু থতমত খেয়ে চুপ হয়ে গেলাম। তারপর বাকিটা রাস্তা এনিয়ে ভেবে আবিষ্কার করেছি আসলেই তার অবদান কতটুকু!

বাবার চাকরী ছিল বদলীর। বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম এরকম সারাদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। আমাদের পড়াশুনার ক্ষতি হবে ভেবে কখনো আমাদের ঢাকার বাইরে নেননি। একবার কি মনে করে বগুড়া শহরে নিয়ে গেলেন আমাদের। ছোট্ট শান্ত একটা শহর ছিল বগুড়া তখন। অনেক ভোরে বাবা আমাদের ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতেন পাশের একটা ছিমছাম হোটেলে চমৎকার রুটি-ভাজির নাস্তা করাতে। তখনও বাসায় হাড়ি পাতিল কেনা হয় নি - সবে মাত্র একটা বাসা ভাড়া করে উঠেছি আমরা। সাত-রাস্তার মোড়ের দোকানগুলেতে প্রায়ই যেতাম ঘুরতে। আমাদের বাড়িওয়ালার বড় ছেলেটা হাওয়াইন গীটার বাজিয়ে শোনাত আরআমি মনে মনে খুব চাইতাম গীটার বাজানো শিখতে। তখন বোধহয় আমি ক্লাস ত্রিতে পড়ি। পড়াশোনার ভাল ব্যবস্থা হবে না দেখেই বোধহয় আমাদের আবার ঢাকা পাঠিয়ে দিলেন আব্বা। বছরের পর বছর প্রায় সপ্তাহে আব্বাকে দেখেছি ঢাকায় আসতেন আবার সপ্তাহ শেষে বিদায়।

আমার স্বভাব ছিল সবসময়ই একটুকরো বরফের মত, বাইরে রাখলেই গলে পানি। উপমা ঠিক হলো না। বরফের মত আমি বিভিন্ন বিষয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেই ঠিকই কিন্তু গলে যাওয়া পানির মত ওয়ার্থলেস সেটা না। বরং আমি বরাবর

বাঁদরেরই মত, একডালে থেকে আরেক ডালে লাফাই। তবে কোন গাছের ডাল পছন্দ হলে পরে অনেকক্ষন ঝুলেও থাকি।

এই বাঁদর ঝোলা অভ্যেসের কারনে আমার খুব সহজে একেকটা নেশা গড়ে উঠে। বাঁদর যেমন পরিনতি চিন্তা না করে একডাল থেকে আরেক ডালে ঝাঁপিয়ে যায়, শূণ্যে লাফ দেয়, চিঁ চিঁ করে উল্লাস করে তেমনই আমিও কখনও গপ্পের বই, কখনো স্ট্যাম্প সংগ্রহ, কখনো মুদ্রা সংগ্রহ, কখনো নারী সংগ্রহ (অনেক পরে, বড় হয়ে যাবার পর 😜) এসবে মেতে উঠতাম।

আমার নেশা দেখে বাবা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। ক্লাস টুতে পড়তে সাত্তার কাকা শিশু কিনে দিলেন। সেই শিশু এতবার পড়ে ফেললাম যে প্রায় মুখস্ত হয়ে গেল। পরে প্রতি মাসের একতারিখে সেই চাচুকে জ্বালিয়ে মারতাম শিশু না আনলে। শেষে বাধ্য হয়ে আম্মা সেগুলো কিনে আনত

নেশা বাড়তে বাড়তে, শিশু ছাড়িয়ে রূপকথা, কমিকস, ভুত প্রেত, টারজান, তিন গোয়েন্দা, কিশোর ক্লাসিক, মাসুদ রানা পর্যন্ত এসেছি তখন। ক্লাস ফাইভ সিক্সে পড়ি বোধহয়। একখালা বেড়াতে এসেছেন গ্রামের বাড়ি থেকে। তিনি অনেক রাতে উঠে দেখলেন আমি মুখ গুঁজে কি যেন পড়ছি। হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দেখলেন মাসুদ রানা, উপরে সুন্দরী ললনার ছবি। ব্যস আরযায় কই সকালে উঠেই আব্বাকে জানানো হল। আব্বার করলেন কি কড়া করে একটা ধমক দিলেন, তারপর আমার বুকশেলফের সব বই জড়ো করা শুরু করলেন পোড়াবেন বলে। ব্যাস আমার কান্না দেখে কে? আমার আত্মা ছিল বইগুলো তখন। অনেক করে হাতে পায়ে ধরে, আরপড়বো না দোহাই দিয়ে রেহাই পেয়েছিলাম সেবার।

আব্বার এভাবে অনেকবার আমার সেই বাঁদর ঝোলা স্বভাবকে সামলে আমাকে ফোকাস করতে সাহায্য করেছেন। পঞ্চম শ্রেনীর বৃত্তি পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেনীর বৃত্তি পরীক্ষার, মেট্রিক পরীক্ষা বা যে কোন পরীক্ষার সময় পাশে এসে বসে থাকতেন। আমরা দুভাই পড়ছি। পাশে আব্বা বসে বসে সরু রীমের চশমার পড়ে বই পড়ছেন। মাঝে মাঝে আম্মা রান্না বান্না শেষ করে এসে বসতেন। তখন বিরক্ত লাগত, এখন বুঝি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেগুলো আমাদের জন্য।

আমার মনে আছে, মাঝে মাঝে ঈদে বাসার সবার জন্য কাপড় যোগাড় করা কষ্ট হয়ে যেত। একবার মনে আছে, বাসায় প্রচুর আত্মীয় স্বজন। সবাইকে কাপড় দিতে গিয়ে আব্বার অবস্থা বেশ খারাপ। নিজে কিছু নিলেন না। কিন্তু আমাদের দু-সেট জামার আব্দার ঠিকই পুরোন করলেন। কতবার ঈদে দেখেছি আমরা নতুন জামা, নতুন স্যান্ডেল, এমন কি নতুন টুপি, জাঙ্গিয়া পরে দুভাই বেরিয়েছি, আব্বা বেরিয়েছেন পুরোনো একটা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে। খুশী মনেই আমাদের সাথে ঈদের জামাতে যেতেন আরনামাজ শেষে দাদীর জন্য হাউমাউ করে কাঁদতেন।

আব্বা সব ঝামেলা খুব ঠান্ডা মাথায় ট্যাকল করেন। খুব খুব ঠান্ডা মাথায়। অনেকগুলো উদাহরন দেয়া যায়। কিন্তু আমি শুধু একটা দেবো। আমার ছোট ভাইকে বেশ আপসএন্ড ডাউনেসর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। আব্বার কেয়ারফুল অবজারভেশন স্বত্তেও সে ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে খানিকটা দুষ্টু হয়ে যায়। ফলে মেট্রিকে ভাল করতে পারেনি। আরইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষার সময় একটা প্রেম করে বসে। সেই মেয়েও সম বয়সী। ফলস্বরুপ দুজনেই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় খারাপ করে বসে। মেয়ের বাবা একজনডক্টরেট, তিনি ব্যাপারটা জানতে পেরে মেয়ের জন্য একজায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা করেন। কৈশোরের আবেগ ঠেকাতে না পেরে এরা দুজন পালিয়ে চলে যায় আমাদের নানা বাড়িতে।

আব্বা জানতে পেরে তাদের কাছে যান, কথা বলেন এবং তাদেরকে রাজি করান এই বলে যে তাদের সর্ম্পক থাকুক, আরো সময় যাক, আমার ছোট ভাই প্রতিষ্ঠিত হোক তারপর পারিবারিক ভাবেই সবকিছু হবে। আমি তখন উত্তেজিত - পরিবারের মান ইজ্জত বলে কথা, পারলে তখনই আমার ভাইকে বাড়ি থেকে বের করে দেই, ধরে মার দেই। আমি তখন বুয়েটে পড়ি, ইজ্জতের মামলা হয়ে গেল ব্যপারটা। আব্বা আমাকে শান্ত করলেন। ওদের নিয়ে আসলেন, মেয়ের বাবাকে খবর দিলেন যাতে মেয়েকে নিয়ে যায়। মেয়ের বাবা মেয়েকে নিতে এসে করলেন এক কান্ড - তিনি সবার সামনে পারলে আমার ভাইকে মারেন, আব্বাকে অপমান করলেন, মেয়েকে মারা শুরু করলেন। তবু আব্বা কিছু বলেননি। লোকজন জড়ো হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আমার ছোট ভাই মেয়েকে তার হাত ছুটিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল। আরচরম সেই নাটকের সময় আমি বাসায় ছিলাম না।

পুরো ব্যাপারটা কেঁচে ফেলার পর মেয়ের বাবা তখন পুলিশে রিপোর্ট করাতে গেলেন। শেষ মেষ আমার আব্বা মেয়েদের আত্মীয়ের সাথে অনেক আলাপ আলোচনা শেষে ঠিক করলেন এদের বিয়ে দিয়ে দেবেন। অনেকে ছিঃ ছিঃ শুরু করলেন, অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। আমি পর্যন্ত তাদের সাথে কথা বলিনি দুবছরের বেশী। কিন্তু আব্বা অনেক অনেক দূর পর্যন্ত, অনেক অনেক উদার ভাবে ভাবতে পেরেছিলেন বলেই এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। আমার ছোটভাই কম্পিউটার সায়েন্স থেকে ব্যাচেলর করে, ইয়ং ওয়ান কোম্পানী চাকুরী করে এবং পাশাপাশি ম্যানেজম্যান্টে মার্স্টাস করছে। তারা এক সন্তানের জনক। আর আমার ভাইয়ের স্ত্রী এখন হোম ইকনমিক্সে ব্যাচেলর করছে।

আমি যখন বিয়ে করে আমেরিকায় চলে আসি তখন আমার স্ত্রী ঢাকায় ছিল মাস ছয়েকের মতো। তখন তাকে মানসিক সাপোর্ট দেয়া, ঠিক কোন সময়ে সে মন খারাপ করে বসে থাকে সেটা দেখে তার মন ভালো করার ব্যবস্থা করা, কিংবা চাকুরী করার সিদ্ধান্ত নিলে তাকে সবরকমের সহায়তা করা সব কিছুতেই বাবা সাহায্য করেছে তাকে। নইলে নতুন পরিবেশে আমি ছাড়া মানিয়ে নেয়া অসম্ভব হতো তার জন্য।

বাবার এত অবদানের পরও বাবার কাছে গেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকি। বাবা ফোন করলে কেমন আছিস জিজ্ঞেস করে মাকে ফোন দিয়ে দেয়। কিন্তু শুধু ওই একটা প্রশ্নেই বাবার উদ্বেগটা আমাকে ছুঁয়ে যায়। ঈদ উপলক্ষে মা যখন আমার জন্য জিনিষপত্র পাঠাবেন বলে প্যাক করতে থাকেন তখন বাবা ছুটে গিয়ে কিনে আনেন একটা পাঞ্জাবী। তার খোকা মাকে বলেছে পাঞ্জাবী পড়বে না, তাতে কি খোকার ঈদের দিন একটা পাঞ্জাবী পরবে না তা কি হয়? যে খোকাকে কোলে করে ঘুম পাড়ানী গান শুনাতেন, অসুখ হলে স্বামী-স্ত্রী মিলে উদ্বিগ্ন হয়ে নামাজ পড়ে কাঁদতেন; গভীর রাতে ঘুমাতে না পেরে ছেলের মঙ্গল কামনায় হাউমাউ করে কাঁদতেন; সে খোকা আজ দূরে বসে তাকে ফোন করতে ভুল যায় তো কি হয়েছে। সে তো তার সেই খোকাই। তার কবরের পাশে সেই খোকাইতো গান গেয়ে শোনাবে, "খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে..."

*(এই লেখায় বাবার কথা শুধু বলেছি বলে মা রাগ করতে পারেন। মাকে বলি, তোমার মত মা-বাবা আমি পেয়েছি এ আমার পূর্বজন্মের সাধানাই হয়ত। বাবার মত তোমারও অনেক অবদান মাগো। সেটা অন্য কোন লেখায় আসবে হয়ত। )*

## অবাক বিশ্বজোড়া

### নিষাত তিথি

---

মা সারাদিন একলা এত কাজ করেন, আর আমি ব্যস্ত থাকি নিজের কাজে। "তুই কি এতই উদাসী?নিজের মা'কে একটু সাহায্য করতে পারিস না?" চার বছর বয়সে বিবেকের এই চরম প্রশ্নে উদ্বিগ্ন আমি অতঃপর মা'কে সাহায্য করার প্রথম প্রকল্প হিসেবে বাসার সবার কাপড় ধুয়ে ফেলব বলে ঠিক করলাম। সেই হিসেবে ধোয়া না-ধোয়া, কিছু আয়রন করা কাপড়সহ সমস্ত কাপড় টেনে বাথরুম পর্যন্ত এনে বালতির পানিতে চুবানো হলো। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, শুধু কাপড় কেন, জুতোগুলোও ধুয়ে ফেলি। ওই সময়ে বাসায় আরো কিছু অতিথি ছিলেন, তাদেরসহ যত জুতা পেলাম, নিয়ে এসে একই বালতিতে জুতা এবং জামা চুবালাম ইচ্ছামত। জুতা এবং জামার এই অপূর্ব মিলন থেকেই বুঝা যায় আমি শিশুকাল থেকেই কতটা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী। এই ঘটনার পরে আমার যেটা লাভ হলো যে আমি কখনো মা'কে সাহায্য করতে গেলেই মা বলতেন, "থাক মা, তুমি দূরে থাকো, তাইলেই হবে।"

একটু বড় হতেই, সম্ভবত প্রাইমারী ক্লাসে থাকতে নিজের জন্য একটা টেবিল পেলাম। সেই টেবিল আর চেয়ারটাই আমার জগৎ হয়ে গেলো। সারাদিন টেবিল-চেয়ারে বসে থাকতাম, সে পড়ার জন্যই হোক কি অন্য কিছু। আমার খুব স্বভাব ছিলো কাগজ কাটাকুটি করার। কেটে কেটে টুকরো করে কি সব বানাতাম। টেবিলে চাপড় দিয়ে আরওনানানভাবে শব্দ করতাম খুব, আর খুব জোরে জোরে কথা বলতাম। এত বেশি চেঁচাতাম যে প্রায়ই গলা বসে থাকতো। কাগজের প্রতি কি যে এক নেশা ছিলো আমার, কাগজ দেখলেই ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করতো, সকালের খবরের কাগজে নাক ডুবিয়ে গন্ধ নিতে নিতে কেমন নেশা ধরে যেতো। এরপর কাগজ টুকরো করে খেতে শুরুও করলাম। এক সময় দেখি আমার সমস্ত খাতার সব পাতার কোনা থেকে ছেঁড়া।

কাগজের নেশা থেকেই বইয়ের নেশা ধরেছিলো কিনা জানি না। বুঝে না বুঝে যা সামনে পেতাম, পড়তাম। খবরের কাগজ তো পড়তামই। ইত্তেফাক রাখা হতো বাসায়, টারজান কার্টুন আর ঝকমকে ছবিওয়ালা সিনেমার পাতাও খুব প্রিয় ছিলো। বাবা একদিন হঠাৎ অন্য একটা পেপার নিয়ে এলেন। একদম সাদামাটা, টারজান নেই, সিনেমার বিজ্ঞাপন নেই, আমার এবং আমার বোনদের খুব মন খারাপ হলো। কিন্তু অল্পদিনের এই সাদামাটা পত্রিকাটাই কেমন করে যেন আমাদের "জান" হয়ে গেলো। এই পত্রিকাটার খুব বড় একটা ভূমিকা বোধহয় আছে আমার ছোটবেলা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত, তাই ঘটা করে বলছি। তার নাম, "ভোরের কাগজ"। "ভোরের কাগজ" থেকে সংক্ষেপে "ভোকা"। খুব জনপ্রিয় ছিলো না বোধহয়, কিন্তু একটু আধটু কোথাও ভোকার নাম দেখলে-শুনলেই আমরা বোনেরা চেঁচিয়ে উঠতাম।

স্কুল আর স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে অসাধারণ সবুজ দিনগুলোর কথা যদি কানাকড়িও ভাবি, বাকি ছেলেবেলার সব স্মৃতি একদম মাঠে মারা যায়। বরং ওদের যত্নে তুলে রাখাই ভালো। ক্লাস সিক্সের একটা কথা অবশ্য কিবোর্ডে জোর করে উঠে এলো - প্রথম প্রেমপত্র পাওয়া। কোচিং ক্লাসে অতি লাজুক এক ছেলে ঈদের কার্ড দিলো আমাকে। কার্ডের ওপরে বড় বড় করে হৃদয়ের ছবি। ভেতরে, রুবেল+তিথি। প্রথম লাইন, "I love you more than i can say.." এই পর্যন্ত পড়ে আমার কি হলো, আমি ওই কার্ড কুচি কুচি করে ছিঁড়ে বেঞ্চ-এ মাথা গুঁজে কাঁদতে শুরু করলাম। মনের ভাবটা এরকম যে, এত খারাপ একটা ঘটনা ঘটলো আমার জীবনে।এখন মনে হলে এত মেজাজ খারাপ হয়, প্রথম প্রেমপত্র, একটা ব্যপার আছে না? কেন যে পড়লাম না পুরাটা? সেদিন আমার

কান্নাকাটিতে পুরা ক্লাস ঘটনা জেনে গেলো এবং পরের দিন কারো কুমন্ত্রণায় স্যার রুবেল বেচারাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বেত দিয়ে এমন মার দিলো।

স্কুলের তুলনায় কলেজের সময়টা অনেক দ্রুতগতির। কেমন কেমন জানি উদাস উদাস সময় ছিলো সেটা। ষোলো থেকে সতেরো-আঠারোর দিকে এগুতে এগুতে দেখি সব শুধু কেমন বিষন্ন লাগে। গান শুনতাম বোধহয় জন্মাবার পর থেকেই কিন্তু কলেজের সময়ে সেই শোনাটা অন্য মোড় নিলো। অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। শুনলাম মহীনের ঘোড়াগুলি,"ধাঁধার থেকেও জটিল তুমি",সারাটা দিন এই গান গাইতাম। অথবা অঞ্জন-নীমা-পরশপাথরের "গানে গানে ভালোবাসা"র..."সুজন আমার ঘরে তবু আইলো না"।

ভেতরে ভেতরে ভীষন অস্থির মনটা তখন কৈশোর ছেড়ে যাবার জন্য কেমন তাড়াহুড়া শুরু করে দিলো। কবে বড় হব? আসল বড়। একটা বই পড়লাম তখন, মৈত্রেয়ী দেবীর "ন হণ্যতে"। একটা জায়গায় এসে থমকে গেলাম। মৈত্রেয়ী দেবীকে বলা রবি কবির কিছু কথা একদম গেঁথে গেলো আমার ভেতর। "অমৃতা তোমার বয়স অল্প। মনটাকে নিয়ে এত নাড়াচাড়া করো না, সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। মনটা স্বচ্ছ কাকচক্ষু সরোবরের মতো স্থির রাখ, তার নিচে বহুদূর গভীরতা, কিন্তু এখনই তাকে চঞ্চল করে উত্তাল করার দরকার নেই-শান্ত হয়ে থাক। সে মনে বাইরের নানা ছায়া পড়বে, সহজভাবে তাকে গ্রহন কর; সেই যে আমি লিখেছি - 'সত্যরে লও সহজে' - তোমার নিজের ভিতরে যে মাধুরীলতা আমি, দূরে নেমে যাবে তার মূল, তার উপরে ফুল ফুটবে। অপেক্ষা কর। " সেই থেকে এত বেশি স্থির হলো আমার মন যে, কৈশোর পেরিয়ে প্রথম প্রেমে পড়ার সাড়ে তিন বছরের আগে আমার শান্ত মন আমাকে ঘটনা বুঝতেই দিলো না।

পরিশিষ্টঃ আমি ছোটকাল থেকেই অতি বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী ছিলাম। বয়স যখন পাঁচ তখন একদিন কোন এক মাহিন্দ্রক্ষনে চোখ বুঝে গালে হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আজথেকে বিশ বছর পরে বেগতিক টাইপের গোঁয়ার এক লোক আমাকে নানারকম হুমকিধামকি দিয়ে ছেলেবেলার কথা লিখতে বলবে। আমি তক্ষুনি চোখ খুলে, গাঁ ঝাড়া দিয়ে বসে বললাম, "রে বেগতিক, তুই ভেবেছিস কি? হুট করে লিখতে বলে আমাকে চমকে দিবি?! এত আস্পর্ধা! নে, আমি আজথেকেই লেখালিখি শুরু করলাম। মু হি হি হি হি। " ব্যস, এখনও চলছে গুরু/সেই থেকে পাঁচ থেকে শুরু।

# খাবি দাবি কলকলাবি

**নূরুল হাসান (কনফুসিয়াস )**

---

পেট দেখে ইদানিং আমাকে পেটুক বলে চেনা গেলেও, ছেলেবেলায় কিন্তু আমি এরকম ছিলাম না। এরকম, মানে যে পেটুক ছিলাম না, ব্যাপারটা তা নয়। সেটা ছিলাম ঠিকই, তবে পেটের আকৃতি তখনো দ্রষ্টব্য কিছু হয়ে ওঠে নি আমার।

বাসায় আমার যন্ত্রণায় বিস্কুট চানাচুর ঠিক জায়গায় রাখবার উপায় ছিলো না। নানা জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হতো। তবে কিছুতেই আমাকে দমিয়ে রাখা যেত না। আমি খুঁজে টুজে বের করে, তাদের সবচেয়ে সঠিক জায়গায়, মানে আমার পেটের ভেতরে নির্দ্বিধায় চালান করে দিতাম। মাঝে মাঝে দু'একপদের বিস্কুট যদিওবা লুকিয়ে রাখতে পারতো, কিন্তু আমিও তক্কে তক্কে থাকতাম। মেহমান বাসায় এলেই আমি খুশিতে বাগডুম। এ বারতো লুকোনো বিস্কুট বের করতে হবেই! এবং তাই হতো। মেহমানদের দেবার জন্যে লুকোনো ভান্ডার থেকে বের করা হতো সেসব। আরআমি শুধু ঘড়ি দেখতাম কখন তারা বিদায় নেবে। এবং যখন সত্যিই ওরা চলে যেত, বিস্কুট চানাচুর আবারো লুকোবার আগেই আক্ষরিক অর্থেই ঝাপিয়ে পড়তাম সেসবের উপরে।

এই খাদ্যপ্রীতি যে কেবল নিজের বাসায় বলবৎ ছিলো তা নয়। পরিচিত আত্মীয়দের বাসায় যাবার ব্যাপারেও আমি বাছ-বিচার চালাতাম। কোন বাসায় গেলে কোন মানের বিস্কুট খেতে দিবে, মনে মনে সে বিষয়ে আমার জরিপ চালানো হয়ে গিয়েছিলো বহু আগেই। তাই বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনলে আমি আগে সেটা মিলিয়ে নিতাম, পূর্ব ইতিহাস সন্তোষজনক হলেই কেবল 'যাবো' বলে মত দিতাম। নইলে, আমাকে ধরে বেঁধেও কেউ ওখানে নিয়ে যেতে পারতো না!

সেই সময় সুপার বিস্কুট নামের একপ্রকার বিস্কুটের খুব প্রচলন ছিলো। আকারে ছোট, গোল গোল, স্বাদে মাঝামাঝি, সর্বোপরি দাম কম এবং প্লেটে রাখলে একসাথে 'অনেক' বিস্কুটের একটা দৃষ্টিঘটিত আবেদন ছিল তার, কিন্তু আমার খেতে একদমইভাল লাগতো না।
তো ঘটনা হচ্ছে, আমাদের আত্মীয় পরিধির একটা বাসায় এই বিস্কুটের খুব চল ছিলো। ছোট ছিলাম বিধায় নানুর সাথে তাঁর আঙুল ধরে আমাকে আত্মীয়দের বাসায় বিচরণ করতে হতো। নানা স্বাদের নানা বিস্কুটের অমোঘ আকর্ষণে আমার সেসব বাসায় যেতে খারাপ লাগতো না অবশ্যই। কিন্তু সেই সুপার বিস্কুট-অলা বাসার প্রতি আমার খানিকটা বিরাগ ছিলো। একদিন বা দুদিন নয়, এরকম বেশ কয়েকদিন হলো যে ওখানে গেলাম আরআমাকে খেতে দেয়া হলো সুপার বিস্কুট। আমি সেগুলোর ওপরে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বসে থাকি। সেই আত্মীয়দের নিদারুন নির্মমতায় আমি অবাক আরপীড়িত হই, খানিকটা ভাল মানের বিস্কিটও এরা আনতে পারে না!

তেমনি একদিন, সেই সুপার বিস্কুট-অলা বাসায় অনেকক্ষণ কাটিয়ে দেবার পর, আমার মন ততক্ষণে তিতিবিরক্ত। বেশ কয়েকবার নানুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়ার পরে বিদায় নিবো যখন, তখন সে বাড়ির লোকজন বিদায় সম্ভাষন জানালো আমাদের। পিচ্চি ছিলাম বিধায়, কেউ একজনআমার থুতনিতে আদরকরে বললো, আবার এসো আমাদের বাসায়।

এই কথা শুনে আমার মনের ভেতর জমা অভিমান খানিকটা উস্কে উঠলো। আমি কি ভেবে সরোষে বলে উঠলাম, নাহ, আপনাদের বাসায় আর আসবো না।
নানু অবাক। এবং ওই বাসার বাকি সবাইও। জিজ্ঞেস করলো, কেন কেন?
আমি তৎক্ষনাৎ বোম ফাটালাম, কেন আসবো? এলেই খালি সুপার বিস্কুট খেতে দ্যান! ভাল বিস্কুট দিতে পারেন না?

পরবর্তী সময়ে কি হয়েছিল জানি না। অপ্রস্তুত ভঙিতে খানিকটা হাসাহাসির কথা মনে পড়ে।
কিন্তু আমার সেই অগ্নুৎপাত সেই বাড়ির বহুদিনের সুপার বিস্কুটীয় ঐতিহ্য ভাঙতে পেরেছিলো কিনা এতদিন পরে আজ আর সে কথা মনে নেই।

## প্রকৃতি প্রেমিকের ছেলেবেলা

**প্রকৃতি প্রেমিক**

---

ছেলেবেলার স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে সবচেয়ে পুরানো যে স্মৃতি মনে পড়ছে তা হরিপদ'র ছেলের সাথে আমার ঘুড়ি ওড়ানো শেখার পাঠ। হরিপদ কে ছিল তা আজমনে নেই। তবে মনে আছে গাইবান্ধা শহরের মাঝখান দিয়ে যে রেললাইন চলে গিয়েছে তার আশেপাশেই ছিল ডাকবাংলো। এর সাথে লাগানো রাস্তায় শামীম ট্রডার্স এর গুদামঘর। তার পিছনেই বিশাল পুকুর, পুকুরের একপাশে আরেকটা বড় রাস্তা। সেখানেই ডাক বাংলো। হরিপদ'র ছেলে এক আঁটি শিন্টা (পাটখড়ি) একটা লম্বা কাঠির চারপাশে জড়িয়ে অদ্ভুত উপায়ে বানাত লাটাই। আরঘরে বানানো কাগজের ঘুড়ি নিয়ে সেই পুকুর পাড়ে দৌড়াদৌড়ির স্মৃতিই আমার সবচেয়ে পুরাতন স্মৃতি। শামীম ট্রেডার্সের পিছনে থোকায় থোকায় কলা গাছ, তার গোড়ায় শামুকের বাস। বৃষ্টিবাদলে সেখান থেকে বড় বড় শামুক উঠে আসতগুদামের বারান্দা অবধি। পুকুরের চারধারে আগাছার জঙ্গল। সেই আগাছার নরম ডাল সুতার মত গিঁট দিয়ে মাঝখানে একটুকানি ফাঁকা রেখে তার মধ্যে ভাঙা ডালের রস ভরে ফু দিলেই ছোট ছোট বেলুন হয়ে উড়ে যেত। সেই আগাছায় থাকত সবুজ রঙের এক ধরনের পোকা। কে কার আগে পোকাহীন আগাছা খুঁজে পাবে তা-ই ছিল এক ধরনের খেলা। একদিন সন্ধ্যায় পুকুরের অপরপাশে ঢালু পাড় বেয়ে নেমে এসে দেখি বাদামী রঙের খলসে মাছ একদমনাগালের মধ্যে। ধরতে গেলাম আরসুরুৎ করে পালিয়ে গেল।

নিয়ম ছিল দুপুরে ঘুমানোর। বাসার পিছনেই ছিল কেক তৈরীর কারখানা। ঘুম থেকে উঠে এক টাকা দিয়ে দুটা পানকেক কিনে আনা হতো। পানপাতা আকৃতির কেক বলে নাম পানকেক। সেটা দিয়ে হতো বিকেলের নাস্তা। বাসা থেকে অনতিদূরে ছিল বিস্কুট তৈরীর কারখানা। সেই কারখানার মালিককে সম্ভবত বিস্কুট মিয়া বলে ডাকা হতো। তার ছেলের ছিল ট্রাই-সাইকেল। আমাদের কোন ট্রাই-সাইকেল ছিলনা। সে নিয়ে অনেক কষ্ট মনে ছিল। কিন্তু কোনদিনই সাইকেল কেনার আব্দার করতে পারিনি।

আশির দশকের একেবারে গোড়ার দিকে বাবার বদলীর কারণে তখনকার বিআরটিসি বাসে করে বগুড়া শহরে আসা। মালতীনগরের একটা বাসায় শুরু হল আমাদের নতুন জীবন। বাড়ির কাছেই এসপি বাংলো। তর পিছন দিয়ে বয়ে যাওয়া করতোয়া নদীর পাড় আমার ছেলেবেলার দিনগুলোকে আরো মধুর করে তুলল। বিকেলের খেলা থেকে শুরু করে আদুরীর বাপের পিছে পিছে বড়শি দিয়ে মাছ ধরা দেখা, ঘুড়ি ওড়ানো দেখা, লালুকে গোসল করতে নেয়া, কিংবা মায়ের সাথে রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এই নদীর পাড়ই ছিল আমার লুকানোর একমাত্র স্থান।

ছোটবেলায় মায়ের শাসনেই আমাদের বেড়ে ওঠা। বাবা কদাচিৎ পড়ালেখার খোঁজ নিতেন। আযিযুল হক কলেজে শিক্ষকতা আরলেখালেখিতেই তাঁর সময় কাটতে বেশী। তবে অলিখিত কিছু নিয়ম ছিল, যেমন আসরের আযান পড়ার আগে বাসা থেকে বের হওয়া যাবে না আরমাগরেব এর আযানের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে। অনেক বড় হওয়া অব্দি এই নিয়ম চালু ছিল।

আমাদের বাসাটি ছিল রাস্তার পাশে। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা, একটু দূরে প্রধান গেট। ভেতরে দুইটি উঠান। পাশে উঁচু বারান্দাওয়ালা আমাদের ঘর। আনকোরা শহরে তারচেয়েও আনকোরা স্কুলে শুরু হল আমার পড়ালেখার হাতে খড়ি। আমার লেখাপড়ার বয়স থেকে স্কুল মাত্র এক বছরের বড়। আমার আরআমার বোনের ভর্তি পরীক্ষা হল। বোন একটা প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই পারছেনা। অনেক অনুনয় বিনয় করলেও আমি তাকে বলে দেইনি। অবশেষে আমার পা ধরতে চাইল; তাতেও আমার মন গলেনি। কেনই বা গলবে, মা বলেছেন পরীক্ষার সময় কাউকে

কিছু না বলতে। সম্ভবত আম্মার হাত ধরে স্কুলে প্রথম আসা। স্পস্ট মনে আছে প্রথম দিনেই স্কুলে দেরি হয়েছিল। দেখি এ্যসেমব্লী শুরু হয়ে গিয়েছে। লাইন করে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, পিটি শুরু হবে। মা আমাকে প্রথম শ্রেণীর ছেলেদের লাইনের শেষে আরবোনকে মেয়েদের লাইনের শেষে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপরের কথা কিছু মনে নেই।

স্কুলের মাঝখানে ছিল ঘাসবিহীন একটা ছোট মাঠ। সেখানেই খেলাধূলা যা কিছু চলত। একপাশে দালানে ক্লসরুম, অপরপাশের চাটাই ঘেরা সাময়িক ক্লাসরুম। সেখানে বেঞ্চিতে বসে মহানবী আরসেই বুড়ি-- যিনি তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতেন সেই গল্প পড়া হতো। বছর শেষে ফাইনাল পরীক্ষায় একটা পরীক্ষা ছিল পিটি পরীক্ষা। পিটি মানে কি তা কখোনই কেউ বলেনি। শুধু বুঝতাম শরীরচর্চার মত একটা পরীক্ষা। সেদিন স্কুলের পোষাক হতে হবে ঝকঝকে পরিস্কার আরহাতের নখ কাটা থাকতে হবে। আমাদের বাসায় তখন ইস্ত্রি ছিলনা। আগেরদিন কাপড় ধূয়ে লন্ড্রীতে দেয়া হয়েছিল এই শর্তে যে পরেরদিন সকাল ৬টা বা সাড়ে ৬টার মধ্যেই ফেরত দিতে হবে। কারণ পরীক্ষা শুরু হবে সেই সাত সকালে। পরীক্ষার দিনে সকাল বেলা সেই লন্ড্রির দোকানের সামনে গিয়ে মায়ের সাথে বসে আছি, কিন্তু দোকান খোলার নাম নেই। ধাক্কাধাক্কির পরেও যখন কেউ সাড়াশব্দটি করছেনা, তখন পাশের বাসা থেকে একজনবের হয়ে দোকানদারের বাড়ির ঠিকানা দিলেন। আমরা তার বাড়িতে গিয়ে বেচারার ঘুম ভাঙিয়ে তারপর সেই ইস্ত্রি করার কাপড় পড়ে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম।

স্কুলে আমার প্রিয় ম্যাডাম ছিলেন হুদা ম্যাডাম। একদিন বাড়ির বাইরের ফাঁকা জায়গার কাদামাটি নিয়ে খেলা করছিলাম। এমন সময় হুদা ম্যাডামের ছেলে এলেন। ম্যাডাম আমার জন্য উপহার পাঠিয়েছেন। শিয়াল পন্ডিতের পাঠশালা আরসুন্দরবনের মানুষখেকো। আমি কাদামাটি ছেড়ে লজ্জার সাথে বই দুটি নিলাম। ভেতরে সুন্দর হাতে লেখা-- পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করার জন্য উপহার। সুন্দরবনের মানুষখেকোর গল্প আরশিয়ালপন্ডিতের পাঠশালায় আমার সময় কেটে যেত। স্কুলের হেডস্যার ছিলেন মেরাজ উদ্দিন। অত্যন্ত আদর্শবান এই শিক্ষক পড়াতেন ইংরেজী। হর্নস অফ এ ডিলেমা'র গল্পটা তাঁর কাছেই প্রথম শোনা। ক্লাসে তিনি আমাদের পড়ার পাশাপাশি শেখাতেন ডিসিপ্লিন, জীবনের লক্ষ্য, এসব। বেঞ্চে কেউ এলোমেলো ভাবে বসলেই তিনি বলতেন সোজা হয়ে পিঠ টান করে বসার উপকারিতার কথা।

রশ্মি ম্যাডাম ছিলেন সবচেয়ে আতংকের। পড়ালেখার জন্য নয় অন্য কারণে। স্কুলের নিয়ম ছিল সবাইকে টিফিন আনতে হবে। নয়তো টিফিন পিরিয়ডে কেউ খাবে কেউ খাবেনা- তা ভাল দেখায়না। আমাদের কোন টিফিন বক্স ছিলনা। ছিল মোটামুটি বড় একটা ঔষধের কৌটা। সেটার মধ্যে মাঝপিরিয়ডে খালু দিয়ে যেতেন বেকারীর বিস্কুট। ব্যাপারটা রশ্মি ম্যাডামের পছন্দ ছিলনা। এখন ঠিক মনে করতে পারিনা কোন ব্যাপারটি তার অপছন্দের ছিল-- টিফিন বক্সে করে টিফিন না আনা, নাকি দেরী করে টিফিন পৌছানো।

প্রাইমারি স্কুলে আমার প্রিয় বন্ধু ছিল শামীম। চানমারি ঘাটের কাছে তাদের বাসা। চানমারি ঘাটে ছিল শশ্মান ঘাট। যেখানে মৃতদেহ পোড়ানো হতো। শামীমের বাসায় একদিন সরিষার তেল দিয়ে মাখা মুড়ি খেয়েছিলাম মনে পড়ে। শমশের স্যারের বাসাও ছিল ওদের বাসার কাছে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতের ওঠার সময় বগুড়া জেলা স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দেই। পরে শুনেছি বারটার সময় ঘড়ির ঘন্টা, মিনিট আরসেকেন্ডের কাঁটা কোথায় অবস্থান করে তা লিখতে পারলে হয়তো ভর্তি হওয়া যেত। যাহোক পরবর্তীতে উপরের ক্লাসে এই স্কুলে পড়ার সুযোগ হয়েছিল।

ছোটবেলার ঈদ মানেই সীমাহীন আনন্দ। ঈদের আগের রাতে প্রচুর পটকা আরআতশবাজি ফোটানো হতো। ঈদের দিনে নামাজ শেষে নতুন জামা-জুতো পড়ে প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতাম আরশেমাই খেতাম। মনে আছে ঈদ উপলক্ষেই কেবল পেপসি অথবা ফান্টা মিলত। প্রতি বোতলের দাম তিন কি সাড়ে তিন টাকা ছিল। আমাদের বাড়ির আশেপাশে বেশ বড় একটা এলাকাজুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। মালতীনগরের সবচেয়ে বড় পুজা মন্ডপ ছিল

আমাদের বাড়ির একদমকাছে। প্রতীমা তৈরীর সময় থেকে ডুবানো পর্যন্ত সারাক্ষণই সেখানে ঘুরঘুর করতাম। প্রথমে বাঁশের কাঠির উপর খড় দিয়ে পেঁচিয়ে মানুষের আকৃতি দেয়া হতো। তারপর দিনে দিনে তাতে মাটির প্রলেপ দিয়ে কারিগর নিপূণভাবে তৈরী করতেন দেবী দূর্গা। পুজার মেলা থেকে মাটির তৈরী নানা ধরনের জিনিস যেমন, ঘোড়া, নৌকা, পুতুল এসব কেনা হতো। মন্ডা খাজা আরজিলেপি ছিল অমৃতের মত।

শহর থেকে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে নিভৃত পল্লীতে আমার দাদা বাড়ি। ছেলেবেলার সবচেয়ে আনন্দের সময়টা কাটত এখানে। প্রতি বছরই ধানের কাটামারির সময় দাদায় বাড়ি যাওয়া হত। কিছু পথ রিক্সায়, কিছুটা গাড়িতে, বাকি পথ কখনো নৌকায় আরশুকনার দিনে টমটমে চড়ে যাওয়া হত। চেলোপাড়ায় মধুমিতা হলের একটু ওপাড় থেকে ছাড়ত তৈবরের ঘোড়া-টানা টমটম। আহা কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। স্কুল ছুটি। একমাসের জন্য কোন পড়াশুনা নাই সেই চিন্তা করতেই মনটা ভরে উঠত। কিন্তু তারপরও মাকে বুঝ দেবার জন্য কিছু বই সাথে করে আনতে হতো। কিন্তু কোনোবারেই সে বই খুলে পড়া হতোনা। একবার টমটমে যাওয়ার সময় সন্ধ্যা হয় হয় করছে। গ্রামের উপর ধোঁয়ার আবরণ পড়ে গেছে। এমন সময় কি একটা কারণে তৈবরের ঘোড়া ধরমর করে পড়ে যায় রাস্তার উপর। তার একটু আগেই ক্ষেতের পাশ দিয়ে একটা বাগদাস যেতে দেখেছিলাম। টমটম উল্টে না গেলেও সবাই ছিটকে মাটিতে পড়ে যায়। পরে দেখা গেল ইঁদুর বা অন্যকিছু রাস্তার মধ্যে গর্ত করে রেখেছে, আরঘোড়ার পা সেই গর্তে পড়েই বিপত্তি।

আমার সমবয়সী চাচাতো ভাই আর গ্রামের আর সকলে মিলে সারাদিন খেলায় মেতে থাকতাম। বাড়ির সামনে বহুদিনের পুরানো একটা গাব গাছটা আজো আছে। কতদিনের পুরানো তা কেউই বলতে পারেনা। আমার দাদার ভাই যিনি প্রায় শত বছর বেঁচে ছিলেন তার কাছে শুনেছি-- এই গাছ এখন যেমনটি দেখা যাচ্ছে, তিনিও তাঁর ছোটবেলায় এমনটিই দেখেছেন। গৃষ্মে ভরদুপুরে গাব-তলাতেই ছায়া মিলত। আরতার নিচেই চলত হা-ডু-ডু খেলা। কখনো বা গাছের উপর উঠে বসে থাকতাম। চাচাত ভাইদের মত গাছ বাইতে পারতামনা। আমি ডালে উঠলে ওরা উঠত পাতায় পাতায়। খেলা শেষে ক্লান্ত শরীর জিরাতে ডুবতে হত পাশের নদীতে। বাঙ্গালি নদীর একটা প্রশাখা বয়ে গেছে গ্রামের পাশ দিয়ে। ধানের ক্ষেতের আইলদিয়ে অনেকখানি হেঁটে তারপর খালের মত সেই নদী। সবাই পাকা সাঁতারু কেবল আমি ছাড়া। তারা অভয় দিত, আরআমি যতটা গেলে বুক অব্দি পানি হয়, তার বেশী কখনোই যেতামনা। সাঁতার শেখার অনেক চেষ্টা করেও কোন লাভ হয়নি। অথচ গ্রামের ছেলেমেয়েরা নাকি হওয়ার পরেই সাঁতার শেখে!

গোসল শেষে কড়া রোদে গামছা পড়ে মাথার উপরে লুঙ্গিটা ঘুড়ির মত তুলে ধরতাম। বাড়ি ফেরার পথে বাতাসে তা শুকিয়ে যেত। দুপুরে পান্তাভাতের সাথে তরকারি অমৃতের মত লাগত। দাদা মারা গিয়েছেন কবে তা স্মরণ নেই। দাদী আছেন। চাচা-চাচীরা অসম্ভব আদরকরতেন। ফলে দাদাবাড়িতে ছিল সীমাহীন স্বাধীনতা। গাব তলার পাশেই ছিল বিশাল খেলার মাঠ। সেখানে এক কোণে প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের ছেলেরা বলত প্রাইমারি স্কুল। কিন্তু আমার প্রাইমারি শুনতে কেমন যেন ছোট-ছোট লাগত। মনে হত প্রাথমিক বিদ্যালয় একটু উন্নত মানের। সেই স্কুলের পাশেই ছিল সরদারদের আরা। গ্রাম্য ভাষায় আরা মানে বাঁশঝাড়। সেখানে বাস করত নানা ধরনের নানা সাইজের ভুত-পেত্নী। দিনে-দুপুরে ওদিকে সহজে কেউ যেতনা। কথিত আছে দিনের বেলায় সেখানে নাকি শুকর শুয়ে থাকে। আমার কৌতূহলি মনে আরো কৌতূহল জাগত। ইচ্ছে হত গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু কেউই সাথে যেতে রাজী হতনা। আরার মাঝদিয়ে চলে গেছে রাস্তা। সন্ধ্যার পরে ওই রাস্তা নিতান্ত দরকার না হলে কেউ মাড়াতনা।

সন্ধ্যায় শুরু হত গল্পের আসর হক ভাই তার হাজারো গল্পের ঝুলি মেলে দিতেন আমাদের সামনে। রাজা রানীর গল্পের সাথে অনেক প্রাপ্তবয়স্ক গল্পও ছিল তার ঝুলিতে। তিনি অবলীলায় তা আমাদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে ধাঁধার খেলা চলত। আমার ধাঁধাগুলো হত গাণিতিক অথবা ইংরেজী সংক্রান্ত, ফলে প্রায়ই তারা সেগুলোর কোন কিনারা করতে পারতনা। অপরদিকে তাদের অনেক ধাঁধা আমি বুঝতেই পারতামনা।

প্রাইমারির গন্ডি পেরিয়ে একসময় হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। বিশাল স্কুল, শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে। স্কুলের দেয়ালে সুন্দর সুন্দর বাণী লেখা। বাইরে থেকে পড়া যায় "শেখার জন্য এস, সেবার জন্য বেরিয়ে যাও"। আরভিতরের দিকে লেখা "শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব অর্জন"। আ্যসেম্বলির সময় সবচেয়ে ভাল লাগত জাতীয় সংগীত। খুবই উন্নতমানের সাউন্ড সিস্টেম দিয়ে বাজানো হত রেকর্ড করা জাতীয় সংগীত। এত সুন্দর সুর আর কন্ঠের মাধুর্যে আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যেত। আমরা রেকর্ডের সাথে সাথে গাইতাম। কখনো কখনো জাতীয় সঙ্গীতের পর বিশেষ ভাষণ হত।

পুবের পাখি বাসা বেঁধে থাকে মলয় দ্বীপের চন্দন বনে.... ষষ্ঠ শ্রেনীর বাংলা দ্রুতপঠনের একটা গল্পের প্রথম লাইন-- কেন যেন ভাল লেগে গেল। কিন্তু এই ভাল লাগা বেশিদিন সইলনা। রুবি ম্যাডাম আমাদের বিজ্ঞান পড়াতেন। কী যে পড়াতেন তার কিছুই বুঝতাম না। এসো নিজে করি ধরনের অনুশীলনী দিয়ে বই ভরা। কিন্তু পড়া না পারলে খবর আছে। একটা কথা চালু ছিল-- রুবি ম্যাডামের একটা চোখ নাকি পাথরের। আমি অনেকদিন তাকিয়ে থেকে দেখার চেষ্টা করেছি কথাটি আসলেই সত্যি কী-না। হয়তো ভীষণ কড়া মেজাজের বলেই এমনটি মনে হতো।

হাইস্কুলে চিত্ত আমার কোনদিনই ভয়শূন্য ছিলনা। ছিলনা উচ্চে আমার শির। স্কুলের বারান্দায় স্যারদের দেখতাম ডোরাকাটা বেত নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। শোনা যেত এই বেতগুলোতে রাতের বেলা তেল দিয়ে রাখা হয়। আমার বুঝে আসতনা বেতে তেল দেয়ার মাহাত্ব কী। জগদীশ বাবু আমাদের গণিত পড়াতেন। সেদিন তিনি কী মনে করে বাড়ির কাজ করা হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করছেন। সবাই দাঁড়িয়ে খাতা দেখাচ্ছে, উনি ক্ষেত্র বিশেষে একটা বা দুইটা করে বেতের বাড়ি মারছেন আরকয়েকটা উপদেশ দিচ্ছেন। আমার কাছে এসে খাতার পাতা উল্টিয়ে দেখলেন। আমি কি মনে করে একটা অংক বেশী করেছিলাম যেটা বাড়ির কাজ হিসেবে তিনি দেননি। এইতো খুঁত একটা পেলেন। আমি বললাম, "ভেবেছিলাম এটাও বাড়ির কাজে ছিল"। উত্তর শুনে শপাং করে বেতের একটা বাড়ি মেরে বললেন, 'এত ভাবো ক্যান?'।

হাই স্যার নামে আমাদের একস্যার ছিলেন। উনি পাশের ক্লাসে এলে আমরা ভয়ে থাকতাম কখন মার শুরু হবে এই দুশ্চিন্তায়। উনি মারতেন হাত দিয়ে। ভয়াবহ নাকি সেই দৃশ্য। ভাগ্যিস আমরা অন্য সেকশনে ছিলাম। কী একবিচিত্র কারণে হেডস্যারকে বলা হত ঠেলা গাড়ি। আরআমাদের ক্লাস টিচার মোখলেসুর রহমান স্যারকে বলা হত রেডিও। বাংলার ক্লাসে নিয়ম ছিল বই থেকে রিডিং পড়া। একজনশুরু করত। তার শেষ হলেই শিক্ষক নাকি সুরে বলতেন, 'নেঁ.....ক্সট'। তখন পরেরজন বই নিয়ে দাঁড়িয়ে যেত। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, "কী নাম?"... "বাঁড়ি কোথায়?".... "আঁব্বা কী করে?"...."মাঁ?"... একই প্রশ্ন উনি প্রত্যেকজনকে করতেন।

স্কুলে মিলন নামে আমার এক বন্ধু ছিল। তার সাথে আমার ভীষণ ভাব। সেই মিলনের সাথে একদিন কি নিয়ে যেন রাগারাগি হল। সে আমাকে হুমকি দিল ছুটির পর আমাকে পেটাবে। আমি কিল খেয়ে কিল হজম করার মানুষ; কাউকেই কিছু বললামনা। খুবই ভয় লাগছিল, শেষমেষ সত্যিই যদি পেটায়! আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে তার শীর্ণ হাতের মাসল ফুলাচ্ছে আরআঙ্গুলে শান দিচ্ছে। ওই আঙ্গুল দিয়েই নাকি আজআমার চোখ তোলা হবে। আমি ভয়ে এতটুকু হয়ে যাই। পরের ক্লাসগুলোতে একদম মন বসছেনা। কী একটা অজানা ভয়ে আমি গুটিশুটি মেরে রইলাম। একসময় ছুটি হল। আমি সব ছাত্রের ভীরে হারিয়ে কোনরকমে পালিয়ে সেযাত্রা রেহাই পেলাম। আজঅনেকদিন পরে ভাবি, আহা স্কুল পালানো কাকে বলে তা যদি জানতাম! জানলে মিলনের ভয়েই হয়তো স্কুল থেকে পালিয়ে যেতাম।

## এপার ওপার. . .

**ফারুক হাসান**

---

১.

গভীর রাতে শীতের বিছানা ভিজিয়ে ঘুম ভেঙ্গে দেখি আমার পাশে অজানা-অচেনা এক লোক শুয়ে আছে। মাথার পাশে টেবিলে রাখা টিমটিমে দোয়াতের আলোয় আরো দেখি- লোকটার গা ঘেষে শুয়ে আছে হাতেম কাকা। তারও পাশে আরেকজন অচেনা মানুষ।

এই গভীর রাতে পাঁচ-ছ' বছর বয়সী আমার বালক মন হঠাত এক গভীর ভয়ে আচ্ছন্ন হয় যায়।

ভাত খাইয়ে, হিসু করিয়ে মাথায় মাফলার বেঁধে মা আমাকে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিল লেপের তলায়, দোয়াতটা মাথার কাছে রেখে। ফুফাতো ভাই খোরশেদ পড়ছিলো। খেয়ে দেয়ে তার শুতে আসবার তখনও অনেকটা দেরি। যাবার আগে মা বলল, 'তুই ঘুমা। পরে এসে আবার বাইরে নিয়ে যাবো।'

বাইরে মানে বাথরুম করতে যাওয়া। মাঝখানে একবার হিসু না করে আসলে বিছানা ভিজাবো নির্ঘাত। শীতের রাতে এই কান্ড করলে ভেজা লেপ-কাঁথা নিয়ে আর ঘুম হবে না।

মা আর আসে নি।

মনে হচ্ছে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। খোরশেদ ভাইকেও দেখছি না। হয়তো তাকে জমিতে পানি দেয় যে মেশিন, সেই ঘরে শুতে হয়েছে। চারদিক শুনশান। দোয়াতের পলতে শুকিয়ে গেছে, তেল শেষ। যে কোনো মুহুর্তে নিভে যেতে পারে। ভেজা শরীর নিয়ে, ভেজা লেপ গায়ে দিয়ে আমি ঠকঠক করে কাঁপতে থাকি। শীতে, তার চেয়ে বেশি ভয়ে।
মাঝখানে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, হাতেম কাকা মুখ ভর্তি চূড়ান্ত রকমের দাড়ি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

*'কিরে, দিছিস তো বিছানায় মুইতা।'* হাতেম কাকা হাসেন।
আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠি। *'কাকা, কখন আসলেন?'*
*'রাইতে আইছি।'*

হাতেম কাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়েন, রাজনীতি করেন। যখন পলিটিক্সে গ্যান্জাম লাগে, হয়তো মারামারি কিংবা থানাপুলিশ, তখন মাঝে মাঝে গভীর রাতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাড়িতে চলে আসেন। কাকাকে আমার ভাল লাগে। তার বন্ধুদেরকেও। সবাই এত মজা করে! আবার লুকিয়ে থাকে। দাদার ভয়ে।

দাদা পলিটিক্সের প-ও সহ্য করেন না। ধর্মপ্রাণ, গম্ভীর দাদা যখন শুনেন যে হাতেম কাকা ঢাকা থেকে এসেছে, তখন তার কপালে চিন্তার রেখা ফোটে, ওজনদার একটা 'হুম' মেরে থমকে যান।

দাদী গোপনে বাইরের ঘরে খাবার পাঠায়। হাতেম কাকা তার বন্ধুদের নিয়ে সারাক্ষণ ওই ঘরে শুয়ে বসে থাকে, বিড়ি ফুঁকে আর মাঝে মাঝে দুনিয়া কাঁপানো হাসির ঢেউ তোলে। আমি গিয়ে বসে থাকি। ঝর্ণা আর রোকেয়া ফুফু দরজার আড়ালে দাড়িয়ে সেই হাসি শোনে, তারাওহাসে মিটিমিটি ।

প্রতি ঈদে দাদার বাড়ি যাওয়া একদম ধরাবাধা। সেবার ঈদে আমার বড় চাচাও দিনাজপুর থেকে আসেন। বড় চাচী এত বকবক করেন যে, দাদা পর্যন্ত বলেন, ' ও শান্তার মা, তুমি এত কথা যে কও! '
চাচী দাদার পাতে ভুড়ুঙ্গা মাছের মাথা তুলে দিতে দিতে মুখটিপে হাসেন আর বলেন, ' কী করবো আব্বাজান, কথা না কইলে কি ভালো লাগে? '
ঈদের আগের দিন রাতে আমার মা- চাচী মিলে ঘুমন্ত হাতেম কাকার গোঁফ কেটে ফেলার বুদ্ধি আঁটেন। হাতেম কাকা অপারেশনের ঠিক আগ মুহূর্তে কুচক্রীদের ধরে ফেললেও রফা হয়, দাড়ি- গোঁফের একটা ছবি তুলে রেখে তারপর কাটা হবে।

সেবার ঈদে আর সব জামা কাপড়ের পাশে হাতেম কাকা আমাকে দুইটা বই উপহার দেন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা ভবেশ রায়ের ছোটোদের বই। বানান করে করে আমি সেই বই পড়ি, আর আমার ফুফুরা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খায়।

২.
মাঝে মাঝেই দাদা এসে আমাকে গ্রামে নিয়ে যান। তখন মা মৃদু নালিশ করার চেষ্ঠা করেন বাবার কাছে। ছেলের পড়াশোনা আছে, খাওয়া দাওয়ার কি হবে, এইসব। দাদা পাত্তা দেন না। দাদার হাত ধরে লঞ্চে করে যমুনা পার হই। তারপর হেটে এই গ্রাম ঐ গ্রাম করে এক সময় বাড়ির কাছে চলে আসি। দাদা হাটতে হাটতে আমাকে বলেন, ' ক তো, কোনটা আমাদের বাড়ি? '

আমি আঙ্গুল তুলে তখনও অনেক দূরে, ধান ক্ষেতের বিশাল চরার ওপারে আমাদের পাশের বাড়ির মোহনদের দেবদারু গাছ দেখিয়ে বলি, ' ঐ যে, দাদা' ।

মাগরিবের ওয়াক্ত পার হয়ে যায়। দাদা আমাকে এক গ্রামের মসজিদের কলপারে দাড় করিয়ে রেখে নামাজ পড়তে যান। আমি কালো চাদরের মত নামতে থাকা অন্ধকারে একা দাড়িয়ে থাকি; মসজিদের দেউরির কয়েকটা পোরা ইট, তিন- চার জোড়া স্যান্ডেল, এক জোড়া খড়ম আর একটা ভাঙ্গা বদনা আমাকে সাহস জোগায়- পাশের একটা কবরস্থানের আগরবাতির ধোয়ার মত ধুমায়মান ভয় এসে লাগে, ওপাশের একটা ঝোপে হয়তো লুকিয়ে থাকা পেত্নীর আবির্ভাব হতে হতেও হয়না। অবশেষে এক সময় দাদার নামাজ পড়া শেষ হয়, এক সময় আমরা বাড়ি পৌছি।
দাদী আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হন। বলেন, ' আইছস! ' ।রাতেই পিঠা বানান। মুঠো পিঠা, দুধের পিঠা, মাঝে মাঝে কুলি পিঠা। সকালে উঠে দেখি, দাদা কোরাণ শরীফ পড়ছেন, বিশাল উঠোনের ওপাশে তখন কামলারা গোয়ালঘর থেকে গরু বের করছে, খোরশেদ ভাই সাত সকালে গোসল করে টুপি, পান্জাবি, লুঙ্গি পড়ে হাতে বই নিয়ে বাংলাবাজার মাদ্রাসায় পড়তে যাচ্ছে। গোলাপ কাকার ঘরে পড়াশোনার তোড়জোড়।
কিছুক্ষণ পর দাদা সকালের নাস্তা করেন। যবের ছাতু, গুড় আর দুধ। আমি বসে যাই, ' দাদা, আমিও ছাতু খামু! '

গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত দাদার ছাতু ছাড়া চলে না। দাদা নিজে যবের চাষ করেন, দাদী নিজের হাতে সেই যব ঢেকিতে পিষে ছাতু বানান। বছরে একবার।

বিকালে দাদা তার বড় নাতীকে নিয়ে ঘুরতে বের হন। 'এই জমিতে হাল দেওন লাগবো, ঐ জমিতে ধান ভালো হইছে, আর ওইটাতে পাট। এইবার এই ক্ষেতে মরিচ লাগামু, ঐ যে পরপর কয়টা ধানি জমি, সব কয়টা আমাদের।' - এই সব কথা হয়, দাদা বলেন, আমি শুনি।

রাতেও দাদার সাথে শুতে হয়। প্রতিরাতে দাদার গল্প শুনি। কাদের জ্বিলানীর গল্প, শেখ সাদীর গল্প।
একদিন আব্বা আমাকে নিতে আসেন। মা পাঠিয়েছেন।
এদিকে দাদী বলেন, ও হাসমত, তোর পোলা থাক না আর কয় দিন। দাদা কিছু বলেন না।

আব্বা যমুনার এপার-ওপার দু' পারে ছেলের জন্য বিছিয়ে থাকা স্নেহের কোন পারে ছেলেকে নিয়ে ভিড়াবেন, তা ভাবেন।
কদিন আমি আবার যমুনা পেরোই।

৩.
সুঠামদেহী গোলাপ কাকা একবার একাই এক চোর ধরে ফেললেন। ভাইদের মধ্যে সবার ছোটো গোলাপ কাকা দারুণ ভলিবল খেলোয়াড়, গায়ে ভীষণ শক্তি, সব কাজে পাঁকা। চোর এসেছিলো তিনজন। দক্ষিণদুয়ারি ঘরভর্তি তখন শুকনা মরিচের পালা আর পাট। সেই পাট কিংবা মরিচ চুরি করতেই এসেছিলো তারা। গোলাপ কাকার আফসোস, বাকী দুটাকে ধরা গেল না।

পাশ টাশ করে গোলাপ কাকা সাবইন্সপেক্টরের চাকরিতে ইন্টারভিউ দিলেন। আব্বা ছুটলেন কাকে কত ঘুষ দিলে ছোটোভাইয়ের চাকরী নিশ্চিত হবে তা বের করতে। ফজলি আম গাছের বড় ডালে বিশাল দড়ি বেধে গোলাপ কাকা প্র্যাকটিস শুরু করলেন। মিনিটে দুইবার উঠেন, নামেন। কিন্তু চাকরিটা হয় না।

হাতেম কাকা পাশের কলেজে চাকরী পেয়ে গেলে তার বিয়ে নিয়ে তোড়জোড় শুরু হলো। হাজার খানেক মেয়ে দেখে ঠিক হলো, ছাতারকান্দি গ্রামে বিয়ে হবে। বর্ষাকাল বলে নৌকা করে বরযাত্রা। নৌকায় বরবেশে হাতেম কাকা আসন গেড়ে বসেন, গোলাপ কাকার উপর পুরা ভ্রমণের দায়িত্ব, আব্বা-বড় চাচা দাদার সাথে। জনা পঞ্চাশেক বরযাত্রী। আর একটা ডাউস ব্যাগ, সবাই বলে বউয়ের জন্য লেদার, আর পাশে মিস্টির হাড়ি যার দায়িত্ব খোরশেদ ভাইয়ের উপর। আমাকে সারা রাস্তায় কাকার সাথে থাকতে হয়। নৌকার গলুইয়ে বসে আমার খুব আনন্দ হয়, একটা বিয়ে চারদিকে কেমন অদ্ভুত আনন্দরেণু ছড়িয়ে দেয়! আশেপাশের ছোটো ছোটো দ্বীপের মত বাড়িগুলো থেকে বউ-ঝি-মেয়ের দল উত্সুক নয়নে বরযাত্রা দেখে। কোনো কোনো পুরুষ গলা বাড়িয়ে জিঙ্গাসা করে, 'কোন গ্রামে বিয়া গো?'
নৌকা থেকে জবাব যায়, 'ছাতারকান্দি, ছাতারকান্দি।'

বিয়ে বাড়িতে একটা কান্ড হয়। খোরশেদ ভাই আমাকে নিয়ে ভেতর বাড়িতে মিস্টির হাড়ি দিতে যান। হাতেম কাকার হবুশ্বাশুড়ি তার মেয়ের হবুশ্বাশুড়ির কাছে থেকে আসা প্রথম প্যাকেটটা খুলতেই মিস্টির বদলে একটা কোলা ব্যাঙ্ লাফ দিয়ে পড়ে।

আগে পরে ঝর্ণা ফুফু, রোকেয়া ফুফু সবার একে একে বিয়ে হয়ে যায়। খোরশেদ ভাইয়ের আর মৌলানা হয়ে উঠা হয় না। গোলাপ কাকা সরকারি স্কুলে শিক্ষকের চাকরীতে ঢুকেন। তার বেতের ভয়ে ক্লাসের সব ছাত্র জড়োসড়ো হতে থাকে। আমার বার্ষিক পরীক্ষার নম্বর বছর বছর ২০১, ৩৪৫, ৩৯৮ ঘুরে প্রাইমারি বৃত্তির যোগ্যতা অর্জন করে ।

তখন ছুটি কম। তবু নিয়ম করে প্রতি ঈদে দাদার বাড়ি যাওয়া হয়। যমুনার এপার ওপার করি বর্ষায়, শীতে, আম কাঠালের ছুটিতে।
তারপরও মাঝে মাঝে দাদা এসে মাকে বলে, ' ফেরদৌসি, ওরে নিয়া যাই। থাকুক কয়দিন খামারপাড়া আইসা। '

মা যুক্তি দেখায়, ওর স্কুল তো খোলা, সরকারি স্কুল, ছুটি তো নাই।

এভাবেই আমার ছেলেবেলা বছরের পর বছর আদরমমতা-স্নেহের একনদী হয়ে বয়ে চলে। আরসেই স্নেহনদীর দুই পারে থাকে দুই বাড়ি। একবার দাদার কূল ভেঙ্গে মা এপারে আমার জন্য মাতৃবাত্সল্যের ঘর বাধে, তারপর দাদা এসে আমাকে ওপারের গল্প শোনায়, জোর করে ওপারের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়, সেও রক্তঘটিত কি এক বাত্সল্যের বলে।

আমি কেবল এপার-ওপার করি।

## পাজেল

**বিপ্লব রহমান**

---

*(আহ! এতটা বয়স পেরিয়ে এলাম, তবু কি জানলাম, চড়ুইয়ের ঠোঁটে কেনো এতো তীক্ষ্ণা ...?.)*

এক ছোট বেলায় একবার মা'র সঙ্গে নানু বাড়ি যাচ্ছি ট্রেনে চেপে। নানু বাড়ি হচ্ছে সিরাজগঞ্জ সদরে। তো ফুলবাড়ি রেল স্টেশন থেকে কয়লার স্টিম ইঞ্জিনের ট্রেন ছাড়ে। বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত সারারাত দীর্ঘ জার্নি। সেই প্রথম ট্রেনে চড়া। আমি ট্রেনে বসেই জানালা দখল করে বসি। আমার পাশে মা। তিনি উলের কাঁটায় অবিরাম কি যেনো একটা বুনে চলেছেন।

আমি জানালা দিয়ে মাথা উঁচু করে দেখি ফিকে বিকেলে একেকটি নগর, গ্রাম, গাছপালা, গরুর পালসহ রাখাল বালক -- সবকিছু কি আশ্চর্য দ্রুততায় দৌড়ে দৌড়ে পেছনে চলে যায়। ...

আমি মাকে জিগেষ করি, মা, ওরা সবাই দৌড়ে পেছনে যায় কেনো? কেনো সামনে যায় না? শুনে মা হাসেন। আমাকে সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের নানান কথা ব্যাখা করে বলেন।

বেতের বাক্স থেকে একটি কমলা লেবু হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেন, বাবু, জানালা দিয়ে অতোটা বাইরে ঝুঁকো না। ট্রেনের ধোঁয়ার সঙ্গে উড়তে থাকা কয়লার গুঁড়ো এসে চোখে পড়বে!

নাম না জানা ছোট্ট একটি স্টেশনে ট্রেন থামতে জানালার ছোট্ট খোপ দিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখি মফস্ফলের মানুষ, গঞ্জের মানুষ, নানান গন্তব্যের মানুষ আরহরেক রকম হকারকুল। আমার অবশ্য সবচেয়ে নজর কাড়ে কচি কলাপাতা রঙের পোষাক পরা বন্দুক হাতে একদললোক। ট্রেনের যাত্রীদের প্রতি তাদের সতর্ক দৃষ্টি।

আবারো প্রশ্ন, আবারো কৌতুহল। মা বলেন, ওরা হচ্ছে রক্ষী বাহিনী! বাবু, অতোটা বাইরে ঝুঁকো না। চোখে কয়লার গুঁড়ো এসে পড়বে। ...

তিনি খানিকটা ত্রস্ত হয়ে আমাকে জানালা থেকে সরিয়ে বসাতে চান। গোঁয়ার আমি সরে আসি না। একঝাঁক সশস্ত্র টিয়ে পাখির মতো সুশৃঙ্খল রক্ষী বাহিনী দেখি; মনে মনে আউড়াতে থাকি, রক্ষী বাহিনী, রক্ষী বাহিনী, রক্ষী বাহিনী। ...

ট্রেন চলতে শুরু করলে একজনউটকো যাত্রী বিড়ি খাবেন তাই মাকে বলে আমাকে জানালার পাশ থেকে সরাতে চান। আমি তা - ও সরে আসি না। মা জোর করলে আমার চোখে পানি চলে আসে। বয়স্ক মতোন লোকটি অপ্রস্তুত হন। বলেন, থাক মা, ও ছেলে মানুষ।

আমি তখনো টিয়ের ঝাঁক রক্ষী বাহিনী খুঁজে বেড়াই। ...

দুই. ভোরের দিকে বাহাদুরাবাদে এসে ট্রেন থামে। চিড়িয়াখানায় দেখা, ছবির বইয়ে দেখা বিশাল অজগরের মতো কুঁ ঝিক ঝিক ট্রেনের ড্রাইভার নীল উর্দিতে কি স্মার্ট! লাফিয়ে ইঞ্জিন রুম থেকে নেমে পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে মা'র সঙ্গে দু - একটা কথা সারেন।

আমাকে বলেন, বাবু, তোমাকে নিয়ে একবার ইঞ্জিন - বগিতে করে আমি ঘুরবো; তুমি রাজী তো? আমি তো খুশীতে আটখানা। কাকু, তুমি কবে আমাকে নিয়ে ঘুরবে? আমি তখুনি বায়না ধরি, ইঞ্জিন রুমে চেপে বসার।

মা আমাকে যমুনার বুকে ভাসমান রূপকথার ময়ুরপক্ষী নায়ে চড়ার লোভ দেখান। বলেন, সোনামনি, দুষ্টুমি করো না। আমরা এখন ইস্টিমারে চড়ে তোমার নানুর বাড়ি যাবো। তুমি ইস্টিমার দেখবে না?

কান্না চেপে মায়ের হাত ধরে আমি সেই প্রথম প্যাডেল - ইস্টিমারে চড়ে সিরাজগঞ্জে নানু বাড়ি যাত্রা করি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, বড় হয়ে ট্রেন ড্রাইভার হবো!

ইস্টিমারের সুবিশাল জানালা ঘেরা কেবিন আমাকে টানে না। আমার মন পড়ে থাকে কুঁ ঝিক ঝিক ট্রেনের ইঞ্জিনে।

ঝকঝকে যমুনায় তখন উথালপাতাল টেউ। বাদামের খোলার মতোন নৌকা ভেসে ভেসে চলে। হুশহাশ করে অনেক দূরে পানি থেকে মাথা উঁচু করেই আবার নদীতে ডুব দেয় কালো কালো কি সব জিনিষ।

মা মন ভাল করার জন্য আমার সঙ্গে গল্প জোড়েন। বলেন, ওই দেখো বাবু, ওগুলো হচ্ছে শুশুক; একধরনের জলজ প্রাণী। বলেন, ওরা নাকি ছবির বইয়ে দেখা ডলফিনেরই একধরণের ছোট প্রজাতি। শুশুক হচ্ছে জেলেদের আপদ-বিপদের বন্ধু। নদীতে ঝড় আসার আগে ওরাই নাকি লেজ নেড়ে নেড়ে জেলে নৌকাগুলোকে সতর্ক করে দেয়।

কেবিনের জানালা দিয়ে ভেসে আসে লাল সালুর লুঙ্গী পরা দোতরা হাতে একবাউলের আকুতি, মা, আমাকে একবেলা খাবারের টাকা দেবেন? আপনার খোকাকে গান শোনাবো।

হাতব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিলে বাউল গান ধরেন। মূহুর্তে তাকে ঘিরে ভীড় জমে যায়; বাউলকে আরদেখা যায় না। শুধু ভেসে আসে তার ভাঙা গলায় কি একগান, আরটুংটাং দোতরার আওয়াজ।

আমার ঘোর লেগে যায়, ঘোর লেগে যায়, ঘোর লেগে যায়। ...

না, জীবনে প্রথম ট্রেনে চড়ার আনন্দে নয়; রক্ষী বাহিনী, যমুনা, ইস্টিমার, শুশুক বা বাউল গানের সুরেও নয়। আমার ঘোর লেগে যায় এই ভেবে, গানের বিনিময়ে একবেলার খাবার পাওয়া যায়! তক্ষুনি দ্রুত মত বদলে প্রতিজ্ঞা করি, বড় হয়ে আমি বাউল হবো!

তিন. এরপর ইস্টিমার সিরাজগঞ্জ ঘাটে থামলে মা'র পরিচিত একরিকশায় চেপে সিরাজী বাড়ি (আমার একনানু হচ্ছেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। তার নামেই বাড়ির নাম। ) পৌঁছে যাওয়া। বিশাল একআমবাগান পেরিয়ে অনেকগুলো টিনের চালা নিয়ে সিরাজী বাড়ি। বাগানের সঙ্গেই ছোট্ট একখাল। খালের ওপারে আবার রেল লাইন।

নানু বাড়ি পৌঁছে নানীর আদর- আপ্যায়ন, মামাতো - ফুপাতো ভাইবোনের ভীড়ে আমি খেই হারিয়ে ফেলি। যৌথ পরিবারের বিরাট একরান্না ঘরে পিঁড়ি পেতে খুঁজে নেই নির্জন একটি কোন। সেখানে একপাশে বাড়ির বউ-ঝি'রা ঢেঁকিতে চিড়া কুটছে তখন। সেই প্রথম আমি ঢেঁকি দেখি; দেখি ধ্যান কুড়া কুড় শব্দে কেমন সুন্দর ছন্দে ছন্দে চিড়া কোটা হচ্ছে!

রান্না ঘরে বড় বড় সব মাটির চুলায় সব সময় ইয়া বড় এককেটলিতে গুড় মেশানো চায়ের পানি ফুটছে। আরেকটিতে ফুটছে দুধ। সেখানে বসে বাড়ির একতরুনী বউ গ্লাস গ্লাস চা সাপ্লাই দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন।

আমার হাতেও ছোট্ট কাঁসার গ্লাসে করে গুড় মেশানো চা ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই চায়ের গ্লাস গামছার এককোন দিয়ে দু'হাতে চেপে ধরে ফুঁ দিয়ে খাওয়ার নিয়ম।

সিরাজী বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও গুড় দেওয়া চায় খায়! আরতারা অবলীলায় মা, খালা, ফুপুদের তুই - তোকারি করে কথা বলে! আমিও মা'কে দেখি, রান্না ঘরে এসে নানীকে 'তুই তুই' করে কথা বলতে। আমার খুব রাগ হয়। আমি চায়ের গ্লাস আছড়ে ফেলি।

মা কপট রাগের ভঙ্গীমা করে বলেন, ছিঃ বাবু! দুষ্টুমী করো না। যা - ও তাপস ভাইয়ের সঙ্গে আমবাগানে গিয়ে খেলা করো।

তাপস আমার চেয়ে একটু বড়, সম্পর্কে মামাতো ভাই। তার বাবা, আনু মামাকে আমার আবছা মতো মনে পড়ে। শুকনো মতোন খনখনে গলার লোক আনু মামা মাঝে মাঝে আমাদের ওয়ারির র্যাঙ্কিন স্ট্রিটের বাসায় বেড়াতে আসতেন। আরসব সময় তার ঠোঁটে ঝুলতো সিগারেট। বাড়িতে এসেই আনু মামা আমার মাকে হুকুম করতেন, ও মধু ( মার ডাক নাম), চট করে এককাপ চা করো দেখি! আমি শুনেছি, আনু মামা নাকি বুকের কি একটা খারাপ ধরনের অসুখে ভুগে মারা গেছেন!

তো তাপস ভাই একগ্লাস চা হাতে আমাকে নিয়ে আমবাগানে বেড়াতে যান। দেখান, বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি লম্বা মাটির ঢিবি। বলেন, এটাই আমার বাবার কবর। হাতের গ্লাসের সবটুকু চা কবরে ঢেলে দিয়ে তাপস ভাই বলেন, বাবা, বাবা, আপনি চা খান! আরসেই সঙ্গে হঠাৎ শুরু হয় তার হু হু করে অবিরাম কান্না। ...তার একহাত ধরে কিছু বুঝে হোক, আরনা বুঝে হোক আমিও ভ্যাঁ করে কান্না জুড়ে দেই। আনু মামা, আনু মামা। ...

চার. আরেকবার শৈশবে দাদুবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। আমার বয়স তখন কতআরহবে, এই ছয় কি সাত।

দাদু বাড়ি হচ্ছে সিরাজগঞ্জের একপ্রত্যন্ত গ্রামে। তিনি ছিলেন ব্রিটিশের একজাঁদরেল দারোগা। আরতার বাড়িটা খুব সুন্দর, একেবারে ব্রিটিশ আমলের লাল ইটের খিলান করা একতলা পাকাবাড়ি। বাড়ির সামনে দিগন্ত জোড়া সর্ষে ফুলের ক্ষেত।

একঅলসদুপুরে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলাম সেই সর্ষে ফুলের ক্ষেতে। জীবনে সেই প্রথম সর্ষে ফুল দেখা। আমি তো একসঙ্গে এতো ফুলের সমারোহ দেখে খুশীতে একেবারে আত্মহারা। আরনা চাইতেই হলুদ হলুদ ফুলের রেনু লেগে যাচ্ছে আমার চোখে, মুখে, এমন কি নীল ফ্লানেলের শার্টেও।

ভাবলাম, কিছু ফুল ছিঁড়ে পকেটে করে নিয়ে যাই, বাড়ির সবাইকে দেখাবো আমার এই মহা আবিস্কার। হঠাৎ কোথা থেকে যেনো বোমারু বিমানের মতো উড়ে এলো আশ্চর্য সুন্দর ঝাঁক ঝাঁক সোনালী রেঙের কিছু পোকা।

সেইসব পোকা দেখেও আমি ভীষন খুশী। আবার ভাবলাম, এসব পোকাও কিছু ধরে নিয়ে যাই, বাসার সবাইকে দেখাবো। অনায়াসে ধরেও ফেললাম কয়েকটাকে, পকেটে পুরতে থাকি সেসব আবিস্কার।

আসলে সেই সব পোকার ঝাঁক ছিলো মৌমাছি, হুলে যার তীব্র বিষ।

এদিকে এতোক্ষণ ক্ষেতের একপাশে দাঁড়িয়ে আমার কাণ্ড - কারখানা অবাক হয়ে দেখছিলো একদরিদ্র কৃষাণ। সে ছিলো দাদুবাড়ির একবাঁধা দিনমজুর, কামলা আরকি।

আমাকে কিন্তু সে ঠিকই চিনেছে, আমি শহর থেকে বেড়াতে আসা একপুঁচকে, ডাক সাইটের মিজান দারোগার নাতি Ñ ইত্যাদি। তো সেই কামলা একদৌড়ে আমাকে মৌমাছির কবল থেকে 'উদ্ধার' করে কোলে করে পৌঁছে দেয় দাদু বাড়ি।

বোকা চাষা অতি ক্ষমতাধর গ্রাম্য জোতদারের একেবারে শেষ উত্তরসূরিকে চিনেছিলো ঠিকই। কিন্তু ব্যাটা খবর রাখেনি হায়, বালক মনের তীব্র উল্লাসের!

পাঁচ. ধূসর শৈশবের সেই স্বপ্নমাখা টুকরো স্মৃতির পাজেল, এই আমি এখন এতো বছর পর আবার জোড়া দিতে বসেছি। জাগতিক বিবিধ কর্দমাক্ত নোংরামি আরবিবমিষার বাইরে আমি আমার সমস্ত মনোসংযোগ সংশ্লেষিত করেছি, গ্ল্যাক্সো বেবী মিল্ক, ওভালটিন, গুড় মেশানো চা, আরক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুটের সৌরভমাখা গন্ধময় দিন ফিরিয়ে আনবো বলে।।

**এই লেখার কিছু অংশ আগে প্রকাশিত।*

## পলকের এক ছেলেবেলা

মাশীদ

একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখেছি, আমি খুব বর্তমান নিয়ে থাকি। ফেলে আসা সময় নিয়ে প্রথম কিছুদিন খুব ভাবি, তারপর একটা থ্রেশোল্ড পিরিয়াড পার হয়ে গেলেই সেটা নিয়ে খুব একটা আর ভাবা হয় না। বর্তমান নিয়েই পুরোপুরি ডুবে যাই। মানে কৈশোরে এসে সেটাই এনজয় করেছি, বাল্যকাল নিয়ে ভাবিনি, যৌবনে মেতে থেকেছি যৌবনের উৎসবে, কৈশোরের স্মৃতিতাড়িত হইনি বেশি। এখন বাল্যকাল নিয়ে ভাবতে গিয়ে তাই অনেক দূর ফিরে চাইতে হচ্ছে। কেমন যেন, মনে হচ্ছে অনেক দূরে ফেলে আসা অন্য কোন জীবন। হুট করেই চলে গেছে যেন। মেঘদলের 'ছেলেবেলা' গানটার শেষ লাইনটুকু মনে পড়ে গেল - পলকের এক ছেলেবেলা।

আমার ছেলেবেলা কেটেছে বুয়েট ক্যাম্পাসে। শুধু ছেলেবেলা নয়, আমার কৈশোর আর যাপিত যৌবনের বেশির ভাগ জুড়েই আছে বুয়েট ক্যাম্পাস। আমার জন্মের সময় বাবা-মা মালেশিয়ার পিন্যাং এ থাকলেও আমার কয়েক মাস বয়সের পর থেকেই আমি ঢাকায় আর এক বছর হওয়ার পর থেকেই বুয়েটের পাড়ায়। মনে পড়ে, ছোটকালে আম্মা আমাকে কেন জানি প্রায়ই বলত আমাকে নাকি মালেশিয়ায় কুড়িয়ে পেয়েছে। আয়নায় আমার চিংকু চেহারা দেখে আমি সেটা প্রায় মেনেই নিতাম। কিন্তু শিশুবয়সে আমার বুদ্ধি মনে হয় ভালই ছিল কারণ মনে প্রশ্ন জাগত, আমাকে না হয় মালেশিয়ায় কুড়িয়ে পেয়েছিলে, আমার বোনেদের ব্যাপারটা কি? ঢাকায় থেকেও ওদের চেহারা কেমন করে ইকুয়্যালি চিংকু?

যাই হোক, বাংলাদেশী বা মালেশিয়ানই হই না কেন, ছোটবেলায় আমার কাছে পৃথিবী মানে কোন দেশ ছিল না, ছিল আমার বাসা - স্কুল - ক্যাম্পাস। ক্যাম্পাস বলতে আমাদের পাড়াটুকু। বুয়েটে টিচারদের থাকার পাড়া দুইটা, ছোটকালে আমাদের কাছে যেগুলো লালপাড়া আর সাদাপাড়া নামে পরিচিত। পাড়ার অন্য বাচ্চাদের তুলনায় আমার পৃথিবী একটু বড়ই ছিল বলা যায় কারণ আমি দুটো পাড়াতেই থেকেছি। আমার এক বছর বয়স থেকে ক্লাস ফোরের শুরু পর্যন্ত (১৯৮৮) ছিলাম লালপাড়ায়। এরপর থেকে ২০০৪ পর্যন্ত সাদাপাড়ায়। সেসময় এই দুই পাড়ার মধ্যে দূরত্ব বিশাল মনে হত (পরে বুঝেছি সেটা ঠিক নয়)। আমার পৃথিবীর অধিবাসী ছিল আমার মা-বাবা, দুই বোন আর পাড়ার যাবতীয় বিভিন্ন বয়সী বাচ্চা-কাচ্চা আর চাচা-চাচীরা (পরে যাদের অনেককেই আমার শিক্ষক হিসেবে পেয়ে রিগ্রেট করেছি)। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছি যে পাড়ার সবাই মিলে একটা পরিবারের মতই ছিলাম তখন। স্কুলে অনেককে দেখতাম কাজিনদের সাথে খুব ক্লোজ, আমার কাছে পাড়ার সবাই আমার ইমিডিয়েট আত্মীয়দের চেয়ে বেশি কাছের ছিল ছোটকালে, অনেকে এখনো আছে।

আমার মায়ের সাথে সেই ছোটকাল থেকেই আমি খুব কাছের হলেও ছেলেবেলার কথা মনে পড়লে পাড়ার বন্ধুদের আর স্কুলের কথাই বেশি মনে পড়ে এখন। আর সাথে আমার বোনেদের কথা। আমরা তিনবোন। আমি সবার ছোট। মেজবোন আমার থেকে ৬ বছরের বড় আর বড়বোন ১০। ছোটকাল থেকেই শুনেছি আমার দুইবোনই আমাকে খুব দেখে-শুনে রাখত (স্ট্রলারসহ আমাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে উল্টে ফেলে দিয়ে পরে আম্মার ভয়ে আমার চেয়ে স্ট্রলারের কোন ক্ষতি হল কিনা সেটা নিয়ে ওদের উদ্বেগের কথাও শুনেছি)। মালেশিয়ায় সাংসারিক কাজ সেরে আর তিন বাচ্চা পেলে ক্লান্ত আম্মা নাকি অনেক সময় দুপুরবেলা ওদের কাছে আমাকে নির্দ্বিধায় রেখে দিবানিদ্রায় যেত। আমার বড়বোন সেসময় থেকেই তার ভাল রান্নার হাতের নমুনা দিত চুরি করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বানিয়ে, ওর আর আমার মেজবোনের জন্য। শুনেছি ঐসব চোরাকারবারির সময় আমি সেই শিশুকাল থেকেই নাকি ওদের খুব ভাল পার্টনার ইন ক্রাইম ছিলাম, কখনোই নাকি হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে ওদের ধরিয়ে দেইনি। আমার ছয় বছর বয়সী মেজবোন নাকি সেসময় আমাকে কোলে নিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে

গান ধরত, 'বাবু যে বাবু, তুমি যে বাবু, সেটা তো জান না' (যেটা নিয়ে আমি এখনো ওকে পঁচাই ও নিজে যে শিশু থেকেই একটা হাবলু ছিল সেটা কি ও জানত কিনা এই প্রশ্ন করে, হে হে হে!)। একটু বড় হওয়ার পরে দেখেছি ওদের দুইজনের সম্পর্ক খুবই বাজে ছিল ছোটকালে, সারাদিন ঝগড়া লেগেই থাকত, কিন্তু আমাকে আদরের ব্যাপারে আবার দু'জনেই খুব একমত (এটা আমার বড়মামার বাসাতেও দেখেছি, বড় ভাই আর বোনের সারাদিন ঝগড়া, তিন নাম্বারের সাথে দুইজনেরই খাতির)। যাই হোক, সেই শিশুকাল থেকেই আমার দুই বোন আমার দুই মেন্টর। জীবন নিয়ে ভাল-মন্দ যা কিছু শেখার - সব শিখেছি ওদের থেকেই। একবার ক্লাস থ্রি এর কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ক্লাসে সবার সামনে ওদের প্রিয় গান 'নীলাঞ্জনা' না বুঝেই বিশেষ আবেগের সাথে গেয়েছিলাম, যেটা আমার অনেক ক্লাসমেটই আজো দুর্ভাগ্যক্রমে মনে রেখেছে। অবশ্য বোনদের থেকে সবকিছুর শিক্ষাটা কৈশোরে আরো বেশি প্রকট ছিল। বাড়ির ছোটবোন থাকায় যেটা হয়েছে, আমার বড়বোনের সামনে এখনো কেউ কোন বাচ্চার উদাহরণ দিলেই ওর আমার কথা মনে পড়ে এবং খুব সুন্দর করে বলে, আমাদের মাশুমণিও তো এমনি করত! পুরা যাচ্ছেতাই বেইজ্জতি! এই লেখা লিখতে বসে ওকে আর তাই জিজ্ঞেস করিনি আমি বাল্যকালে কেমন ছিলাম মনে আছে কিনা। গতকাল আমার মেজবোনকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আমি শিশু হিসেবে কেমন ছিলাম? বাল্যকালের কিছুই তো মনে পড়ছে না! আমার বোন খুব আদরমাখা গলায়, ইয়ে, মানে msn এ যতটুকু আদরমাখা গলা টের পাওয়া যায় আর কি, বলল, তুমি অতি ভাল একটা বাচ্চা ছিলে, খুবই ভাল ছোটবোন। ছোটকালেই পাকা ছিলে খুব, তবে ভাল টাইপ পাকা, ইচড়ে টাইপ না। তোমার ঠিক দোষ না, বড় দুই বোন থাকলে এমনি হয়। Api (আমাদের বড়বোন) and I used to adore you. We still do! যাক, ছেলেবেলার কথা লেখার শুরুতে উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতি মনে না পড়লে কি হবে, আমি যে আমার বড় দুইবোনের অতি আদরের ছোটবোন ছিলাম, এই বড়বেলায় এসে সেটা তো মনে পড়ে গেল!

আমার মায়ের ভাষ্যমতে শিশুহিসেবে আমি অতি 'হ্যাপি বেবি' ছিলাম। যখন-তখন হাসিমুখে চেনা-অচেনা যারতার কাছে চলে যেতাম, যেটায় আম্মা নাকি মাঝেমাঝে একটু বিরক্তই হত। সে গল্প পরে যতবার শুনেছি, ততবারই সাথে শুনেছি ঘুমের মধ্যেও আমি মা'কে কেমন চিনতাম সেটার গল্প। আপি আমাকে ঘুমের মধ্যে আদর করতে গেলে আমি যদি জেগে যেতাম, ও নাকি তাড়াতাড়ি নিজেকে আম্মা দাবী করে বলত, 'মিত্তি আম্মা' 'মিত্তি আম্মা', যেন আমি আশ্বস্ত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু আমি নাকি সবসময়ই ঘুমের মধ্যে বলতাম, তুমি মিত্তি আম্মা না, যেটা শুনে অ্যাট লিস্ট আম্মা আশ্বস্ত হত। পিন্যাং এ আমি নাকি আমার ওয়াকারে চড়ে সারা বাড়ি দাপিয়ে বেড়িয়ে বাসার যাবতীয় খবরের কাগজ ছিঁড়ে ফেলতাম আর আমাদের রেকর্ড প্লেয়ারের ভলিউমের নবটা ঘুরিয়ে ম্যাক্সিমামে দিয়ে রাখতাম। বলাই বাহুল্য, এরপর যে গান শুনতে এসে রেকর্ড প্লেয়ার চালাত, সে যারপরনাই বিরক্ত হত। প্রথম হাঁটা শিখেছিলাম সিঙ্গাপুরে, আমাদের পারিবারিক ছুটির একটা ট্রিপে। কে জানে, হয়ত সেই টানেই গত দু'বছর সিঙ্গাপুরের আনাচে-কানাচে হেঁটে বেড়িয়ে এখন আবার মালেশিয়ায়।

বুয়েটের পাড়ায় আমার ছোটবেলা কেটেছে দুর্দান্ত। পাড়ার প্রায় সবাই আমরা পড়তাম বুয়েটের ভিতরের ইনজিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসেই। তাই পাড়ার বন্ধুরাই স্কুলে, আবার স্কুলের বন্ধুরাই পাড়ায়। তখন ওটাই নরমাল ছিল, তবে পরে বড় হয়ে টের পেয়েছি আমরা পাড়ার পিচ্চিরা খুবই লাকি ছিলাম। বিশাল মাঠ, পেয়ারা আর আম গাছ সাথে আরো নানান ফুলের গাছ - ঢাকা শহরের প্রায় মাঝখানে এমন জায়গায় বাল্যকাল কাটাতে কপাল লাগে বৈকি! সকালে স্কুল আর বিকালে নিচে নেমে খেলা-ধুলা, খুব মজার একটা ছেলেবেলা! বিকালে আসরের আযানের পর থেকে মাগরিবের আযান পর্যন্ত নিচে খেলার কোন পরিবর্তন হয়নি আমার পুরো ছেলেবেলা এবং কৈশোর জুড়ে। লালপাড়ায় প্রধান খেলা ছিল সাতচাড়া, বরফপানি, কুতকুত আর শীতের দিনে ব্যাডমিন্টন। পেয়ারা গাছের বিভিন্ন ডালে ঝুলে সেটাকে জাহাজ কল্পনা করেও কি কি জানি খেলতাম। আর মাঠের এক কোণে একটা উঁচু জায়গা ছিল, তখন আমাদের কাছে পাহাড় বলতে সেটাই।

ওখানেও কি কি জানি খেলা হত। বছর শেষে বাধ্যতামূলক ছিল পিকনিক। সেসময় ২-৩ বছরের ছোট-বড়দের নিয়ে একেকটা গ্রুপ ছিল পাড়ায়। পিকনিক হত গ্রুপভিত্তিক। বড়দের একদিন, তো ছোটদের আরেকদিন। ছেলে-মেয়েদের আবার আলাদা দিন। বুয়েটের কোন হলের প্রোভোস্ট চাচা হল থেকে তাঁবু নিয়ে আসতেন। পাড়ার মাঠের মাঝে তাঁবু গেড়ে খুব ফেস্টিভ আবহাওয়া তৈরি হত। পিকনিকের আগের দিন সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে তৈজসপত্র জোগাড় করা হত। নিচে নিজেদের বানানো চুলায় কোন এক ভাল আন্টি পিকনিকের দিন সেই জিনিসপত্র দিয়ে রান্না করতেন। দুপুরে বাড়ি গিয়ে সবাই শাড়ি পরে আবার তাঁবুতে ফিরে সেই অমৃত খেতাম একসাথে। প্রতিবছর তাই ফাইনাল পরীক্ষা শেষে আমরা অধীর আগ্রহে থাকতাম পিকনিকের। ছোটকালের খুব কম সময়েই আমি ফিরে যেতে চাই (বড় হয়ে আরো অনেক বেশি মজার বাঁদরামি করেছি দেখে)। সেই খুব কম সময়ের একটা হচ্ছে এই বাৎসরিক পিকনিক। আমার এখনি ইচ্ছা করছে আবার সবাই একসাথে চুলা খুড়ে পিকনিক করি। আহা! কী মজাই না হত পিকনিকে! আরেকটু বড় হয়ে অবশ্য আমরা রাতের পিকনিকও করতাম। পাড়ায় থাকার মজাই আলাদা!

স্কুলে বা পাড়ায় আমার বোনেদের বা ওদের সমসাময়িক গ্রুপের সবাইকে তখন অনেক বড় মনে হত। ক্লাস টু-থ্রিতে পড়া আমাদের কাছে তখন ক্লাস সিক্স-সেভেনের আপু-ভাইয়ারা বিশাল বড়। পরে স্কুল পার হয়ে যাবার পরে ক্লাস টেনের পুচকেদের দেখে খুব মজা লাগত।

লালপাড়ায় তখন মহিলাদের একটা ক্লাব ছিল। সেটার আন্টিরা বেশ কালচারাল ছিলেন। আমাদের সেখানে নাচের ক্লাস হত, গানের ক্লাস হত, ছবি আঁকারও। নাচের ক্লাসটা মনে পড়ে খুব। যেই স্যার আমাদের শেখাতেন, উনি খুব যত্ন করে শেখাতেন। আমি লালপাড়া ছেড়ে সাদাপাড়ায় যাবার পরে আমাকে আনা-নেয়ার লোকের অভাব হওয়ায় উনি নিজেই আমাকে ওনার যাবার পথে সাথে নিয়ে নিতেন। একবার ওনার জন্য আমরা পাড়ার বাচ্চারা টিভির 'পাতাবাহার' অনুষ্ঠানে নাচার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেবার টিভি ভবনে রিহার্সেলের সময় যেকোন টিভি ব্যক্তিত্বকে দেখলেই আমরা দল বেঁধে অটোগ্রাফ নিতে যেতাম, কিছু বুঝেই হোক আর না বুঝেই। ছোটকাল থেকেই ওরকম হুজুগে বাঙালিগিরি দেখাতে গিয়ে দেখা গেল আমার অটোগ্রাফ বইয়ের প্রথম পাতাতেই স্থান করে নিয়েছে এককালের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান অন্তরঙ্গের উপস্থাপক রায়হান গফুর। আমার বড় দুইবোন এখনো চান্স পেলেই আমাকে পঁচায় সেই ঘটনা মনে করিয়ে দিয়ে, আমি নাকি হয়রান গফুরের একমাত্র ডাই-হার্ড ফ্যান। ঐ একদিনের শিশুসুলভ ব্যাপার যে এমন একটা লাইফলং হয়রানি হয়ে যাবে - কে জানত!

পাড়ায় আমাদের ক্লাসের বিরাট একটা দল ছিল। আমি, ফারু, সোহান, সাদাত, শিশির,পাপুন, মিতুন, নোরীন, মিশি, ইলোরা - সব মিলে বিরাট একটা দল। আরো বেশ ক'জন ছিল যারা খুব বন্ধু ছিল তবে অন্য স্কুলে পড়ত বলে একটা দূরত্বও ছিল। সাদাপাড়ায় চলে যাবার পরে ওদের সাথে আর যোগাযোগ ছিল না, তবে বাকিদের সাথে এক স্কুলেই ছিলাম দেখে বেশ যোগাযোগ ছিল, এখনো আছে। মনে পড়ে যায়, ফারু আর আমি একসাথে স্কুলে ভর্তি হতে গিয়েছিলাম। ফারু ভয় পেয়ে কাঁদছিল দেখে ওকে বলা হল আমার সাথে ভাইভাতে ঢুকতে। আমাদের বলা হয়েছিল ফুল অথবা মানুষ আঁকতে। এখনো মনে আছে কেমন করে জানিনা, আমি তখন একটু চিন্তা করে দেখেছিলাম যে আমি সেসময় কাঠিমানুষ ছাড়া আর কোন হিউম্যান ফিগার আঁকতে পারতাম না (ইয়ে, মানে, এখনো পারিনা), তাই ফুল আঁকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আমার দেখাদেখি ফারুও ফুল এঁকেছিল। এভাবেই খেলাচ্ছলে স্কুলে ভর্তি হওয়া।

ছেলেবেলায় বছরের ইউনিটটা খুব স্পষ্ট ছিল। মানে একটা বছর শেষ হয়ে আরেকটা শুরু হওয়ার সাথে অনেক কিছু পাল্টে যেত, তাই সেটা অনুভব করতাম খুব বেশি। তখন নতুন বছর মানেই নতুন ক্লাস, নতুন ক্লাস মানেই নতুন বই-খাতা আর পড়াশুনা, বার্ষিক স্পোর্টস আর তার কিছুদিন পরেই রোজার লম্বা ছুটি। বছরের শুরুর

কিছুদিন তাই খুব আনন্দে কাটত মনে পড়ে। নতুন বছর মানেই তখন ছিল নতুন উত্তেজনা, যেটা এখন আর অনুভব করিনা। ঠিক বার্ষিকভাবে রুটিনমাফিক তেমন কোন পরিবর্তন আর যেন নেই এই বড়বেলায়। সবই ' same old, same old' টাইপ। সেসময় বছরের শুরুতে নতুন বইয়ের মলাট কোন ক্যালেন্ডারের কোন পাতাটা দিয়ে বানাবো - সেটাতেও মহা উত্তেজনা ছিল। যাই হোক, স্কুলে আমার সবদিকেই রেকর্ড বেশ ভাল ছিল। একদিকে ক্লাসে সমানে গাল-গল্প করায় যেমন বেশ নামকরা ছিলাম, তেমনি পড়াশুনাতেও ভালই ছিলাম। টিচাররা তাই বেশি অভিযোগ করতে পারেননি কোনদিন। আমার বাবা-মা'র সাথে দেখা হলে খুব ভদ্রভাষায় শুধু বলতেন, 'মেয়ে পড়াশুনায় ভাল, তবে খুব চঞ্চল' যেটা শুনলেই আমার খুব হাসি পেত (এখনো পাচ্ছে)। বছরের শুরুতে আরেকটা ব্যাপার নিয়ে আমরা খুব উত্তেজিত থাকতাম সেটা হল বার্ষিক স্পোর্টস। পিকনিকের সাথে এই দিনটাও আমার বছরের সবচেয়ে প্রিয় দিন ছিল। আমাদের প্রিয় পিটি স্যার খুব আগ্রহের সাথে এটার আয়োজন করতেন। মেগা বাটুল হয়েও কোন এক অদ্ভুতভাবে দৌড়ে খুব ভাল ছিলাম। ৫০ মিটার থেকে ৭৫ হয়ে ১০০ মিটারে স্কুল জীবনে খুব কমই প্রথম হইনি। সেসময় আমাদের চারটা হাউজ ছিল - তিতুমীর, শেরেবাংলা, রোকেয়া আর মোহসীন। সব ছাত্র-ছাত্রীরা এই চার হাউজের একেকটায় ছিল। আমি তিতুমীরের একজন গর্বিত সদস্য ছিলাম কারণ বার বছরের স্কুলজীবনে (প্লেগ্রুপ, কেজি হয়ে ক্লাস ওয়ান থেকে টেন) প্রতিবছর দেখতাম তিতুমীরই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হত। স্কুলজীবনের উপরের ক্লাসগুলোয় আমি আমার খুবই অ্যাথলেটিক টিমমেট লোমা'র বছরের প্রথম কিছুদিন কাটত পয়েন্ট হিসেব করে, কে কোনটায় কম্পিট করলে দলগতভাবে পয়েন্ট বাড়বে। আমি দৌড় কাভার করলে বাকিগুলোয় ও থাকত (আমি আবার লংজাম্পে বিশেষ বাজে ছিলাম, একবার ৫জনের মধ্যে ফিফথ হয়েছিলাম)। হাইট অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটেগরীও আমরা চেষ্টা করতাম কাভার করতে। সাথে আমাদের মতই টিম স্পিরিটে উদ্বুদ্ধ আরো ক'জন জুনিয়ার ছিল। এই টিম স্পিরিট সেই ছোটকাল থেকে অনেকদিন ছিল। স্কুল ছাড়ার পরেও বেশ ক'বছর স্পোর্টস ডে'তে আমরা বুয়েটের মাঠে ঠিক হাজির হয়ে তিতুমীর হাউজকে সাপোর্ট দিয়ে আসতাম। এখন লিখতে বসে মনে হচ্ছে সেসময় থেকেই যে আমরা নিজেরা কে কি জিতি ভাবার থেকেও টিমের ওভারঅল পয়েন্টের কথা ভাবতাম, সেটা একটা ভাল ট্রেনিং ছিল। টিম স্পিরিট ব্যাপারটা যে সংক্রামক আর এটা দিয়ে যে অনেক কিছু করা যায় এই বোধটা পরবর্তীতে অনেক কাজে এসেছে। তবে স্পোর্টসে আমাদের স্কুলে অতি বিচ্ছিরি বাটি-ঘটি প্রাইজ দিত। তিতুমির হাইজের আরেক স্টার অ্যাথলিট পাপুন একবার একটা বালতি দেখে খুব ভয়ে ছিল না জানি সেটা কে পায়, পরে দেখা গেল ও-ই পেয়েছে। অন্যসব প্রাইজের মত ওটাও ওদের বাসার শো'কেসে শোভা পেত। সেই লোমা এখন অ্যামেরিকা, পাপুন অস্ট্রেলিয়ায় আর আমি মালেশিয়ায়। ইমেইলে যোগাযোগ হয় মাঝেমাঝে। একদিন মেইল করে জিজ্ঞস করতে হবে সেই বালতিটা এখন কই। ১৯৮৮ তে সোল অলিম্পিক দেখে এককালে স্বপ্ন দেখতাম অলিম্পিকে দৌড়াবার। সন্ধ্যায় সবাই বাড়ি ফিরে গেলে পাড়ার একটা রাস্তায় রেগুলারলি দৌড়ে সেজন্য বেশ প্র্যাকটিসও করতাম। আহা!

পাড়ায় খুব মজার কিছু দিনের মধ্যে ছিল শবেবরাত আর ঈদের আগের রাত। শবেবরাতে তারাবাতি জ্বালাতে ভাল লাগত খুব। একটা প্যাকেট যদি আব্বা কিনে দিত, মনে হত না জানি কি পেয়ে গেছি। ঈদের আগের রাতে পুরো পাড়া নিচে নেমে পড়তাম আর পরের দিনের জন্য সে কি উত্তেজনা! ঈদের দিন বরং মনটা খারাপ হয়ে যেত, দিনটা শেষ হয়ে গেল ভেবে। একবার কুরবানির ঈদের সময় কেনা ছাগলটার সাথে খুব ভাব হয়ে গেল দু'দিনেই। আমার কোনকালেই কোন পোষা কিছু ছিল না। মাথায় সাদা ডোরাদেয়া কাল এই ছাগলটা যেন পুরো পোষ মেনে গেল কেমন করে! আমি সামনে না থাকলে ডাকাডাকি শুরু করে দিত, কাছে থাকলে দড়ি বাঁধার প্রয়োজন হত না, আমার হাত মুখের সামনে পেলে চেটে দিত। ছোটবেলার খুব খারাপ একটা দিনের একটা ছিল তাই আমার এই ছাগলটার কুরবানির দিনটা। এরপর থেকে আমাদের বাসায় আর কোন ঈদে ছাগল কেনা হয়নি।

ছেলেবেলার একটা ভীষণ ভয়ের দিন ছিল রেজাল্টের দিন। প্রথম তিনজনের মধ্যে না থাকলে পড়ার ব্যাপারে ভীষণ কড়া আমার বাবা আমাকে কি করবে - এই ভাবনাটা খুবই ভয়াবহ ছিল। কপালজোরে বাল্যকালে রেজাল্টের দিনগুলো খুব বেশি খারাপ কাটেনি। আর রেজাল্ট ভাল মানেই আম্মার সাথে নিউ মার্কেট। তারপর একগাদা নতুন গল্পের বই। ঢাকা বুক কর্পোরেশান, জিনাত বুক হাউজ, বুক বিউটি, ইউনিভার্সিটি বুক ডিপো ঘুরে ঘুরে বই খুঁজে বেড়ানোর সেই আনন্দ আর কোথাও পাইনি। ছেলেবেলায় প্রিয় বই ছিল দেব সাহিত্য কুটিরের যেকোন বই আর বড়বোনের ফেলুদা কালেকশান। ছোটকালে স্কুলে প্রাইজ পাওয়া বইগুলো পেয়েই আম্মার হাতে তুলে দেয়া – আমার ঠিক মনে না পড়লেও, আমার ছেলেবেলা সংক্রান্ত আমার মায়ের খুব প্রিয় স্মৃতির একটি। ছেলেবেলার খেলনা বলতে ছিল ইটালি থেকে আব্বার নিয়ে আসা 'বেটিনা' নামের একটা পুতুল, টেডি নামের একটা টেডি বেয়ার (আমার বড়মামা যেটাকে 'বেটানা' ডেকে আমাকে খুব ক্ষ্যাপাতো) আর রাজ্যের সেইসব গল্পের বই। শীত তাড়াতে বেটিনার জন্য একটা সোয়েটার আম্মা আগেই বানিয়ে দিয়েছিল। তাই টেডির জন্য আমি নিজেই একটা মাফলার বানাই ক্লাস থ্রিতে থাকতে। আমার উলের সেলাইয়ের সেই শুরু আর সমাপ্তি। প্রতি বছর অধীর অপেক্ষায় থাকতাম মহররমের মেলা, বৈশাখী মেলা আর বই মেলার জন্য। শহীদ মিনার সাদাপাড়ার পাশেই হওয়ায় একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটা কাটত অন্যরকম উত্তেজনায়।

ক্লাস থ্রি-ফোরের দিকে আমার বাবা আমাকে স্কুল থেকে নিয়ে আবার অফিসে ফিরে যেতেন আমাকেসহ। দুপুরে লাঞ্চের সময় একবারে বাসায় ফেরা হত। মাঝখানের সময়টায় আমার বাবার অফিসের একজন টাইপিস্টের সাথে আমার অনেক সময় কেটেছে। ওনার কাছেই আমার প্রথম টাইপিঙে হাতেখড়ি। কোন এক অজ্ঞাত কারণে অত ছোট আমাকে খুব যত্ন করে উনি টাইপ করা শেখাতেন। ওনার পাশে বসে হয়তো আমি বাংলা টেক্সট বই খুলে কোন একটা কবিতা টাইপ করতাম। পরে বদলি হয়ে অন্য ডিপার্টমেন্টে চলে যাবার পরে ওনাকে আর দেখিনি। ওনার কথা আমার খুব মনে পড়ে এখনো। কারো কাছ থেকে কোন কারণ ছাড়াই ভালবাসা পাবার শুরু বোধ হয় সেটাই।

১৯৮৮ তে লালপাড়া ছেড়ে আসার পরে এক স্কুলে পড়তাম বলে সবার সাথে যোগাযোগ থাকলেও সাদাপাড়ার কয়েকজনের সাথে অনেক বেশি ভাব হয়ে গেল। তাদের একজন ফেরদৌস, আমার কিশোর বয়সে সকালে স্কুলে যাওয়া থেকে বিকালে সাইকেল চালানোর সার্বক্ষণিক সাথী। আমার দু'বছরের ছোট তানিয়া আর চার বছরের ছোট বিন্তিও সাদাপাড়ায় পাওয়া খুব প্রিয় বন্ধু, যাদের সাথে বহুদিন পরে পরে কথা হলেও এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয় না যে কোন গ্যাপ ছিল মাঝে। আমার খাতাপত্র আর নোটস্ কোন বছরই তানিয়ার জন্য জমিয়ে রাখতে ভুল হত না। আমরা একেকজন একেক বয়সী হওয়ায় বাল্যকাল ছেড়ে বয়ঃসন্ধির মজার সময়টায় পাওয়া জীবন সংক্রান্ত দুর্লভ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোও উত্তরাধিকারসূত্রে সবার মাঝে পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে দিতেও আমাদের কার্পণ্য ছিল না। সেটা জীবনের আরেকটা মজার অধ্যায়। তাই বাল্যকালের বড় অংশ লালপাড়ায় কাটলেও তারপরে জীবনের বেশির ভাগ সময় সাদাপাড়ায় কেটেছে বলে ওটাই আমার মনে দাগ কেটে আছে বেশি। তবে বৃষ্টি হলেই লালপাড়া যখন ডুবে যেত, আমি আর আম্মা যখন বারান্দায় বসে কাগজের নৌকা বানিয়ে পানিতে ছুঁড়ে দেখতাম কারটা বেশি দূরে যায় - সাদাপাড়ায় এসে সেটা খুব মিস করতাম। রীতিমত রাগই হত কেন সাদাপাড়া এত উঁচু ভেবে। অবশ্য সাদাপাড়ার বাড়ির বারান্দাটা খুব সুন্দর ছিল। সামনেই বুয়েটের মাঠটা বৃষ্টি হলেই পানি জমে পুকুরের মত যখন মনে হত - তখনো খুব ভাল লাগত। ক্লাস ফাইভে ছায়ানটে ভর্তি হয়ে আরেকটা নতুন জগতের দরজা খুলে গিয়েছিল। সেটাও বেশ মজার ছিল। মিশি পাড়া আর স্কুল ছাড়িয়ে আমার ছায়ানটেরও সঙ্গী। এখন ক্যানাডায়, এই লেখাটা লেখার ফাঁকে-ফাঁকে ওর সাথে চ্যাটে গত অগাস্টে ঘটে যাওয়া ওর বিয়ের গল্প শুনছি।

লালপাড়া, সাদাপাড়া, স্কুল, ছায়ানট - সবখানেই দুর্দান্ত কিছু বন্ধু পেয়েছিলাম। আমার ভাল বন্ধুভাগ্য সেই ছেলেবেলা থেকেই আমাকে এখন পর্যন্ত পিছু ছাড়েনি। ছেলেবেলার অনেকের সাথেই এখনো যোগাযোগ আছে। স্কুলের বাল্যকাল থেকে শেষ পর্যন্ত বেস্টফ্রেন্ড ছিল সাইকি। এখন অ্যামেরিকায়। স্কুল ছাড়িয়ে কলেজ, আন্ডারগ্র্যাড, মাস্টার্স – সব লেভেলে অসাধারণ কিছু বন্ধু পেলেও আমার কাছে সাইকি সবসময়ই অন্যরকম স্পেশাল। আমার সব বন্ধুদের সাথে প্রিয় বন্ধুদের তালিকায় সবসময় ছিল আমার মা, দুইবোন আর অপু, এখনো আছে।

ছেলেবেলার কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে একটা ছিল ক্লাস টুতে ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক এক সপ্তাহ আগে পড়ে গিয়ে সামনের দুইটা দাঁতভাঙাসহ ঠোঁট কেটে ফেলা (এরপরে ঐ ভাঙা দাঁত দিয়ে আরো দুইবার ঠোঁট কেটেছি, আমি আক্ষরিক অর্থেই ঠোঁটকাটা মেয়ে)। সেবার ফাইনাল পরীক্ষা দেয়া না দেয়া নিয়ে একটা সংকট দেখা দিয়েছিল। খুব অদ্ভুতভাবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেবারই আমি প্রথমবারের মত প্রথম হয়েছিলাম। মনে পড়ে, সেসময় কে কত ব্যাথা পেয়েছে, কার জখম কতটা সিভিয়ার ছিল - সেটা নিয়ে ব্র্যাগ করার একটা টেন্ডেন্সি ছিল সবার মধ্যে। আমার মনে হালকা একটা দুঃখও ছিল, ঠোঁট কেটে দাঁত না ভেঙে কেন হাত-পা ভাঙলাম না বা মাথা ফাটালাম না - সেটা ভেবে খুবই আফসোস হত।

স্কুলে ক্লাস ফোরের দিকে আমাদের ক্লাসের সেরা আর্টিস্ট অপু 'হাসি' নামের একটা এক পাতার পত্রিকা বের করত। সেটায় লেখা দেয়ার ব্যাপারে আমাদের আগ্রহের সীমা ছিল না। অপুর দেখাদেখি জাবের বের করেছিল 'অট্টহাসি' নামের আরেকটা পত্রিকা। রাজা বিষয়ক আমার লেখা অতি অখাদ্য একটা কবিতা এই দুই পত্রিকাতেই একযোগে ছাপা হয়েছিল ভাবতেই আমার এখন অট্টহাসি পাচ্ছে। আমার বড়বোন সেসময় বরিশাল মেডিকেল কলেজে পড়ে। আমি হাসির প্রতি সংখ্যা ওকে লেখা চিঠির সাথে পোস্ট করে দিতাম আর আপি (আমার বড়বোন) সেগুলো গভীর আগ্রহের সাথে জমিয়ে রাখত। বরিশাল থেকে ছুটিতে আসলেই আমার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসত সবসময়। সেসবের মধ্যে খুব ইন্টারেস্টিং ছিল স্টেপলারের মত একটা সেলাই করার মেশিন। আমার দুই বোনই ছোটকাল থেকে আমার যেকোন কাজে উৎসাহ দিয়ে গেছে, সে যত উদ্ভটই হোক না কেন। তার মধ্যে একটা ঘটনা এখনো মনে পড়লে হাসি পায়। আমি ছোটকাল থেকেই বিশিষ্ট মশা-মারিয়ে হিসেবে পপুলার ছিলাম বাসায়। মশা দেয়ালে বসলেই গিয়ে বাড়ি দিয়ে মেরে ফেলতাম। আমার পড়ার টেবিলের পাশের দেয়ালে তাই বেশ বড় একটা মশাচিত্র হয়ে গিয়েছিল। বরিশাল থেকে আপির পাঠানো চিঠির সাথে একবার একটা চিরকুটও পেলাম। সেটায় আপি তিনটা মশা মেরে স্কচটেপ দিয়ে আটকে পাঠিয়েছে। আমি আমার দেয়ালের মশাচিত্রের সাথে ওই চিরকুটটাও আটকে রেখেছিলাম এই উদ্ভট হবি যতদিন ছিল ততদিন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, গত জুন মাসে আমি যখন দেশে গেলাম আর আমার অ্যামেরিকাপ্রবাসী মেজবোনের সাথে চার বছর পরে দেখা হল, ছেলেবেলার কথা মনে করে ঘুমানোর আগে ও রেগুলার বেসিসে আমাকে দিয়ে মশা মারিয়েছে।)

নাহ্! আমার ছেলেবেলা নিয়ে লেখার আগে ভাবছিলাম কি লিখব। ভেবেছিলাম, ছেলেবেলা তো মহা বোরিং ছিল, কবে হুট করে কই চলে গেছে টেরই পাইনি। সব মাস্তি তো করেছি কৈশোরে দুষ্টুমিতে হাতেখড়ির পর থেকে। কিন্তু এখন দেখছি হঠাৎ করে কোত্থেকে যেন রাজ্যের খুঁটিনাটি মনে পড়ে যাচ্ছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখব ভেবে না পেয়ে অনেক কিছুই লিখে ফেললাম অসংলগ্নভাবে। যদি এক কথায় বলতে হয়, তবে বলব, আমার ছেলেবেলাটা চমৎকার ছিল, যেটা নিয়ে এসেছিল আরো চমৎকার একটা কৈশোর, পরবর্তীতে যেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আরো সুন্দর একটা যৌবনের। ছেলেবেলাটা তাই কখনোই পুরোপুরি ছেড়ে যায় না বোধ হয়। সেই

জন্যেই এত বুড়ো হয়েও মনে হয় প্রায়ই শুনি 'তুই কি আর বড় হবি না?'। নাহ্! ছেলেবেলা যতটা দূরে ফেলে এসেছি ভেবেছিলাম, আসলে দেখছি ততটা দূরে নয়।

## সম্পাদকের নয়, আমার ছেলেবেলা...

**মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন (দ্রোহী)**

---

১.
*"মিলে শান্তি দেশে, দেখ একটা কিলে"* – মিলিমিটার থেকে কিলোমিটার পর্যন্ত প্রত্যেকটি এককের পারস্পরিক সম্পর্ক মনে রাখার জন্য বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন এই বাক্যটা।

এত সহজ এই কথাটা কিছুতেই মনে রাখতে পারছিলাম না। বাবা অনেক চেষ্টা করলেন আমাকে শেখানোর জন্য – কোনভাবেই কিছু হচ্ছিল না; শেষে রাগ সামলাতে না পেরে কিল মেরে বসলেন আমায়। কিল খেয়ে কিভাবে যেন আমি বাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থ ধরতে পারলাম – আমার ও আমার বাবার পারস্পরিক সম্পর্কেও শান্তি প্রতিষ্ঠা হল। তারপর আরভুল হয়নি কখনো। এখনো মাঝে মাঝেই টের পাই – কিল দিলেই শান্তি মিলে! হাতে কলমে শিক্ষাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা – এই ধারনাটা আমার ঠিক তখন থেকেই জন্মে। মানে হাতের মার খেলেই যে কলমের গতি বাড়ে এই ব্যাপারটি শিখেছি সেই ছোট্ট বয়সেই।

আমার জন্ম হয়েছিল কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট গ্রামে। বাবা তখন চাকুরী করতেন ঢাকায়। স্কুলে ভর্তি হবার আগেই আমার ঢাকা –চট্টগ্রাম ঘোরার পালা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তেমনি একবার ঢাকায় বেড়াতে এসেছি – বাবা আরসেজো কাকা মিলে মেসে থাকতেন মতিঝিল এ.জি.বি কলোনীর বি ৩৬ এইচ ৪২ এ। আমাকে বাসায় রেখেই বাবা – কাকা অফিসে চলে যেতেন। কিছুক্ষন পরে বুয়া আসতেন কাজ করতে, আমি সারাদিন বুয়ার সাথে সাথে ঘুরতাম। দুপুরের পরে বুয়া যখন চলে যেতেন, আমি সুমিদের বাসায় গিয়ে খেলা করতাম। বিকালে অফিস থেকে ফিরে আমাকে নিয়ে আসতেন বাসায়। তারপর সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে ঘুরতে বের হতেন।

একদিন বাবা অফিসে যাবার আগে আমায় বাড়ির কাজ দিয়ে গেলেন – গরু নিয়ে দশটি বাক্য রচনা করতে হবে। আর বলে গেলেন, " ঘরে কলা আছে, যদি খেতে ইচ্ছা করে – খাবি। " বিকালে বাবা অফিস থেকে ফিরে দেখেন অবাক কান্ড! চব্বিশটি সাগর কলা কেনা হয়েছিল, যার মধ্যে বাইশটি আমি একবেলায় সাবাড় করে দিয়েছি। আরগরুর রচনা – আমাদের পারিবারিক হাসির ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।
আমি সারাদিন ধরে কলা খেতে লাগলাম আরগরু নিয়ে কি লেখা যায় তা চিন্তা করছিলাম। গরুর চারটি পা আছে। গরুর দুইটি কান আছে। গরুর দুইটি চোখ আছে – এভাবেই চলছিল। নয়টা বাক্য লেখার পর আমার পেন্সিল থেমে গেল। গরুর আরকি আছে সেটা মনে পড়ছে না। অবশেষে খুঁজে পেলাম সেই বিখ্যাত বাক্য! দশ নাম্বার লাইন হিসাবে আমি লিখেছিলাম, " গরুর একটি পোঁদ আছে" ।

২.
দাদা একদিন আমাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এলেন। স্কুলে গিয়ে আমার চোখ ছানাবড়া! কত্তো মেয়ে! একসাথে অ্যাতো মেয়ে দেখে আমার স্কুল জিনিষটা খুব ভালো লেগে গেল। রেজিষ্ট্রার খাতায় নাম লিখার পর রাজ্জাক স্যার আমাকে তক্ষুনি একটা ক্লাসে বসিয়ে দিয়ে আসলেন।

আমি ঘুরে ঘুরে তাকাই। সবকটা অপরিচিত মুখ। পুরো ক্লাসে শুধু একজনকেই চিনতে পারলাম – আমার দূরসম্পর্কের একচাচা – আলমগীর চাচা। শুনেছিলাম আলমগীর চাচা দুই বছর আগে থেকেই প্রথম শ্রেণীতে ঝুলে ছিলেন। আমি যখন পঞ্চম শ্রেণী পাশ করি তখন তিনি মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী পাশ করেছেন। পরবর্তীকালে আমি যখন কলেজ পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত শুরু করলাম তখন চাচা সপ্তম শ্রেণীতে পড়তেন। পড়ালেখার ব্যাপারে আলমগীর চাচা বরাবরই আমার অনেক পেছনে থাকতেন – বাস্তব জীবনে এসে আমি চাচার কয়েক ক্রোশ পেছনে পড়ে গেলাম। আমি যখন বিয়ে করি তখন চাচার মেয়ে ততদিনে বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে।

ক্লাসে ঢুকেই আমি বিপুল বিক্রমে মেয়েদের দিকে তাকাতে শুরু করে দিলাম। কিছুক্ষন পরে আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় হাসিব এসে বললো, " এই ছেলে! তুমি মেয়েদের দিকে তাকাও কেন?"

কয়েকদিন যেতে না যেতেই আমি প্রেমে পড়ে গেলাম। প্রথম প্রেমের অনুভুতি সবসময়ই তীব্র হয়। মেয়েটির নাম ছিল ফরিদা। বয়স নিদেনপক্ষে আঠারোর নীচে নয় – আরএদিকে আমি পাঁচ বছরের টগবগে প্রেমিক। ফরিদাকে আমার প্রেমের বন্ধনে আকৃষ্ট করতে কতচেষ্টাই না করেছি – শুধু মুখ ফুটে বলতে পারিনি। আমাকে কষ্টে রাখার জন্যই হয়তো ফরিদা একব্যাটার মোটর সাইকেলে ভোঁ – ভোঁ করে ঘুরে বেড়াত। একদিন সকলসম্ভাবনা অঙ্কুরে বিনষ্ট করে ফরিদা ভেগে গেল সেই লোকের মোটর সাইকেলে চড়ে।

৩.

একদিন গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়লো – বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফেরার পথে আমাদের গ্রামের স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে বক্তৃতা দিবেন। মেজো চাচার কাঁধে বসে আমি দেখতে গেলাম বেগম খালেদা জিয়াকে। আমার এই চাচা পাগল টাইপ ছিলেন, গ্রামের সবাই তাকে দরবেশ বলতো। নবম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ট্রেনের নীচে পড়ে গিয়েছিলেন – তারপর আরলেখাপড়া করা হয়নি তার। চাচা আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসতেন – আমাদের সবগুলো ভাইবোনকেই!

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়, তারপর নেমে আসে গভীর রাত। আমি চাচার কাঁধে বসেই ঘুমিয়ে পড়ি। রাত সাড়ে তিনটার দিকে খালেদা জিয়া আসে আমাদের গাঁয়ের স্টেশনে। চাচা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন। আমি ঘুম ঘুম চোখে আলো-আঁধারীর ভেতর দিয়ে আশ্চর্য সুন্দর একপরীকে দেখতে পাই। সেই পরীর প্রতি একধরনের আকর্ষণ বোধ করতে থাকি। চাচাকে বলি, " কাকা আমি খালেদা জিয়া কে বিয়ে করব। "

চাচা হাসতে হাসতে বলেন, " আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, আরেকটু বড় হলেই তোমাকে খালেদা জিয়ার সাথে বিয়ে দিব। "

আমি ঠিকই বিয়ে করেছি, না – খালেদা জিয়াকে বিয়ে করা হয়ে উঠেনি। চাচাও আমার বিয়ে দেখে যেতে পারেননি। নয় বছর আগেই মরে গিয়েছেন। মৃত্যুর সময় কাউকে কাছে পাননি একচামচ পানি খাবার জন্য। সম্পুর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঘুমের ভেতর মৃত্যুবরণ করেছেন আমার পাগলা চাচা।

৪.

দাদার মৃত্যুর আগপর্যন্ত আমরা গ্রামে ছিলাম। আটাশিতে দাদা মারা যাবার পর আমরা চলে যাই যশোর শহরের বেজপাড়ায়। বাবা তখন চাকুরী করতেন আবুল খায়ের লিটুর বেঙ্গল গ্রুপের একটি প্রতিষ্ঠান কুশল কর্পোরেশনের যশোর শাখার কর্ণধার হিসাবে। " কুশল কর্পোরেশন" বিদেশ থেকে সেচ যন্ত্র আমদানী করে তা কৃষকদের কাছে বিক্রী করতো।

আমাকে মুসলিম একাডেমীতে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় ষষ্ঠ শ্রেণীতে। স্কুলের পাশেই মোমিন গার্লস স্কুল। দিনগুলো খুব আনন্দেই কাটতে থাকে।

নব্বই সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় সামরিক শাসক এরশাদ এর বিরুদ্ধে। সুদুর যশোরেও তার ছোঁয়া এসে লাগে। একদিন এরশাদের পতন হয় – পতন হয় কুশল কর্পোরেশনের। আবুল খায়ের লিটু পালিয়ে যায় গোপনে। বাবা বিপদে পড়ে যান – কিভাবে কর্মচারীদের বেতন – ভাতা ইত্যাদি পরিশোধ করবেন এই ভেবে। নিজের বেতন কোথা থেকে আসবে সেটা ভেবে পান না আর

অফিসের আসবাবপত্র বিক্রি করে কর্মচারীদের বেতন মিটিয়ে দেন, নিজের ভাগ্যে কিছুই জোটে না আর একে একে কর্মচারীরা বিদায় নেয়, শুধু পড়ে থাকে মশিউর কাকা – বাবার এসিস্টেন্ট। একসময় মশিউর কাকার পক্ষেও আরপড়ে থাকা সম্ভব হয় না। তাঁর পরিবার, সন্তান সামলাতে তিনিও একসময় চলে যান ফরিদপুরে। আমাদের পরিবারে নেমে আসে ঘোর আঁধার। বাড়ি ভাড়া বাকী পড়তে থাকে মাসের পর মাস। বাবা সারাক্ষন চুপ করে বসে থাকেন – ভাবেন নিজের ভবিষ্যতের কথা – সংসারের কথা। বাবা সিগারেট খেতে খুব ভালোবাসতেন, প্রচুর খেতেন – ধোঁয়া দিয়ে এত অসাধারণ রিং বানাতে পারতেন, আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। একদিন দেখতে পাই বাবা ফাইভ ফাইভ ফাইভ ছেড়ে দিয়ে স্টার ফিল্টার এ নেমে এসেছেন।

দুঃখের দিনেও উৎসব আসে মানুষের জীবনে – রোজার ঈদ এসে পড়ে একসময়। আমার ছেঁড়া জুতো জোড়া বদলে এক জোড়া নতুন জুতো কেনার বায়না ধরি। বাবাকে জানাই, বন্ধুদের সাথে গিয়ে দাম দেখার কাজটা আগেই সেরে এসেছি – দাম মাত্র তিনশো বিশ টাকা।

মা ঢুকরে কেঁদে উঠেন – কারন জুতো কেনার মত তিনশো বিশ টাকাও তার কাছে ছিল না তখন। বাবা আরসহ্য করতে পারেন না। পরদিন সকালে উঠে কোথায় যেন চলে যান –এভাবে কয়েকদিন চলে। তারপর আমাদের সবাইকে নিয়ে ঈদের জামাকাপড় কিনতে যান। আমার জুতা হয়, শার্ট –প্যান্ট হয়। ছোটবোনগুলোর জন্য জামা কেনা হয়। শুধু মা আরবাবা কিছু কিনতে পারেন না। পরবর্তীকালে জানতে পেরেছিলাম আমার মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বাবা যশোরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের দরজায় গিয়ে গিয়ে সেচ-যন্ত্র সারাইয়ের কাজ করে কয়েকটা টাকা রোজগার করেছিলেন আমাদের ঈদের আনন্দটুকু কেনার জন্য।

ঈদের পর পরই বাবা চলে আসেন ঢাকায় কাজের সন্ধানে। চট্টগ্রাম থেকে ছোট চাচা-চাচী এসে আমার বড় বোনটিকে নিয়ে যায় তাদের কাছে – কে জানে? হয়তো ভাতের চাপ কমাতেই।

বাবা ঢাকায় এসে একটা কাজ জোগাড় করেন আড়াই হাজার টাকা বেতনের! যশোরে মা –আমি আরছোট্ট দুটি বোন নিয়ে পড়ে থাকি। বাড়িওয়ালা মিজান মামা ভাড়া নেয়া বন্ধ করে দেন অনেকদিনের জন্য। চরম দুঃসময়ে সংসারের হাল ধরেন আমার মা।

আমি প্রত্যেকদিন বাজারে যেতাম। ইলিশ মাছ দশ টাকায় একভাগ হিসাবে বিক্রি হতো। একভাগ ইলিশ মাছ কিনতাম আরপুঁই শাক। মাঝে মাঝে রুচি পরিবর্তনের জন্য আড়াইশো গ্রাম গরুর মাংস কেনা হত। প্রত্যেকদিনই ইলিশ মাছ – পুঁই শাক নতুবা গরুর মাংস এভাবেই চলতে লাগল। আমার বুদ্ধিমতি মা সবচেয়ে কম খরচে সংসার চালানোর জন্য এই ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।

ঢাকা থেকে মেজো চাচা গোপনে চাচীকে না জানিয়ে আমাদের জন্য কিছু টাকা পাঠাতেন – এদিকে মেজো চাচীও চাচাকে না জানিয়ে টাকা পাঠাতেন মায়ের নামে।

বাবা একদিন সিগারেট খেতে গিয়ে ভাবলেন, তিনি সিগারেট খেয়ে টাকা নষ্ট করছেন আরতার সন্তানেরা না খেয়ে আছে – তিনি হাত থেকে সিগারেট ফেলে দিলেন। সেদিনের পর থেকে আজপর্যন্ত কখনোই সিগারেট স্পর্শ করেননি আর

আস্তে আস্তে বাবার চাকুরীতে উন্নতি হতে থাকে। বেতন বাড়তে থাকে – আমাদের দেনা শোধ হতে থাকে। বিরানব্বই সালে আমরা চলে আসি ঢাকায়। আবার সুখের দিনগুলো ফিরে আসতে থাকে। আজবাবার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এগারোটি দেশ ভ্রমন ও একবার হজ্জ করার সুযোগ হয়েছে। সবই তার চাকুরীদাতার কল্যানে। অনেকেই আমার বাবাকে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া মাত্রই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে – আবার অনেকেই সেই ছুঁড়ে ফেলা বাবাকে পুনরায় বুকে জড়িয়ে ধরেছে পরম মমতায়।

৫.

গত কয়েকদিন ধরেই জুতা কেনার কথা ভাবছিলাম – সময়ের অভাবে কেনা হয়ে উঠছিল না। দেশ থেকে যে কয়েক জোড়া জুতা নিয়ে এসেছিলাম একবছর আগে; তা মোটামুটি বাতিল হবার পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছে। গত সতেরোই সেপ্টেম্বরে আরিফ জেবতিকের কাছ থেকে ছোট্ট একটি বার্তা পেলম – আমার ছেলেবেলা নিয়ে কিছু লিখতে হবে।

সারাদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে হাড় – ভাঙ্গা খাটুনি খেটে গভীর রাতে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক মাঝখানের রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে বাসায় ফিরছিলাম। স্মৃতিগুলো এসে ঝাঁপি খুলে দিল আমার সামনে।

বাসায় ফিরে গিয়ে বাতিল হয়ে আসা জুতো জোড়া চোখের সামনে তুলে ধরলাম। এ জুতোর গায়ে আমার দেশের মানুষের ঘ্রান – মাটির ঘ্রান লেগে আছে।

কিছু অপরিচিত মানুষের অপরিসীম ভালোবাসায় আমাদের পরিবারটি একটি চরম দুঃসময় পার করে এসেছে। আমার দেশের মানুষ তারা – তাদের ভালোবাসার ঋণ আমি কিভাবে শোধ দিই?

*Shahadat_mh@yahoo.com*

# একবাফের একহুত

**মোহাম্মদ আবদুল মুকিত**

---

১.
*"একবাফের একহুত,*
*মরি গেলে টুক্কুরুউউউটুক"*

এ রকমই নৃশংস, নিষ্ঠুর আর দয়ামায়াহীন স্লোক শুনে শুনে বড় হতে হয়েছে আমাকে। মনে আছে, ছোটবেলায় যেখানেই যেতাম, তা সে সুসম্পর্ক বা দুঃসম্পর্কের মামাবাড়িই হোক আরচাচাবাড়িই হোক, যখনই লোকে শুনত আমি বাবামা'র পাঁচসন্তানের মাঝে একমাত্র পুত্র, আরযাব কোথা! এমন করুণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাত যে মনে হত আমি বুঝি কালই মারা যাচ্ছি। একটু দুষ্টু শ্রেনীর চাচা-মামা-বড়ভাই গোছের বেয়াড়া লোকগুলো একগাল হলুদ-দাঁত-দেখানো-হাসি দিয়ে শুনিয়ে দিত সেই ভয়াবহ স্লোক,
*'একবাফের একহুত, মরি গেলে টুক্কুরুউউটুক'।*

কি ভয়ংকর কথা! আমি মরে যাব, সেটার ভবিষ্যদ্বাণী করে লোকে আবার 'টুক্কুরুটুক'ও দেয়! একবাপের একছেলে, তাই যেন বেঁচে থাকতে পেরেই আমার ধন্য হওয়া উচিত। আমাদের ছোটসময়ে বাবা-মারা সুখী পরিবার গড়তেননা, হালিখানেক সন্তান তো থাকতই, একটু সচ্ছল পরিবার হলেই সেটা দুই হালি পেরিয়ে ডজনের দিকে মোড় নিতে চাইত। সেখানে একবাপের একপুত একটা আলোচনার বিষয়ই ছিল, আরসেই একপুতটা যদি হয় ছোটখাট ধরনের দুর্বল টাইপের একশিশু, তাহলে তো আরকথাই নেই। লোকে স্লোক না বলে, 'জগতকি', 'জীবন কি', 'আমি কে' এসব নিয়ে ভাবতে বসবে নাকি? তবে, খালা,ফুপু, মামী বা চাচীশ্রেনীর মায়াবতী মহিলারা, যারা অতটা নিষ্ঠুরভাবে ভাবতে বা কথা বলতে পারতেননা, তারাও আমার মাথায় হাতবুলিয়ে মা'র দিকে করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে বলতেন, 'একটা মাত্র ছেলে, আল্লাহ খালি বাঁচায়ে রাখলেই হইল। ' মাও গলা মেলাতেন, 'দোয়া কইরেন আপা, যাতে সুস্থ্য থাকে। দেখেননা কি রোগা!'
শিশুরা নাকি তাদের যাবতীয় শিল্পিত আহ্লাদ আবদার না করলে বাবা-মারা তাদের এতঅত্যাচার সহ্য করতনা; ভেবে দেখুন, বাবা-মা সারাদিন কি পরিমাণ কষ্ট করে! সেই ফিরিস্তি দিতে যাচ্ছিনা, তবে এটা ঠিক যে অমন ছোটবাচ্চাটা যখন 'ফিক'করে হেসে তাকায়, বা আহ্লাদে চোখ-ভ্রূ কুঁচকে তাকায়, তখন বাচ্চার জন্য করা সারাদিনের কষ্টগুলোকে বাবামা'র কাছে পানিভাত মনে হয়।
মনোবিজ্ঞানীয় ব্যাখ্যায় উজ্জীবিত অনেকেই বলতে চান, শিশুরা নাকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এই আহ্লাদটা করে, ফাইট ফর সারভাইভাল বলেকথা।

তো, ঠিক সেই কারণে কিনা জানিনা, বাবা-মা'র এই 'একবাপের একপুতকে কোনভাবে বাঁচিয়ে রাখা'র প্রচেষ্টার জন্য আমি যে আলাদা একটা মনোযোগ তাঁদের কাছ থেকে পেতাম সেটা যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায় সেজন্যই হোক, অথবা কাকতালীয়ভাবেই হোক, তাঁদের দুঃশ্চিন্তার সাথে পাল্লা দিয়ে আমিও সেই ছোটবেলা থেকে সমানে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ঝামেলা বাঁধিয়ে এসেছি। সম্ভবতঃ বেচারারা একটা দিনের জন্যও এই বাড়তি মনোযোগকে একটু অন্যদিকে নিতে পারেনি, তবে আজওআমি নিশ্চিতনা সেটা আসলেই আমার ইচ্ছাকৃত ছিল কিনা। সাত-আটবছর বয়েস পর্যন্ত আমি বাবা-মার 'ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবতো!'জাতীয় টেনশটাকে একদমটপ সাসপেন্সে ভরপুর করে রেখেছিলাম।

যতদূর মনে করতে পারি প্রথম দুর্ঘটনাটা বাঁধালাম যখন আমার মেঝখালারা বাসায় বেড়াতে এলো আমার সমবয়েসী খালাত ভগ্নীটার সাথে কে কতবেশী পানি খেতে পারে এই নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমে আমি মগের পর মগ পানি গিলেই গেলাম, আরসে আমাকে ফাঁকি দিয়ে মগের পর মগ পানি বেসিনে ফেলে গেল। আমি দেখলামওনা সে কি করছে, আমার পাকস্থলীটাও বেসিনের মতো ছিলনা তখন, খেলায় হারতে বসে বেতাল-বেপরোয়া হয়ে পানি টেনেই গেলাম; ফলাফল অজ্ঞান হয়ে ঘন্টাখানিক পড়ে থাকা।

সেই চার বছর বয়েসের সময়েই আরেকবার বাবা বাজার থেকে ছোট দেখে একটা লাউ কিনে আনলেন; যতবারই বাবা লাউ আনতেন, আমার টার্গেট ছিল লাউটাকে দুইহাতে ওঠানোর চেষ্টা করা। বলাই বাহুল্য তখন পর্যন্ত একবারও আমি সফলহইনি। তো, সেবার লাউটা ছোট থাকায় আমি একটানেই উঠাতে পারলাম, আমার আনন্দ আরদেখে কে! মনের আনন্দে সেই লাউ হাতে সারাঘর ঘুরতে লাগলাম আরগাইতে লাগলাম, 'মামা-ভাইগ্না যেখানে, আপদনাই সেখানে। ' একটু পরে লাউহাতে গান গাইতে গাইতে যখন বাসার মোড়াটার উপর উঠলাম, তখনই ঘটল ঘটনা, যাকে বলে ধপাস ধরনীতল! পড়ে টড়ে মোড়াও ভাংলাম, নিজেও অজ্ঞান হলাম। এবারে উপরি হিসেবে মাথাটাও গেল ফেটে। বাবামা'র আবার সেই দৌড়াদৌড়ি, টেনশন 'ছেলেটা বাঁচবেতো!'।

তবে আরো ভয়াবহ ঘটনাটা ঘটল যখন ছয়বছর বয়েসে সন্ধ্যার খেলাশেষে বাসায় ফেরার পথে রাস্তা পার হতে গিয়েছিলাম। তাড়াহুড়োর মাঝে একলোকের সাইকেল বরাবর দিয়ে দিলাম জাম্প, কি বুঝে কে জানে? ফালফলটা হলো ভয়ংকর, তার সাইকেলের চাকার একটা স্পাইক আমার মাথায় সামান্য পরিমান ঢুকে গেল! মাথা ফেটে রক্তে সয়লাব (এখনও আমার খুলির ডানপাশটা একটু একটু ফুলে আছে), বাসার আশেপাশে মানুষ জমে গেল, আমাদের বিল্ডিংয়ের বড়ভাইরা লাঠিসোটা হাতে বেরিয়ে পড়লেন সাইকেলওয়ালাকে খুজেঁ বের করতে। বাবা-মা সেই বড়ভাইদের অনেক মানা করলেন, কিন্তু এমন সুযোগ কে ছাড়ে? রাতে সেই সাইকেলওয়ালা বেচারার মা-বাবা এসে আমাকে দেখে গেলেন, বড়ভাইদের অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করলেন। এদিকে এক্সিডেন্টের দিন সারারাত মড়ার মতো ঘুমালেও, পরদিনই ব্যান্ডেজ মাথায় খেলতে বেরিয়ে গেলাম, নিঃশব্দে বাসার দরজার ছিটকিনিটা খুলে। পাশের বাসার চারবছরের ছেলেটাকে বেদম কিলঘুষি মেরে বাসায় ফিরেছিলাম সেদিন। এদিকে ঝামেলা যেটা হয়ে গেল, বড়ভাইরা দেখলেই জিজ্ঞেস করে, 'বাবু, তোমার মাথায় ব্যাথা করে?' বাবা-মা অবশ্য আগেই আমাকে বলে দিয়েছেন যে ওরা ব্যাথা হয়কিনা জানতে চাইলে আমি যেন 'না' বলি, নাহলে আবার মারামরি বাঁধানোর পথ পাবে। যাহোক, সারাংশ হলো, সে যাত্রাও আমি বেঁচে গেলাম।

তবে বাবা-মাকে সবচেয়ে বড় টেনশনে ফেললাম আটবছর বয়েসে। একদিন সকালে খেলতে নেমে দেখি মতিঝিল কলোনীর পাশে আইডিয়াল স্কুলের সামনের বড় রাস্তায় কোন গাড়ীঘোড়া নেই। 'হরতাল' না কি যেন হচ্ছে, একটু পরে নাকি আবার 'কারফিউ' না কি যেন হবে। হরতাল/কারফিউ আমাদের কাছে কোন বড় বিষয় ছিলনা, রাস্তা ফাঁকা এটাই হলো আসলকথা। আমি আরসাবু মিলে রওয়ানা দিলাম আম্মার মামার বাসায়, তাঁরা থাকতেন মৌচাকে, এবং যাওয়ার উদ্দেশ্য হলো সেবাসায় বেড়াতে গেলেই সেই নানু মজার মজার চমচম খাওয়াতেন। সাবুকে এর আগে অনেক শুনিয়েছি সেই চমচমের কাহিনী, কিন্তু রিক্সাভাড়া নেই দেখে নিয়ে যেতে পারিনি; গাড়ীঘোড়া নেই, এই মোক্ষম সুযোগ কিভাবে ছাড়ি! বড় রাস্তায় ফুটবল-টল খেলে আমরা যখন রওয়ানা দিলাম তখন সম্ভবতঃ কারফিউ শুরু হয়ে গিয়েছিল; তবে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কাছে যাবার আগে আমরা বুঝতেও পারিনি কি হচ্ছে, রাস্তায় মানুষজন কম দেখে আমরা বরং খুশী, রাস্তার মাঝখানে জমিদারের মতো হাঁটতে লাগলাম আমি আরসাবু। কিন্তু ঝামেলাটা বাঁধল যখন পুলিশের তাড়া খেলাম রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কাছে, তাড়া খেয়ে ঢুকলাম মোমেনবাগের কোন একবাসায়। সে আরেক বিশাল কাহিনী, আরেকদিন বলা যাবে। বিকেল চারটায় যখন কারফিউ শিথিল হলো, সেই বাসার ড্রাইভার আমাদের বাসায় পোঁছে দিয়েছিল। বাসায় ফিরে বাবা-মার চেহারা দেখে সেদিন আসলেই অপরাধবোধ হয়েছিল, আমি

ভেবেছিলাম ভীষন বকা খাব, অথচ ওঁরা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। সেই কারফিউর ছয়ঘন্টা বাবা-মা কিভাবে কাটিয়েছিলেন, আমি আজওজিজ্ঞেস করার সাহস পাইন।
ঋণের বোঝা আরকতইবা বাড়ানো যায়?

২.

একবাপের একপুতকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই হয়, এই ব্রত নিয়েই বাবা-মা ব্যাস্ত থাকার কারণে আশপাশের আর দশটা ছেলেমেয়ের চেয়ে অনেক আরামে বড় হয়েছি আমি, এটা স্বীকার করতে কোন আপত্তি নেই। পড়াশোনা করে গাড়ী-ঘোড়া চড়তে হবে এমন কথা কখনও শুনতে হয়নি, করল্লাভাজি বা কাঁকরোলের ঝোল খেতে আপত্তি জানালে বকাবাদ্য বা চড়থাপ্পড়ও খেতে হয়নি, আবার পাশের বাসার ছেলেটাকে ল্যাং মেরে সাঁই করে সিঁড়ি টপকে বাসার দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ার পরও সবাই যখন বুঝতে পারত 'বদমাশটা আবার একটা কুকর্ম বাঁধিয়ে এসেছে' তখনও বাবা-মা'র চোখরাঙানি খেতে হয়নি।
আর পরীক্ষার রেজাল্ট যে কোন সমস্যাই ছিলনা,সেটা বলাই বাহুল্য।

এটুকু পড়ে অনেকে ভাবতেই পারেন যে ছোটবেলায় আমি খুব আদরে ছিলাম, তবে ব্যাপারটা আসলে ঠিক তা না। ব্যাপারটা এমন না যে দুধের সরটুকু সবসময় আমাকে দেয়া হতো, বা মুরগীর রানটা আমাকে দেয়া হতো, বা পরীক্ষায় আমি ভাল করলে বাবা-মা যতটা খুশী হতো বা আনন্দ করত, আমার বোনেরা ভাল করলে ততটা করতনা। ব্যাপারটা শুধু এই যে, আমি যে বেঁচে আছি, এটা দেখতে পেরেই বাবা-মা খুশী ছিলেন; তাই আমি মারামারি করে বখে গেছি, বা বোকাসোকা বলে অংক বুঝিনা, এসব তাদের কাছে কোন বিবেচনার বিষয়ই ছিলনা। তবে মজার ব্যাপার হলো, সেটা টের পেয়েই হোক, অথবা কাকতালীয়ভাবেই হোক, সেসুযোগ আমি হাড়ে হাড়ে ব্যবহার করেছি। আর আমাকে এসুযোগ ব্যবহারে সব সময়েই পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে আমার ভীষন উদার বাবার আস্কারা। তবে এই আস্কারাটা ঠিক ওয়ান-ওয়ে ছিলনা, আমিও খুব বাবা-ন্যাওটা ছেলে ছিলাম।

তখন অফিসটাইম ছিল দুপুর দুটা পর্যন্ত, মা বারোটার দিকে গোসল করিয়ে চুল আঁচড়ে দিতেন। আপুরা সাধারণত স্কুল থেকে ফিরে রেডিও শুনত বা বাড়ির কাজ (ইদানিং লোকে হোমওয়ার্ক বলে) করত, আর আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম কখন বাবা আসবে। বারান্দার রেলিং ছিল উঁচু, এমনি দাঁড়িয়ে বাইরে দেখা যেতনা; তবে রেলিঙে ফাঁকা ঘরের মতো তিন সারি খোপ ছিল, সবচেয়ে নিচের খোপে পা রেখে বারান্দায় ঝুলে ঝুলে অপেক্ষায় থাকতাম কখন বাবা আসবে।

বাবার একপা খোড়া, তিনি সবসময়েই সামনের দিকে ঝুঁকে আস্তে আস্তে হাঁটেন, কাজেই অনেক দূর থেকেও তাঁকে চিনে নিতে কষ্ট হতনা। মনে আছে বাবা যখন হাঁটতে হাঁটতে কলোনীর গেট দিয়ে ঢুকতেন, আমার অদ্ভুত রকমের ভাল লাগত; একলাফে রেলিং থেকে নেমে 'আব্বা আসছে, আব্বা আসছে' বলতে বলতে দরজার দিকে ছুটে যেতাম, দরজা খুলে দিতাম। উপরের ছিটকিনি আটকানো থাকলে আম্মাকে এসে টানাটানি শুরু করে দিতাম। তারপর বাবা যখন বাসায় আসতেন তখন খালি তার আশপাশেই ঘুরঘুর করতাম।

আজওজানিনা কেন ব্যাপারটা এতএক্সাইটিং ছিল। একটা কারণ হতে পারে বাবা আমাকে নিয়ে হাঁটতে বের হতেন প্রায়ই, যে জায়গাগুলোকে খুব দূরের মনে হতো, আমি ভাবতাম একা যাওয়া যাবেনা, যেমন কমলাপুর রেলস্টেশন, তারপাশের রেস্ট হাউজ, নটরডেম কলেজ, ফকিরেরপুল বাজার, সেসব জায়গায় যেতাম বাবার হাত ধরে।
বাবা সাধারণত দুটো বিস্কুট কিনে দিতেন, সারাপথ হেঁটেও দুটো বিস্কুট ফুরোতনা।

এখন মাঝেমাঝে ভাবি, আমি নিজে যে ব্যাস্তসময় কাটাই অফিসে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত দশটা, একটাদিনও কি পাব নিজের সন্তানকে এমন একান্ত আপনকরে একহাতে ছোট দুটো বিস্কুট ভরে, আরেকটি ছোট্টহাতকে অনেক অনেক ভালবাসায় গ্রিপ করে কিছুক্ষণ ধরে হাঁটতে? আমার সন্তান কি নিয়ে তার শৈশবের স্মৃতিচারণ করবে? তার শৈশবের প্লেস্টেশনের গেমগুলো বা আইপডের নস্টালজিক সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে?
বাবাকে দেখলেই ফিক করে হেসে দিতাম বা তার আশপাশে সারাক্ষণ ঘুরঘুর করতাম, একারণেই হোক অথবা আমি তার অতি আদরের একমাত্র পুত্রসন্তান একারণেই হোক, ১২/১৩ বছর বয়েস পর্যন্ত বাবা আমাকে কোনদিন মারেননি, বা বকেননি। আমি জানিনা সেটা আমাকে কতটুকু উপকার করেছে বা অপকার করেছে, তবে এখনকার আমার জন্য সেটা ভীষনরকমের একটা সুখস্মৃতি হয়ে রয়েছে।

ক্লাস টুতে থাকতে মনে আছে, ইংলিশ ম্যাডামকে দুই চোখে দেখতে পারতামনা। কারণটা খুব সহজ, ইংলিশ পড়তে বিরক্ততো লাগতই, তার ওপর ম্যাডাম একগাদা হোমওয়ার্ক/ক্লাসওয়ার্ক করাতেন প্রতিদিন। আরপড়া না পারলে কানে ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতেন। ইংলিশ ম্যাডামের অত্যাচার যখন শেষ সীমায় পৌঁছে গেল, আমি তখন মনে মনে ভাবছি আরস্কুলে যাব কিনা।
তখন গরমের ছুটি সিস্টেমটা ছিল, আমি ঠিক করেছিলাম গরমের ছুটি পর্যন্তই, এরপর গরমের ছুটিতে যখন দেশের বাড়ী যাব তখন পালিয়ে যাব।

সেদিন ছিল গরমের ছুটি শুরু হবার আগের দিন। আগের পাঁচ-ছয়দিন টানা কানধরে দাঁড়া খাওয়া খেয়ে আমি ক্লান্ত, কোনভাবেই ইংলিশ ম্যাডামের মুখ দেখতে চাচ্ছিনা। আবার প্রথম পিরিয়ডেই হলো ইংলিশ ক্লাস। আমি স্কুলগেট পর্যন্ত গিয়ে আর পা বাড়াতে পারলামনা, ফিরে এলাম। এখন বাসায়ওতো যাওয়া যাবেনা! কি মুশকিল! সেই বয়সে অত গভীরভাবে ভাবার অবস্থা ছিলনা, আমি স্কুলগেটের একটু দূরে থাকা বটগাছের নিচে একপাশে লুকিয়ে থাকার মতো করে দাঁড়িয়ে রইলাম।
প্ল্যান ছিল স্কুল ছুটি হওয়া পর্যন্ত এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকব,
তারপর আরআমাকে পায় কে? দেশে গিয়ে তো পালাবই।

কিন্তু বিধি বাম! আইডিয়াল স্কুলের পাশেই যে মসজিদ, সেখানে হুজুররা (আমরা বলতাম ওস্তাদজী, ঈমাম হলেন বড় ওস্তাদজী, মুয়াজ্জিন মেঝ ওস্তাদজী আরবাকীরা সবাই র ছোট ওস্তাদজী ) বাচ্চাদের আরবী পড়াতেন বিনা পয়সায়। সকালে ছেলেদের, দুপুরে মেয়েদের। তো ঝামেলা বাঁধালো এই ওস্তাদজীর ছাত্রেরা, মানে কলোনীর বড় ভায়েরা। তারা হয়ত তখন সিক্স-সেভেন-এইটে পড়ে, সকালে আরবী শিখে মসজিদ থেকে ফিরছিল। আমি গাছের আড়াল থেকে ভয়ে ভয়ে দেখছি, হঠাৎই শিল্পী ভাই দেখে ফেলল আমাকে। অনেক বুঝিয়েও যখন আমাকে নড়াতে পারলনা, তখন তারা হাল ছেড়ে চলে গেল। আমি খুব অনুনয়-বিনয় করে বললাম, বাসায় যাতে কিছু না বলে। যা হবার তাই হলো, পাঁচ মিনিটও যায়নি, দেখি বাবা আসছে, ঠিক সেই গাছটাকে লক্ষ্য করেই। এর আগপর্যন্ত আমি কোনকিছু খারাপ করলে, যেমন কারো সাথে মারামারি করে বাসায় ফিরলে, যদি সেটা বাবার কানে যেত তাহলে তিনি একটা অদ্ভুত শীতল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতেন। যেটার মানে ছিল, 'ছিঃ, তোমার কাছে তো এটা আশা করিনি। ' টাইপের কিছু। কিন্তু সেদিন বাবাকে আসতে দেখে আমার মনে হলো, আজশুধু শীতল দৃষ্টি খেয়ে পার পাবনা, আজবেশ কড়া ধরনের ধুনো খেতে হবে। আমার আত্মা শুকিয়ে গেল। আমি মনেমনে দুরুদ পরা শুরু করলাম, 'আল্লাহ বাঁচাও, আল্লাহ তুমি ছাড়া আরকে বাঁচাবে?'।

বাবা আসলেন, আমি ভয়েভয়ে মাথা তুলে তাকালাম, আমার মাথায় কোন অজুহাত কাজ করছেনা যেটা বলে পার পাব, অথচ দেখি তিনি আমার চেহার দেখে ফিক করে হেসে দিলেন।
বাসায় যাবার পথে বাবা আজিজভাইর দোকান থেকে আমার পছন্দের পাউরুটি কিনে নিয়ে গেলেন, সেদিন অফিস ছুটি নিলেন, পরদিন আমাদের সবার বাড়ি যাবার কথা, বাড়ী যাওয়া উপলক্ষে আমাকে সাথে নিয়ে দুটো জামাও কিনে আনলেন। দুঘন্টার মধ্যে আমি নিজেই ভুলে গেলাম যে আমি আজ স্কুল পালিয়েছি। আজ অনেকদিন পর ভাবতে বসে মনে হচ্ছে, সেদিন স্কুল পালানোর জন্য মার খেলে সেটা হয়ত সেটা আমার নেশা হয়ে যেত।

তবে বাবার কারিশমা আরও চমৎকারভাবে বুঝলাম আরো পরে, ক্লাস সিক্সে। ক্লাসফাইভের বৃত্তি পরীক্ষার জন্য পাগলের মতো খেটে, গোটা বিশেক মডেল টেস্ট দিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছি। তখন আইডিয়াল আরসেন্ট্রাল গভঃ এর মধ্যে বৃত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি হতো মতিঝিল থানায়, সেন্ট্রাল গভঃ সরকারী বলে একটা পার্শিয়াল্টি আছে এমন একটা কথা আইডিয়ালের পুঁজিবাদী স্যাররা পোলাপানের মাথায় ঢুকিয়ে দিতেন, ফলে আমাদের নাকেমুখে পড়াশোনা করতে হতো। তো বাইবেলের বাণীর মতো সত্য যেটা হয়ে গিয়েছিল তা হলো, বৃত্তি পেতে হলে অংকে ১০০ পেতেই হবে, কারণ এটায় একটু ভুল হলেই গেল, পুরো ১০ নাম্বারটাই গেল! অংক নিয়ে তাই টানটান উত্তেজনা, পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রথমে পুরো প্রশ্নে চোখ বুলিয়ে যখন দেখলাম, নাহ্ সব অংকই করা আছে, উত্তেজনা কমল, মাথা ঠান্ডা করে পরীক্ষা দিয়ে আসলাম। বের হতেই দেখি গেটে বাবা দাঁড়িয়ে, অফিস থেকে সরাসরি চলে এসেছেন, হাতে আমার অতি অতি পছন্দের সিঙাড়া। আমি সিঙাড়া খাচ্ছি আর বাবার সাথে কি কি যেন বলছি। বাবা একবার জিজ্ঞেসও করেননি কোন অংকের উত্তর কত শুধু বেরহবার পর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেমন হয়েছে', আমি বলেছি 'খুব ভাল'। বাপে ছেলেতে হেঁটে হেঁটে স্কুল কম্পাউন্ডের বাইরে আসব এমন সময় পাশের আরেক বাবা-সন্তান জোড়ার কথোপকথনে শুনতে পেলাম। ছেলে বাবাকে বলছে, 'ছয় নাম্বার প্রশ্নের অংকের রেজাল্ট ৩৯। ' আমার মাথায় বাজ পড়ল ! কারণ আমি ছয়নাম্বারের রেজাল্ট লিখেছি ৩৭! বাজটা আরো ভয়াবহ মনে হলো যখন শুনলাম ছেলেটার বাবা বলছেন, 'রাইট'। আমি তড়িৎগতিতে প্রশ্ন বের করে দেখি, ব্যাটারা কাবিলাতি করে বইয়ের অংকই তুলে দিয়েছে, শুধু সংখ্যাটা একটু বদলে দিয়েছে। আমি বাবার হাত শক্ত করে ধরে ফললাম, যেন আমার ভয়াবহ সর্বনাশ হয়ে গেছে এমন চেহারা করে বললাম নিজের ভুলের কথা। বাবা পাঁচসেকেন্ডের মতো চুপচাপ ছিলেন, তারপর আবার সেই মুখভরা মনজুড়িয়ে দেয়া স্মিতহাসি। বললেন, 'কিছু হবেনা। তুমি স্কলারশীপ পাবেই। তবে শোন, আরকাউকে বোলনা যে তোমার অংক ভুল হয়েছে, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে সবগুলো অংক হয়েছে। '

আমি জানিনা কি হলো, তবে তাঁর সেই কথায় আমি ভালবোধ করতে লাগলাম। পথে এক ক্লাসমেইটের সাথে দেখা, ওরও বাবা সাথে। জিজ্ঞেস করল, আমি বললাম'সব অংকের ফল মিলছে। ' দেখলাম ওর বাবা ওর মাথায় চাটি মেরে বলছেন,'দূর গাধা, তুই ক্যামনে দুইটা অংক ভুল করলি!' বাসায় এসেও সবাইকে বললাম সব অংক হয়েছে, বিকেলে খেলতে গিয়েও সবাইকে বললাম সব অংক হয়েছে, পরীক্ষা শেষে যেখানে যেখানে বেড়াতে গেলাম সবাই বৃত্তি পরীক্ষার কথা জিজ্ঞেস করে, আমি বলি খুব ভাল হয়েছে, সব অংক হয়েছে। মাসখানেকের মাথায় আমি ভুলেই গেলাম যে আমার একটা অংক ভুল ছিল, একশভাগ গোয়েবলসীয় ইফেক্ট।

যেদিন বৃত্তি পরীক্ষার রেজাল্ট দিল, আমার মহা আনন্দ কে দেখে। আমি বৃত্তি পাব আশা করলেও ট্যালেন্টপুল আশা করিনি, কারণ স্কুলেই আমার চেয়ে ভাল করত অন্ততঃ দশজন। সেখানে ট্যালেন্টপুলে আমাদের স্কুলে বৃত্তি পেয়েছিল মাত্র ২ জন। সেই ট্যালেন্টপুল পেয়ে আমি আনন্দে নাচছি, যাকে সামনে পাচ্ছি তাকেই বলছি, 'জানেন, আমি বৃত্তি পাইছি'।
তখন ছিল রমজান মাস, ইফতারের সময় স্পেশাল আয়োজনে বাবা বড়বড় জিলিপি নিয়ে এলেন। ইফতার খেতে খেতে বাবা সবার কাছে ফাঁস করেদিলেন সেই সত্যটা , আমার যে একটা অংক ভুল হয়েছিল; অনেকদিনপর আমার

নিজেরও মনে পড়ল, আরে তাইতো! এক অংক ভুল হয়েও আমি বৃত্তি পাইলাম! আমার আনন্দ আরো বেড়ে গেল। ইফতার খেতে খেতে বাবা যখন সবাইকে রসিয়ে রসিয়ে পুরো গল্পটা বলছিলেন তখন তার দুচোখের কোণে অশ্রু। আমি খুব ভালকরে লক্ষ্য করেছিলাম।
বাবা এখন অনেক বয়স্ক। ৬৭/৬৮ হবে। এই বয়েসে মানুষ তাঁর সারাজীবনের স্মৃতিচারণ করেন, কারও সাথে কথা বলতে গেলে অজান্তেই নিজের জীবনের নানাকথা নিয়ে আসেন কথার ভেতর।

আজওযখন দেশে যাই, মাঝে মাঝে দেখি বাবা মহাউৎসাহে কাউকে শোনাচ্ছেন সেই গল্প, তার দুচোখের কোণে অশ্রু জমা।
আমার মনে হয়, জন্মেছি, ঠিক করেছি, একদম ঠিক করেছি।

# বাবাকে মনে পড়ে

**শেখ জলিল**

---

জীবনের তেত্রিশটি বছর আমার বাবা ছিলেন সার্বক্ষণিক আশীর্বাদাতা। বাবা আজবেঁচে নেই। রয়ে গেছে বাবাকে ছেলেবেলার কিছু স্মৃতিকথা। আসলে মা-বাবাকে নিয়ে কতোটুকু লেখা যায়! পৃথিবীর তাবৎ সমুদ্রের জলকে কালি করে লিখলেও কী শেষ হবে তাঁদের ঋণের কথা?

প্রতি বছর এই সময়টাতে বাবাকে মনে পড়ে বেশি। অক্টোবর ৬, বাবার মৃত্যুদিবস। মৃত্যুদিবসে আমরা ভাইবোনেরা আসলে তেমন কিছুই করি না। বাবার জন্য একমাত্র দোয়া-দরুদই সম্বল। কেউ কেউ নিরবে নিভৃতে চোখের পানি ফেলেন। যেমন আমি নিজে। যে ঘটনার জন্য আমার চোখে বেশি পানি আসে সে কথাই বলবো আজ
আমার বাবা তেমন শিক্ষিত ছিলেন না। প্রাইমারির দোরগোড়া পেরিয়েছিলেন হয়তো। কৃষিই মূলত পেশা ছিলো তাঁর। ভালো আরবি পড়তে পারতেন তিনি। বাংলায় চিঠি লেখা, হিসাব রাখা, বই পড়ার সামর্থ্যও ছিলো বেশ ভালো। বাবার হাতের লেখা খুব আবছা মনে পড়ে। হ্যাঁ, ভালোই তো ছিলো। শেষ জীবনে বাবা গ্রামের মসজিদের ইমামতি করতেন। সে তুলনায় আমরা ভাইবোনেরা তেমন ধর্ম-কর্ম করিই না বলতে গেলে।

তবে আমার বাবা একটাই বড়ো কাজ করে গেছেন। আমাদের সব ভাইবোনদের ভালোমতো মানুষ করেছেন। আমার বোনদের ভালো বিয়েও দিয়েছেন। সহায়-সম্পত্তি বলতে যা ছিলো তা আমাদের জন্য খুইয়েছেন। সে বিষয়ে আমাদের ভাইবোনদের ভেতর কারো তেমন কোনো আফসোস নেই। কারণ জীবন চলার পথে আমাদের মেধাকে তিনি উত্তোরণ ঘটিয়েছেন প্রচন্ডভাবে। সেটাই আমাদের সবার সবচেয়ে বড়ো সম্পত্তি। আরসেজন্যই আমরা লেখাপড়া জানা এবং প্রায় সবাই চাকুরীজীবি।

আজএকটি ঘটনায় স্মরণ করবো আমার মরহুম বাবাকে। ১৯৭৪ সালের কথা। সারা দেশে দুর্ভিক্ষের ঝড় বয়ে গেছে। আমারাও সে ঝড়ের কবল থেকে বাদ যাইনি। তবু বাবা লেখাপড়া থামিয়ে দেননি কারোরই।

আমি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা দিতে গিয়েছি থানা সদরে। সাথে আছেন আমার বাবা। প্রথমদিন সকালে ছিলো বাংলা পরীক্ষা। মানুষের প্রচন্ড ভীড়। মনে পড়ে-বাংলা রচনা কমন পড়েনি কারো। 'দুর্ভিক্ষ',‘ লঙ্গরখানা’ নিয়েও রচনা এসেছিলো। আমি লিখেছিলাম ‘ আদর্শ গ্রাম’। পরীক্ষার আগে পড়েছিলাম ‘ আমাদের গ্রাম’। সেখান থেকেই একটু বুদ্ধি খাটিয়ে লিখেছিলাম ‘ আদর্শ গ্রাম’।

পরীক্ষা প্রায় শেষ। বাইরের মানুষের চাপ বাড়ছে হলের দিকে। তাছাড়া আমার মাথার উপর পেছনে কেউ না কেউ এসে দাঁড়িয়ে থাকছে। এক শিক্ষক আরেক শিক্ষককে বলছে। এক পুলিশ আরেক পুলিশকে বলছে। সবাই একবার এসে আমার খাতা দেখার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে একটু ভয়, একটু অস্বস্তিও কাজ করছে। তবে পরে আর ভয়ের তেমন কিছুই মনে হয়নি। কারণ তারা আমার হাতের লেখা এবং কী লিখি সেটাই দেখছে। আরঅন্যের কাছে প্রশংসার বাণী ঢেলে তাকেও উদ্বুদ্ধ করছে আমার কাছে আসতে।

যাই হোক, প্রায় শেষ করে ফেলেছি ‘ আদর্শ গ্রাম’। ভীড় ঠেলে বাইরের মানুষ ছুটে আসছে ভেতরের দিকে। হলের শিক্ষক, গার্ডরাও পড়ে গেছেন বেকায়দায়। তখনও পরীক্ষার মিনিট পাঁচেক বাকি। আমিও গুছিয়ে এনেছি রচনার শেষাংশ- সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের গ্রাম একটি আদর্শ গ্রাম। হঠাৎ করেই এক শিক্ষক এসে ছোঁ মেরে

আমার খাতা নিয়ে গেলেন। অন্যান্যদের খাতাও নেয়া প্রায় শেষ। যে শিক্ষক আমার খাতা নিলেন তাকে শুধু বললাম- স্যার, আমার খাতা কিন্তু স্ট্যাবলার করা হয়নি। শিক্ষক বললেন- ঠিক আছে, করে নেবো।

একটু পরে দেখি আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক এসে হাজির। উনাকে আমার খাতা স্ট্যাবলারের কথাটা বললাম। উনি সামনে গিয়ে নিশ্চিত হয়ে এলেন। কীভাবে হঠাৎ বাবা ভেতরে চলে এসেছেন বুঝতে পারিনি। সেই বুড়ো বয়সেও বাবার গায়ে তাহলে বেশ শক্তিই ছিলো! না হলে এতো ভীড় ঠেলে কীভাবে এলেন বাবা? কখন যে তাঁর কোলে উঠে গেছি বুঝতেই পারিনি।

বাবা আমাকে ভীড়ের মধ্যে কোলে করে হল থেকে বেরুচ্ছেন। আমার বেশ শরম লাগছে। যদিও হলের অন্যান্য সব ছাত্রদের চেয়ে সাইজে বেশ ছোটোই ছিলাম। আবার বেশ আনন্দও লাগছিলো। কারণ একটু বড়ো হয়ে জ্ঞান হবার পর ওটাই ছিলো আমার প্রথম এবং শেষবার বাবার কোলে ওঠা।

আজ্মাবাকে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ঐ কোলে ওঠার দৃশ্যের কথা। ভীষণ দুষ্টু ছিলাম ছোটোকালে। কবুতরের খোপে ডিম ঘাঁটা-বাচ্চা দেখা, চড়ুই পাখি-ঘুঘুর বাসা থেকে বাচ্চা এনে খাঁচায় পালন, বেশ উঁচু গাছে ওঠা-ফল পাড়া, রাগের মাথায় লাউ গাছ গোড়া থেকে কেটে ফেলা- এসবের জন্য কতো মারই না খেয়েছি বাবার হাতে। তবু বাবাই ছিলেন আমার আদর্শ। মাঝে মাঝে মা'র কাছেই বলি বাবার নানান প্রশংসার কথা।

আমি সেবার প্রাথমিক বৃত্তি পেয়েছিলাম। তখন উপজেলাভিত্তিক টেলেন্টপুল বা মেধা তালিকা ছিলো না। ছিলো জেলাভিত্তিক তালিকা। আমি হয়েছিলাম সমস্ত টাঙ্গাইল জেলায় মেধা তালিকায় প্রথম। শিক্ষাজীবনের সাফল্যগুলো যতোবারই মনে হয় ততোবারই মনে পড়ে আমার প্রিয় বাবার কথা। আজএই দিনটাতে একটাই কথা বলতে ইচ্ছে করছে শুধু- বাবা তুমি জান্নাতবাসী হও, অনেক অনেক ভালো থেকো পরপারে!

** লেখাটি পূর্ব প্রকাশিত*

# ছোটশুমার রোজা রাখা

**হাসিব মাহমুদ**

---

*( ছেলেবেলার গল্প লিখতে গিয়ে সবাই মজার মজার লেখা লেখে। আমি কেন যেন মজার কোন লেখা বের করতে পারলাম না। আমি এখন যে শহরে থাকি এখানে আমি একাই বাঙ্গালি। সারাদিন একা কাটানোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়তো এটা। )*

আমি রোজা রাখা শুরু করি সম্ভবত ' ৮৫ সালের দিকে। খিলগাঁও ঝিলপাড় মসজিদের ঠিক উল্টোপাশের বাসাটাতে থাকতাম। বাসার মুখোমুখি মসজিদ হওয়ায় পাঁচওয়াক্ত নামাজেই মসজিদে আসা যাওয়া চলে। বাসায় একটু আলাদা খাতির যত্নও পাওয়া যেতো এজন্য। এতটুকু ছেলে রোজা রাখছে মসজিদে যাচ্ছে এটা দেখে আম্মা-নানী খালাদের মুখে ছেলে-মানুষ-হচ্ছে ধরনের স্নিগ্ধ পরিতৃপ্তির ভাব খেলা করতো।

বড়রা যাই ভাবুক, আমার কাছে ঐ মসজিদে যাওয়ার কারন ঠিক নামাজের জন্য বা বয়ান শোনার জন্য ছিলো না। একা একা বের হয়ে একটু বড়-বড় ভাব উপভোগ একটা বড় কারন ছিলো। তখন সবে মাত্র একা একা মাঝে বাইরে হবার অনুমতি পাই বাসা থেকে। নামাজের উছিলায় রাত বিরেতেও তখন একা বেরনো যেত। বোনাস হিসেবে পাড়া ও স্কুলের বন্ধুদের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত আড্ডাও চলতো ধুমছে। মোট কথা রোজার মাসটা পুরোটা জুড়েই একটা উৎসব উৎসব ভাব সবার মধ্যে চলে আসতো।

রোজার মাসটাতে সবচেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপার ছিলো রাতে উঠে সেহরী খাওয়া। যতই আগে শুই না কেন রাতে ঐসময়টা ওঠাটা খুব কষ্টকর তখনও ছিলো, এখনো আছে। আরভোরবেলাতে মসজিদেও তেমন কোন বন্ধুবান্ধব যেত না। ঘুমে ঢুলু ঢুলু অবস্থায় সেজদা দিতে গিয়ে মনে হতো সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ি।

তো কোন মতে বাসায় এসে আবার ঘুম। একটু ঘুমিয়ে আবার স্কুলে দৌড়। সেই সময় রোজার মাসে ক্লাস সংক্ষেপ করে ছোট করে ফেলা হতো। এর সুবিধা ছিলো এটা যে যেসব অত্যাচারী ত্রাসসৃষ্টিকারি স্যারেরা লিকলিকে বেত হাতে ক্লাসের একোনা থেকে ওকোনা সবাইকে পড়া ধরতো তাদের স্ট্রাটেজি চেঞ্জ করে র্যানডম পদ্ধতিতে পড়া ধরতে হতো। মুখটা একটু হাসিহাসি ও কনফিডেন্টলি স্যারের চোখে চোখ দুএকবার রাখতে পারলেই মোটামুটি নিশ্চিত পরিত্রান ছিলো। এর ওপর আরেকটা শান্তির ব্যাপার ছিলো যে সপ্তাহে একবার রোদের মধ্যে দাড়িয়ে পিটি নামের শারীরিক অত্যাচার সেশন থেকে রেহাই পাওয়া যেত রোজার মাসটাতে।

বাসায় আসাতক রোজা ব্যাপারটা টের পাওয়া যেত না। বাসায় ফিরলেই রোজা ধরা ব্যাপারটা শুরু হতো। আমি যেবার প্রথমবার রোজা রাখি তখন ইফতার হতো সন্ধ্যা সাতটা থেকে সোয়া সাতটার ভেতর। গরমের দিনে এরকম বড় সময় না খেয়ে থাকাটা বড়দের জন্যই কষ্টকর হতো। আমি তো কোন ছার। অবশ্য আমি একটা সমাধানও বের করেছিলাম। চুপি চুপি বাথরুমে ঢুকে কয়েকঢোক পানি খেয়ে নিতাম। আরসেটাতেও না হলে বিকাল বেলাটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতাম। বিকালে ঘুমানো না ঘুমের ভাব নিয়ে মটকা পড়ে থাকার আরেকটা কারন ছিলো আব্বা। রোজার সময় তাঁর মেজাজ বেলা পড়ার সাথে সাথে উত্তোরত্তর বাড়তে থাকতো। বাঙালীর আরপাঁচটা আচার অনুষ্ঠানের মতো ইফতারের সময়ও তার সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করার বাতিক তাঁর ছিলো। তখনকার দিনে মগবাজারে আলাউদ্দিনের সমুচা, মাংস বা পনিরের নিমকি, কাবাব, গ্রান্ড সন্সের দই মিষ্টি এগুলো ছিলো তার নিত্তদিনের বাজার। সাথে খিওগাও বাজারের সব ধরনের ফল। আম্মার সাথে আব্বার এই বাজার করা নিয়ে খিটিমিটি প্রায় প্রতিদিনের ব্যাপার

ছিলো। টাকা না থাকলে কেন বাকীতে কেনা হবে এটা ছিলো খিটিমিটির মুল কারন। আম্মার যাবতীয় আর্গুমেন্টের বিপক্ষে আব্বার কথা ছিলো একটাই – "ছোটশুমা থেকে খাইয়ে আসতিছি আর এখন তুমি আমারে খাওয়া শিখাও! আব্বার ছোট শুমা (ছোট সময় বা ছোটবেলা) কেমন ছিলো সেই প্রশ্ন কেউ না করলেও কেন যেন আমার এই প্রশ্নটা জাগতো। নিতান্ত গ্যাদাকালেই পিতৃহীন অবস্থায় আব্বার ছোটশুমাটা ভালো কাটেনি সেটা আমি তখনই বুঝতাম। কিংবা কে জানে তার হয়তো ভালো খাওয়া দাওয়ার কোন স্মৃতি আছে। আবার এওহতে পারে নিজের ছোটশুমায় তিনি যেসব জিনিস থেকে বঞ্চিত ছিলেন সেসব থেকে তাঁর ছেলেপেলেরা যাতে বঞ্চিত না হয় সেটার জন্য হয়তো তিনি এসব করতেন। ঠিক কারনটা কখনো জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি।

রোজার একটা স্মৃতি বিদেশে আসার পর প্রায়ই মনে পড়ে। আম্মা ইফতার বানানোর সময় আমাকে প্রায়ই ডাকতেন তার সাথে ইফতার বানানোর জন্য। আম্মা মরিচ পেয়াজ মসলা গুছিয়ে দিতেন। আরআমি সেটা ডালের সাথে মিশিয়ে ছোট ছোট বড়া তৈরী করতাম। এভাবে আলু সেদ্ধ করে সেটা দিয়ে চপ বানানোর কাজটাও আমাকে দেয়া হতো। এসব কাজ অন্য সময় বিরক্তিকর মনে হলেও তখন কেন যেন ভালো লাগতো।

যাই হোক, ইফতারের পরপরই দৌড় দিয়ে মসজিদে যেতাম। নামাজের পর আড্ডা শেষ করে বাসায় ফিরতে না ফিরতেই আবার এশার নামাজের জন্য আবার বেরনো। পড়ালেখা বাদে তখন সবকিছুই ভালো লাগতো। সেই হিসেবে নামাজ রোজার নাম করে পড়ালেখায় ফাকি দেবার একটা অবারিত সুযোগের পুরোটাই সদ্ব্যবহার করতাম। মাঝে মাঝে অবশ্য আটকে যেতাম বাসায় কারো দাওয়াত থাকলে। দাওয়াত থাকলে সাধারনত ইফতারের পর ড্রয়িং রুমেই টেবিল সোফা সরিয়ে নামাজের ব্যবস্থা করা হতো। সেদিন বেরুতে বেরুতে এশা হয়ে যেত। মসজিদের হুজুরদের যেদিন দাওয়াত থাকতো সেদিন খুব অবাক হয়ে তাদের খাওয়া দেখতাম। আব্বার নবাবী ইফতারের আয়োজনের পুরোট গলোধকরনের পর মাগরিবের নামাজ শেষ করে সাথেসাথেই তারা আবার রাতের খাবারের জন্য বসতেন। আম্মা যাবার সময় তাদের সাথে টিফিনকেরিয়ারে করে সেহরীর খাবারও দিয়ে দিতেন।

রোজার মাসে প্রতিরাতেই তারাবি নামাজ পড়তে যেতাম মসজিদে। সে এক মজার সময় কাটতো আমাদের সময়। ঢাকা শহরের প্রতিটা মসজিদেই কিছু কুটিল চরিত্রের বুড়ো দেখা যায়। জুম্মাবারে মোনাজাতের আগের সময়টুকুতে বিভিন্ন ননইস্যুতে হল্লা করা, বাচ্চাকাচ্চারা কেন সামনের কাতারে বড়দের সাথে নামাজে দাড়াবে ইত্যাকার নানারকম ঝামেলা পাকানো ছাড়া এদের কোন কাজ নেই। এরকম একবুড়ো তারাবী নামাজের আগে কাতার সোজা করার সময় মোয়াজ্জিনের চেয়ে জোরে হাক পাড়তেন "বাচ্চারা সব পেছনে যাও"। প্রথম প্রথম রাগ রাগলেও পেছনে দাড়াবার মজা বুঝে গেলাম কিছুদিন পরই। কিছুক্ষন পরপরই সবার অগোচরে বাইরে বেরিয়ে কিছুক্ষন আড্ডা পিটিয়ে আসা যেত। আল্লাহ রসুলের ভয়ডরহীন কিছু অতিরিক্ত বিচ্ছু পোলাপাইন ছিলো যারা নামাজের মধ্যেও হাসাহাসি করতো। একবার স্বপন নামে আমার একজনচাচাতো ভাই রুকুতে গিয়ে কি বলতে হয়ে সেটা ভুলে গেলো। একরাকাত দুরাকাত সেটা কিছুতেই মনে করতে না পেরে রুকুতে থাকা অবস্থায় সে পাশের জনকে কনুইয়ের গুতো দিয়ে নিরিহ গলায় জিজ্ঞেস করলো "রুকুতে জানি কি কয়?" স্বপন ভাইয়ের সেই হেড়ে গলার প্রশ্ন ইমামের সুরার আওয়াজ ছাপিয়ে পুরো মসজিদে গমগম করে উঠলো। আরযাবে কোথায় পিছনের পুরো পোলাপাইনের কাতার হা হা করে হাসতে হাসতে নামাজ ফেলে দৌড়ে বাইরে। এরপরের এক সপ্তাহ দলবল বেধে একটু দুরে খিলগাও চৌরাস্তার মসজিদে যেতাম নামাজ পড়তে। দুএকজনের মুখে শুনেছি বদরাগী একবুড়ো সেদিন নামাজের পর খেপে গিয়ে চ্যালা কাঠ হাতে পাড়ার রাস্তায় বেরিয়েছিলেন কাউকে পেলে উচিৎ শিক্ষা দেবার নিয়তে।

রোজার শেষ দিকে আসতো শবে বরাতের রাত। পটকা ফুটানোর প্রতিযোগীতা চলতো পাড়ায় পাড়ায়। এ- ব্লক থেকে পটকার আওয়াজ বেশী আসলে আমরা সি-ব্লকের পোলাপাইন মেজাজ খারাপ করে পরের বছর দেখিয়ে দেয়া যাবে এই পরিকল্পনা আটতাম। সারারাত ধুন্ধুমার মজা করা হতো পটকাবাজি করে। বাসায় সবাই জানতো ছেলে নামাজ

পড়ছে মসজিদে। কিছু বেকুব মসজিদে যেতও। নামাজ পড়তে না, ঘুমাতে। খিলগাঁও চৌরাস্তার মসজিদে ডিম-লাইট জ্বেলে নামাজ পড়তো সবাই। পেছনের কাতারগুলোতে নামাজি কাউকে পাওয়া যেত না। সবাই সেখানে লম্বা হয়ে ঘুম দিতো। সেই ঘুমকাতুরেদের দলে ছেলে বুড়ো সববয়সের লোকজন পাওয়া যেত। ঘুম পটকাবাজী সব শেষে ভোররাতে সেহরী খেয়ে আখেরী মোনাজাতের পর ঘুমাতে যেতাম সবাই।

বিদেশ বিভূয়ে রোজা রাখার মজাটা আর অবশিষ্ট নেই। রোজা রাখলেও সেটা চেপে যাওয়াই ভালো এখানে। স্বল্পপরিচিত কেউ শুনলেই তাদের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। প্রশ্নগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জিহাদ, সুইসাইড এ্যাটাক, পুরুষদের চার বিয়ে ইত্যাদিতে গিয়ে ঠেকে। তখন পালাই পালাই মনে হয়। এগুলোর পরই চুপিচুপি ধর্মের টানে নয়, কেমন যেন সংস্কৃতি পালনের জন্যই রোজা রাখি। সন্ধ্যা হলে একা একাই ইফতার বানাই। ব্লেন্ডারে ডাল গুড়ো করে সেটাতে পেয়াজ মরিচ মশলা মিশিয়ে শুকে দেখি সেটা আম্মার মতো হলো কিনা। আম্মাও হয়তো দেশে বসে ইফতার বানানোর সময় মনে করেন তার ছেলেটা কি সুন্দর গোল গোল করে পিয়াজু আলুর চপ বানাতো। আমার নানা মারা যান এক রোজার ঈদে। এজন্য আম্মা পুরো রোজার মাসটাই নামাজ-কালামের ওপর থাকেন। থেকে থেকে চোখের পানি ফেলেন। বড় হবার পর থেকে আব্বা আম্মারে নিয়ে ভাবতে গেলে কেন জানি শুধু ছোটবেলার স্মৃতিগুলোই মনে পড়ে। বড়কালের কোন স্মৃতি মনে পড়ে না। আম্মারও হয়তো সেরকমই তার আব্বাজানের সাথে ছেলেবেলার স্মৃতিগুলোই মনে পড়ে। জিজ্ঞেস করতে হবে একদিন। আর আব্বা এখন বুড়ো বয়সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একলা একলা কথা বলেন। আর সব বুড়োর মতোই কাউকে পেলে পুরনো দিনের গল্প করেন। অতিরিক্ত পান সুপারি জর্দা খাবার কারনে এখন আর তিনি খাবারের স্বাদ প্রায় পান না বলতে গেলে। তবুও ফোকলা মুখে ইফতার মুখে দিয়ে খেতে চেষ্টা করেন। আর নিজে নিজেই আফসোস করে বলেন " ছেলেগুলো খেতে শিখলো না। আমরা ছোটশুমা যা খাইছি ...। " একটা বয়সতক হয়তো বাঙ্গালি সামনের দিকে চেয়ে সবকিছু ছিড়ে খুড়ে ফেলতে চায়। তারপরই ভাটার টান শুরু হয়। তারপর হয়তো স্মৃতির জাবর কেটেই থাকতে হয় – ছোটশুমার স্মৃতি।

# হাসিনাকে ঘিরে কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতিময়তা

**হাসান মোরশেদ**

---

*(এই বিস্ময় আমি উপভোগ করি। মাঝে মাঝে কি-বোর্ড স্বাধীন হয়ে যায়। আংগুলের সাথে তার গোপন সমঝোতা হয় আমার অগোচরে। এই ভাবে লেখা হয় ,আসলে যা লেখার কোনো পরিকল্পনা থাকেনা আমার। ...হাসান মোরশেদ)*

আমাদের পারিবারিক,বিশেষ করে নানার বাড়ীর পরিমন্ডল বাঁমঘেষা আওয়ামী লীগ। নানীর বড়চাচা আব্দুল হক চেয়ারম্যান ছিলেন বৃটিশ আমলের জুরী বোর্ডের সদস্য। সামন্ত পরিবারের একজনহলেও মুসলিম লীগের বদলে তিনি সক্রিয় ছিলেন প্রথমে কৃষকপ্রজা পার্টি ও পরে আওয়ামী লীগে।
সুনামগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে শেখ মুজিবুর রহমানের খুব কাছের কয়েকজন ছিলেন যাদের সহযোগীতায় গড়ে উঠেছিলো আওয়ামী লীগের বিশাল ভোট ব্যাংক- আব্দুল হক চেয়ারম্যান ছিলেন তাঁদের একজন। মামাতো ছোট ভাই আব্দুস সামাদ'কে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ছিলেন তিনি। এই আব্দুস সামাদই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রানপুরুষ 'আব্দুস সামাদ আজাদ'।
প্রথমতঃ আব্দুল হক চেয়ারম্যান ও পরে আব্দুস সামাদ আজাদের প্রভাবে নানার বাড়ির প্রায় সকলের মাঝে দেখেছি শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে তীব্র প্যাশন। আমার বড় মা (নানীর মা) মারা গেছেন ৯০ বছর বয়সে('৯৬ সালে)। তাঁর মতো এতো আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক মানুষ আমি আমার এ জীবনে দেখিনি কোনোদিন। ভীষন ধার্মিক ছিলেন। সারাদিন নামাজ পড়তেন আরসারা বছরই ছিলো চলতো তাঁর কোরান খতম।
ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। গ্রামের সরকারী হাসপাতালে বদলী হয়ে এসেছে এক স্বাস্থ্যকর্মী। পুজারী হিন্দু, হরিপদ। হাসপাতালে থাকার ব্যবস্থা নেই। অন্য কোনো বাড়িতে ও রাখা যাচ্ছেনা। বড় মা নিজ থেকে প্রস্তাব দিলেন হরিপদ কে তার ঘরে জায়গা দিতে।
আমার শৈশব ঋদ্ধ হয়েছে এমোন দৃশ্য দেখে- সত্তোরোর্ধ একজনবৃদ্ধা মাথার ঘোমটা টেনে কোরান শরীফ পড়ে যাচ্ছেন ঘরের এককোনে, আরেক কোনে একজনপুজারী ব্রাম্মন পুজা সারছে।
এই ছবিটা আমার চোখে আটকে আছে অন্তঃত ২৫ বছর। কোনো এক ব্লগ সাইটে গতবছর তুমুল তর্ক বিতর্ক হয়েছিলো যখন একজনপ্রবাসী আধুনিকা(!) ইসলামিকা(!!)ফতোয়া জারি করেছিলেন- 'হিজাব ইসলামের প্রায় মৌলিক একটা বিষয়'।
আমি আঁতকে উঠেছিলাম। আমার এমন ধর্মপ্রান বড় মা- মারা যাবার দিন ও যিনি অজু করে কোরান শরীফ পাঠ করেছেন তিনি কি তবে মুসলমান? ইসলামের প্রায় মৌলিক একটা বিষয় হিজাব- মানতে যে কোনোদিন দেখিনি তাকে? বড় মা এর কথা মনে পড়লো প্রাসংগিকভাবে। আগষ্টমাস আসলে তাকে মনে করিয়ে দিতে হতো। এ মাসে শেখ মুজিবুরের নিহত আত্মার জন্য দোয়া প্রার্থনা করে তিনি কোরান খতম করতেন আর১৫ই আগষ্ট রোজা রাখতেন। তাঁর বড় নাতী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত। অনেক বার জোরাজুরি করেছেন তাকে ঢাকায় নেবার জন্য। শেষবার একটা লোভ দেখিয়ে তাকে নেয়া সম্ভব হয়েছিল। শেখ মুজিবুরের বাড়ি দেখাতে নেয়া হবে!
এরকম তীব্র প্যাশন ছিলো আমার নানু'র ও। তাঁর নিজের ভাই বোনদের বিশাল একটা গ্রুপ ছিলো। গ্রুপ লিডার ছিলেন তিনি নিজে। বিয়ে শাদী থেকে শুরু করে জায়গা জমি বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহন তাঁকে ছাড়া সম্ভব হতোনা। তার বিশাল বাড়ীর চৌহদ্দীতে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবের সমালোচনা করার মতো বুকের পাটা কারো ছিলোনা।
সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত নানু'দের প্রতিবেশী। ৭০ এর নির্বাচনে সাংসদ হন। এরপর ও আরো কয়েকবার। ৯২ এর আগ পর্যন্ত তীব্র আওয়ামীবিরোধী। তো ভদ্রলোক একবার এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে এসে শেখ মুজিবকে নিয়ে বেশ

আপত্তিকর মন্তব্য করছিলেন। উপস্থিত কেউ ভদ্রতাবশতঃ প্রতিবাদ করছিলেন না। একে প্রভাবশালী নেতা , তার উপর আমন্ত্রিত অতিথি। না, আমার নানু সম্মানিত নেতাকে কথা শুনাতে দ্বিধা করেননি।
চমৎকার হাতের কাজ জানতেন নানু। বাঁশবেতের কাজ করতেন, মাটির শো-পিস বানাতেন। বসার ঘরে তাঁর নিজের বানানো একটা মাটির নৌকা আরশেখ মুজিবের প্রতিকৃতি আঁকা বেতের পাটি সাজানো ছিলো।
নানু মারা গেছেন,সে প্রায় বছর পাঁচেক। হারিয়ে গেছে সেই মাটির নৌকা আরমুজিবরের প্রতিকৃতি আঁকা বেতের পাটি ।
১৯৮৮ পারিবারিক বিপর্যয়ের বছর ।
তখনো আমরা পিঠাপিঠি দু ভাইবোন । বোন কয়েকমাস ধরে শুয়ে আছে শেরেবাংলানগরের সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। হৃদরোগ ধরা পড়েছে। হার্টের একটা ভাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে। দ্রুত অপারেশন জরুরী। সেই ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে মাত্র ১টা কিংবা দুটো হার্টের অপারেশন হয়েছে তখনো।
ডাক্তার রা কোনো ভরসা দিতে পারছেননা। বলছেন সিংগাপুর কিংবা ব্যাংককে নিয়ে যেতে। নিয়ে যে যাওয়া হবে- টাকা কোথায়?
পরিবারের অর্থনৈতিক বিপর্যয় তো শুরু সেই ১৯৭৫ এ। এক একটা রাষ্ট্রীয় ঘটনা অনেকটুকু প্রভাব ফেলে ব্যক্তির জীবনে- সে ব্যক্তি রাজনীতির হোক কিংবা অরাজনৈতিক।
আমার বাবা কি রাজনীতির মানুষ ছিলেন। না ছিলেন না। আমি কোনোদিন তাকে মিছিলে যেতে দেখিনি,কোন সভামঞ্চে বক্তৃতা দিতে দেখিনি,কোনো দলীয় মানুষের সাথে তাঁর সখ্যতা দেখিনি। বাবা কি তবু রাজনীতির মানুষ ছিলেন না? নিশ্চিত ছিলেন।
২০০১ এর এপ্রিলের ২০ তারিখ। আমাদের ঘরে বিয়ের উৎসব। ছোটমামার বিয়ে। সেই বিয়ের সকাল বেলা ক্লিনিকে মারা গেলেন বাবা। পাশের বেডে ঘুমে আমি ও আম্মা। আমরা কিছুই বোঝলাম। এমনই নাটকীয় ছিল তাঁর মৃত্যু এবং বেঁচে থাকা।
বাবাকে কবর দিয়ে ফিরে আসার পর মুহুর্ত থেকে তাঁর চেহারা আমি আরমনে করতে পারিনা।
বাবার কথা মনে পড়লেই একটা শীর্ন দীর্ঘ কাঠামো চোখে ভাসে। সাদা পায়জামা, খদ্দরের পাঞ্জাবী। এই লোকটা আমার বাবা। সাদা পায়জামা, খদ্দরের পাঞ্জাবী এর বাইরে অন্য কোনো পোষাক তাকে পড়তে দেখিনি কোনোদিন। অন্য কোনো পোষাক পড়েননি ১৯৬৬ র ছয়দফা ঘোষনার পর থেকে।
কৃষি কর্মকর্তা ছিলেন। পাকিস্তানী শাসনের শেষদিন গুলোতেও এই পোষাক পড়ে অফিস করেছেন। '৭৫ এর ১৫ আগষ্টের পরের দিন গুলো কি পাকিস্তানী শাসনের চেয়ে ও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল?
আমাদের যমজ দু ভাইয়ের জন্ম সেই রাষ্ট্রীয় হত্যার পরে। তার আয়ু নিয়ে আমি বেঁচে আছি। সে চলে গেছে তিন্দিন পর। আমার সে ভাইকে বাবা দেখতে পারেননি। আম্মাকে দেখেছেন প্রায় তিনবছর পর। সামরিক সরকারের হুলিয়া মাথায় বাবা তখন ফেরারী-কখনো আগরতলা, কখনো গৌহাটি।
একজননিতান্ত নিরীহ গুরুত্বহীন মানুষ, মানুষ হত্যা করতে পারবেনা বলে যুদ্ধে যেতে পারেনি(এই অনুশোচনা তাকে তাকে তাড়া করেছে সারাজীবন)সেই মানুষ কি করে রাষ্ট্রশক্তির প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়? না, সেই গল্প জানিনা আমি। সেই দিনগুলোতে আসলেই কি ঘটেছিলো কেউই তা জানেনা। বাবা অনেক কথা বলতেন। কথা বলতেন শিশুদের সাথে,আড্ডা জমাতেন রিক্সাওয়ালাদের সাথে। আমি তার মতো এতো প্রানবন্ত হতে পারিনি। কিন্তু সেই দিনগুলোর কথা বাবা কাউকেই বলেননি। চেপে রেখেছেন নিজের ভেতর।
কেবল মনে পড়ে,পরের সামরিক শাসকের সময় রাষ্ট্রপক্ষ থেকে পত্র এসেছিলো,'নির্দোষ প্রমানিত হওয়ায় আপনাকে চাকুরীস্থলে ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে'। নিম্নমানের সেই মানুষের তখন রাষ্ট্রীয় ফাজলামো মেনে নেয়ার সাধ ছিলোনা আর।
আজ২০০৭ সালে যখন জলপাই গনতন্ত্রের সুবাতাসে উর্দিওয়ালা ছাড়া দেশের সবশালারাই দুর্নীতিবাজ তখন সন্দেহ জাগে, সেই ১৯৭৫ এ আমার বাবা ও কি দুর্নীতিবাজ ছিলেন?

সেই দুর্নীতিবাজের একমাত্র কিশোরী মেয়ে প্রায় চিকিৎসাহীন হয়ে পড়েছিলো হাসপাতালের বেডে ১৯৮৮ সালে।
আরমারা যাচ্ছে নিশ্চিত-সেই বোনকে শেষবারের মতো দেখতে গিয়ে এককিশোরের দেখা হয়ে গিয়েছিলো, আকাশী রংয়ের তাঁতবোনা শাড়ী পড়া এক ভীষন মায়াবী মহিলার সাথে । সেই মায়াবী মহিলা এখন আর আকাশী রংয়ের তাঁতবোনা পড়েননা। তাঁর গলায় এখন মুক্তোর মালা। গতকাল তাকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
সেই দেখা হওয়ার গল্প হতে পারে আরেক বেলা।
১৯ বছর আগের সেইদিনগুলোতে ই-মেইল,মোবাইল ফোন আমাদের কল্পনাতেও ছিলোনা। ল্যান্ডফোন ও বিরল ছিলো ছোট্ট মফস্বলে।
সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের বেডে শুয়ে বোন আমাকে চিঠি লিখে। 'জলদস্যুর দ্বীপ পড়া শেষ,মুসা আমানটা ভীষন পাজি, বেশীক্ষন পড়তে পারিনা-বুকে খুব ধড়ফড় করে,মাঝে মাঝে শ্বাস আটকে যায়'
আমি ও চিঠি লিখি-'এমিলের গোয়েন্দাবাহিনী পড়েছি। বড় মামা তোকে দেখতে গেলে বইটা পাঠাবো। আমার বৃত্তি পরীক্ষা সামনে। পড়তে ভাল্লাগেনা'
বোন এবার ফিরতি চিঠিতে লিখে-'মেজোমামার সাথে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। থোকা থোকা রক্ত দেয়ালে লেগে আছে। ইস, একটুর জন্য হাসিনার সাথে দেখা হলোনা '
এবার আমার ইর্ষা হয়। ইস! বোন ও বাড়ী ঘুরে এলো , আমার যাওয়া হলোনা। বড় মামা ঢাকা যাবেন ওকে দেখতে । আমি বায়না ধরি। আমাকে ও নিতে হবে সাথে।
যাওয়া হয়। সেই প্রথম মফস্বলে জন্ম নেয়া আরবড় হয়ে উঠতে থাকা আমার প্রথম নগর যাত্রা।
এখন শুনি বিলাসবহুল বাসে ঘন্টা চারেকে রাজধানী পৌঁছে যাওয়া যায়। মেঘনা ব্রীজ হয়ে গেছে।
১৯৮৮তে প্রায় দশবারো ঘন্টার বাসযাত্রা। আমি জানালার পাশে বসেছিলাম। শহর সিলেট পেরিয়েই বদলে যায় আমার পৃথিবী। এই পৃথিবী আমার চোখে ধরা দেয়নি তার আগে। সম্ভবতঃ বর্ষাকাল ছিলো। সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের দু পাশে বিশাল বিশাল হাওর। আদিগন্ত জল। জল ছুঁয়ে আছে মহাসড়কের বুক। হাওরের বুক জেলে নৌকা। দ্রুত সরে যায়। আমি বিস্মৃত হই, মৃত্যু নিশ্চিত প্রায় সহোদরার কথা। দৃষ্টিসীমানা থেকে হাওর সরে গেলে পর সহসা প্রবেশ করে বিস্তীর্ন সবুজ। ছোট ছোট টিলা, চা বাগান। মহাসড়ক সরু হয়ে আসে আরবাড়তে থাকে চা-বাগানের সীমানা। দূরে,আরো দূরে উঁকি দেয় নীল পাহাড়ের রেখা। সেইসব রহস্যময়তা আমাকে গ্রাস করে।
মেঘনা ফেরী ঘাটে এসে বাস থামলে পর আমরা নামি। ফেরীতে উঠি। এই মেঘনা! বিশাল মেঘনা। আমি কালনী পাড়ের ছেলে। মেঘনার গল্প শুনেছি শৈশব থেকে। আমাদের কালনী গিয়ে মিশেছে মেঘনাতে। নদী মিশে যায় যে নদীতে কতো বিশাল সে আদতে? কল্পনার ঐ বিশালতাকে এবার স্পর্শ করি দৃষ্টিতে। গল্প শুনেছিলাম মেঘনার চরে নাকি কুমীর রোদ পোহায়। সেই বর্ষার দিনে রোদ ছিলোনা কিনা আজআর মনে করতে পারিনা। তবে একটা কিশোরের ছবি চোখে ভাসে এখনো-খুব কৌতুহলে সে তাকিয়ে আছে মেঘনার জলে। কোথাও হয়তো ঘাঁই দিল একটা শুশুক কিংবা পানকৌড়ি!
সন্ধ্যা পেরুবার পর আমরা নামি নগর ঢাকাতে। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের রাজধানী শহর আমার আতংক হয়ে যায় প্রথম দর্শনেই। তীব্র হর্ন দিয়ে ছুটে যাচ্ছে পুলিশ ভ্যান। মেশিনগান উঁচিয়ে আর্মির ট্রাক। আমার মনে পড়ে,বছর পেরোয়নি নুর হোসেনকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে এই ঢাকার রাস্তায়। ছোট্ট মফস্বলের সরকারী স্কুল থেকে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম প্রতিবাদ মিছিলে।
এইসব মনে পড়ে যায়,আমি বড় মামার হাত ধরি আরো শক্ত করে।
আমরা যাই সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে।
হৃদরোগ বিভাগে সারি সারি বেড। একটা বেডে বসে আছে প্রায় হাড্ডিসার কোমল কিশোরী। আমার বোন। প্রায় ছয় মাস পর দেখা। অনেক বদলে গেছে। আমার চিনতে কষ্ট হয়। এই আমার বোন তো?
বোন হাসে। আমার হাত ধরে। আমার ঘ্রান নেয়। চুলে হাত বুলায়। পাশের বেড থেকে উঁকি দেয় প্রায় একই বয়সের আরেক কিশোরী।

বোন আমাকে বলে-'আয়আমার বান্ধবীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেই'
পরিচয় হয় । ওর নাম রীনা । রীনা এসেছে আংগুরপোতা দহগ্রাম থেকে । ওর ও হার্টের অসুখ । ওর দুটো ভাল্বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । তবু কি অদ্ভূত হাসিমুখ মেয়েটার । কোঁকড়ানো কালো চুল সারা মাথা জুড়ে । চোখের নীচে একটা কালো তিল । এই ছবিটা আটকে ছিলো আমার স্মৃতিতে দীর্ঘ অনেকদিন ।
রীনার গল্প শুনি । সেই প্রথম আমি শুনি ছিটমহলের কথা । ওখান থেকে নাকি যখন খুশি আসা যায়না দেশের অন্য অংশে । রীনাকে আমার গল্পের রহস্যময় রাজকুমারীর মনে হয় ।
রীনা বলতে থাকে-রাষ্ট্রপতি গিয়েছিলো সেই দহগ্রাম আগুরপোতায় হেলিকপ্টারে চড়ে । সেখানকার লোকজন রাষ্ট্রের পতিকে শুনেয়েছিল একঅসুস্থ কিশোরীর কথা যার চিকিৎসা অসম্ভব সেই ছিট্মহলে । সেই রাষ্ট্রপতির মন ভীষন কোমল । মেয়েটার কথা শুনে তিনি কেঁদে ফেলেন । জনসভায় ঘোষনা দেন মেয়েটির চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব তাঁর ।
তারপর কয়েক হাজার মানুষের হর্ষধ্বনিকে ছাপিয়ে রাষ্ট্রপতির হেলিকপ্টার রাজধানী ফিরে সেই মেয়েটিকে সাথে নিয়ে ।
পরদিন বিকেলবেলা ।
বড়মামার হাত ধরে যাই একটা বাড়ীতে । দোতলা কিংবা তিনতলা । সাধারন । একেবারেই বৈশিষ্টহীন । এরচেয়ে কতো কতো জমকালো দালানবাড়ী আমাদের মফস্বল শহরেই ।
সে বাড়ী তখনো বংগবন্ধু জাদুঘর হয়নি । পুলিশ প্রহরা নেই । কোনো প্রটোকল নেই । বাড়ীর গেটে দাঁড়িয়ে আমি তাকাই দোতালার বারান্দায় ।
হাসিমুখ একটা মানুষ হাতনাড়ছেন সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে। জনতা তাঁর নামে উচচারন করছে জয়ধ্বনি । এই ছবিটা ৭১ এর মার্চের কোন একদিনের ।
পাঁচবছর পর সেই বাড়ির দেয়াল ক্ষতবিক্ষত বুলেটে। সিঁড়িতে গড়িয়ে সেই হাসিমুখ। অন্যকক্ষ গুলোতে তার স্ত্রী,তিনপুত্র,পুত্রবধুদের লাশ ।
এই বাড়ীর সীমানায় ঢুকলেই আঁকড়ে ধরে শোক ও বিষাদ । গাঢ় হয়ে আসে নিঃশ্বাস । ভারী হয়ে আসে বাতাস । আমি বড় মামার হাত ছেড়ে দেই । একা একা হাঁটি এই ঘর থেকে সেই ঘর । গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দেয়াল,সিগারেটের পাইপ, দেয়ালে লেগে থাকা থোকা থোকা থোকা রক্ত, থোকা থোকা । রাসেল লুকিয়েছিলো কোন আড়ালে?
আমি আড়াল খুঁজি । ১৩ বছরের কিশোর আমি । এতো মৃত্যুর বিভীষিকা চেপে ধরে আমার কন্ঠনালী ।
বড়মামা খুব নীচুস্বরে জিজ্ঞেস করেন-'চলে যাবি?'
আমি মাথা নাড়ি। চলে যাবো । চলে যাবো । এই বাড়িতে আমি আরআসবোনা কোনদিন ।
আমরা মুলদালান থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসি । বের হয়ে যাবো । হঠাৎ,হঠাৎ করেই প্রচন্ড বাতাস আরবজ্রসহ বৃষ্টি । হয়তো কালবৈশাখি ছিলো সেটা । আমরা পাশের আমগাছের নীচে দাঁড়াই । বৃষ্টিতে ভিজতে থাকি ।
একটু পর পেছনের বারান্দায় এসে দাঁড়ান এক মধ্যবয়স্ক মহিলা । মামাকে উদ্দেশ্য করে বলেন-'আপনারা বৃষ্টিতে ভিজছেন কেনো? ভিতরে এসে বসুন'
আমরা ভিতরে যাই । একটা কাঠের ডাইনিং টেবিল । কয়েকটা চেয়ার । আমরা বসি । সেই ভদ্রমহিলা ও বসেন ।
এবার তাঁর দিকে তাকাই । বয়সে আমার মায়ের মতোই মনে হয় । আমার মায়ের মতোই ছোটখাটো,অনুজ্জ্বল গায়ের রং,বৈশিষ্টহীন চেহারা । তার পরনে একটা তাঁতের শাড়ী । আটপৌড়ে । আকাশের মতো রং ।
মামার সাথে তার টুকটাক কথা হয় । মামা সাংবাদিক । পরিচয় জানার পর রাজনীতির আলাপ আরো গাঢ় হয় । আলাপের মাঝখানে সেই মহিলা একবার উঠে ভিতরে যান । ফিরে আসেন প্লেটভর্তি ঝালমুড়ি আরচা নিয়ে । বাইরে তখনো ঝড় । আলাপ চলছে ।
এই মহিলা একরাতে হারিয়েছেন আরেকবোন ছাড়া পরিবারের সকলকে ।

সেই বৃষ্টিমুখর বিষন্ন বিকেলবেলা একটি কিশোর নির্বাক তাকিয়ে থাকে পৃথিবীর সবচেয়ে গাঢ়বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকা একখুব সাধারন মহিলার দিকে।
তারপর থেকে তাঁর ঐ ছবিটা আমার চোখে ভাসতো প্রায়ই। ভাসতো যখন তিনি জাহানারা ইমামের পাশে বসতেন ঘাতক দালাল নির্মুলের অঙ্গীকার নিয়ে,যখন তিনি জড়িয়ে ধরতেন তার বাহুতে কোন নির্যাতিত সংখ্যালঘুকে।
এই ছবিটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম যখন তিনি রাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ। যখন তার পড়নে নেই আর আকাশ রংয়ের তাঁত। যখন তাঁর গলায় উঠে এসেছে মুক্তোর মালা।
এই ছবিটা স্মৃতিতে ফিরে এসেছিলো ২৩ আগষ্টের সেই ভয়ংকর দিনে।
আবার হারিয়ে ফেলেছিলাম যখন তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন মধ্যযুগীয় বর্বরদের সাথে,বিকিয়ে দিয়েছিলেন প্রতিরোধের সকল পরম্পরা।
১৬ জুলাই,২০০৭ সালে যখন তাকে অনেক গুলো পুলিশ দিয়ে ঘিরে নিয়ে যাওয়া হয় জেলখানায়,আমার চোখে সেই ছবিটা ফিরে আসে আবার। ।

**(প্রথম খন্ড সমাপ্ত)**